ফিকহ্ মুহাম্মদী

[১ম ও ২য় খন্ড]

আল্লামা মহিউদ্দীন

অনুবাদ

মাওলানা মুহাম্মদ শামাউন আলী

ফিকহ্‌ মুহাম্মদী

১ম ও ২য় খণ্ড

মূল

আল্লামা মহিউদ্দীন

অনুবাদ

মুহাম্মদ শামাউন আলী
লিসান্স মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদি আরব

পরিবেশনায়
আহসান পাবলিকেশন
মগবাজার ❖ বাংলাবাজার ❖ কাটাবন
www.ahsan.bd.com

ফিকহ্ মুহাম্মদী ১ম ও ২য় খণ্ড

মূল : আল্লামা মহিউদ্দীন

অনুবাদ : মুহাম্মদ শামাউন আলী
লিসান্স, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

গ্রন্থস্বত্ব : অনুবাদক

প্রকাশনায়
আহ্সান পাবলিকেশন
১৯৩ মগবাজার (ওয়ারলেস রেলগেট), ঢাকা-১২১৭
মোবা: ০১৯২২৭০২৪১০, ০১৮৬৬৭৯১১০

পরিবেশনায়
- ❖ আহ্সান পাবলিকেশন, কাটাবন, ঢাকা।
- ❖ আহ্সান পাবলিকেশন, বাংলাবাজার, ঢাকা।
- ❖ র‍্যাকস পাবলিকেশন্স, ঢাকা।
- ❖ খেয়া প্রকাশনী, ঢাকা।
- ❖ আহ্সান ডট কম ডট বিডি
  ১১২ গিয়াস গার্ডেন বুক কমপ্লেক্স
  ৩৭ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

অনলাইন পরিবেশক
ahsanpublication.com
ahsan.com.bd
01737419624

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী, ১৯৯৩
অষ্টম প্রকাশ : ডিসেম্বর, ২০২১

কম্পোজ ও মুদ্রণ
এফ এ কম্পিউটার এন্ড প্রিন্টার্স
খিলগাঁও তালতলা, ঢাকা।
মোবাইল : ০১৭২৬৮৬৮২০২

মূল্য : একশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র।

FIQH MUHAMMADI : by Allama Mohiuddin Translated by Muhammad Shamaun Ali Published by Ahsan Publication, Dhaka, First Print January, 1993, Eight Edition December, 2021.
Price Tk. 150.00 only **($ 3.00)**

বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের সম্মানিত (সাবেক) সভাপতি (মরহুম) আল্লামা ডক্টর মুহাম্মদ আব্দুল বারী সাহেবের

অভিমত

স্নেহভাজন মাওলানা মুহাম্মদ শামাউন আলী উপমহাদেশে বহুল পঠিত ও সমাদৃত এবং মুসলিম ব্যবহারিক জীবনের জন্য অতি প্রয়োজনীয় উর্দূ ভাষায় লিখিত ফিক্হ মুহাম্মাদী গ্রন্থটি বাংলায় তরজমা করেছেন জেনে আমি আনন্দিত। তার তরজমা দেখার তেমন সুযোগ আমার হয়নি। তবে আমি নিশ্চিত যে, বাংলা ও উর্দূ উভয় ভাষায় তার দখল এবং কুর'আন ও হাদীসে তার জ্ঞান তাকে একটি সুন্দর অনুবাদগ্রন্থ উপহার দিতে সাহায্য করবে।

ফিক্হ মুহাম্মাদী ইতিপূর্বে কয়েকজনই অনুবাদ করেছেন তবে আমার জানামতে এ পর্যন্ত কেউই সমগ্র গ্রন্থটির অনুবাদ প্রকাশ করতে সমর্থ হননি। মুসলিম জীবনে চলার পথে সকল হিদায়াতের দুই মৌল উৎস আল কুরআনুল কারীম এবং মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের হাদীসকে ভিত্তি করে রচিত আল্লামা মুহীয়ূদ্দীনের এই গ্রন্থটির পূর্ণ তরজমা প্রকাশিত হলে এদেশের মুসলিমরা অশেষ উপকৃত হবেন। এই খেদমত আন্জাম দেয়ার জন্য আমি শামাউন আলীকে উষ্ণ অভিনন্দন জানাই এবং দো'আ করি আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার এই উদ্যোগকে কবুল করুন।

ওয়া আখিরু দা'ওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।

মুহাম্মদ আবদুল বারী
সভাপতি
বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

ঢাকা, ৭ই জানুয়ারী ১৯৯৩

ভূমিকা

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অসংখ্য শুকর দীর্ঘ প্রত্যাশার পর ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের জন্য একটি দূর্লভ ফেকাহ্ গ্রন্থ বাংলা ভাষায় বের হতে পারছে। আল্লামা মহিউদ্দীন সাহেব প্রণীত ফিকহ্ মুহাম্মদী কিতাবটির প্রতিটি বক্তব্য হাদীসের দলীল দিয়ে লিখা। এ ধরনের ফিকাহ্র কিতাব ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের দীর্ঘ দিনের দাবী। যাঁরা আল্লাহর জমীনে আল্লাহর দ্বীন কায়েম করার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তোষ অর্জনের পথ বাছাই করে নিয়েছেন তাঁরা সর্বাবস্থায় সতর্কভাবে চলতে চান। যাতে চোরাগলির কোন ছিদ্র পথ দিয়ে বাস্তব জীবনের ছোট বড় কোন ক্ষেত্রেই শিরক, বিদআত বা প্রচলিত কোন গুমরাহী তাদেরকে স্পর্শ করতে না পারে। এ জন্য তাদেরকে মেনে চলতে হবে ঃ

১. হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর নিকট হতে যে হিদায়াত ও আইন বিধান প্রামাণ্য সূত্রে পাওয়া যাবে তা দ্বিধাহীন ও অকুণ্ঠচিত্তে গ্রহণ করা।

২. কোন কাজে উদ্যোগী হওয়া বা কোন নিয়মপদ্ধতি অনুসরণ হতে বিরত থাকার জন্য রাসূল (সা.) এর নিকট হতে প্রাপ্ত আদেশ বা নিষেধকেই যথেষ্ট মনে করা।

৩. রাসূলুল্লাহ (সা.) ব্যতীত অপর কারো স্বয়ংসম্পূর্ণ নেতৃত্ব মেনে না নেয়া।

৪. জীবনের সকল ব্যাপারেই আল্লাহর কিতাব ও রাসূল (সা.) এর সুন্নাতকে অকাট্য প্রমাণ, বিশ্বস্তসূত্র ও নির্ভূল জ্ঞানের একমাত্র উৎস গণ্য করা।

৫. মন মগজকে এমনভাবে মুক্ত করা ও কারো ভালবাসা বা অন্ধ ভক্তিতে এমনভাবে বন্দী না হওয়া যার দরুন তা রাসূল (সা.) এর উপস্থাপিত সত্যের প্রতি ভালবাসা ও ভক্তির উপর জয়ী কিংবা প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়াতে পারে।

৬. মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) এর জীবন চরিতকে কুরআনের বাস্তব ব্যাখ্যা এবং উহাকেই সকল ব্যাপারে সত্যের একমাত্র মাপকাঠি (মি'য়ারে হক) হিসেবে মেনে নেয়া। আল্লাহর রাসূল ব্যতীত আর কাকেও ভুলের উর্ধে মনে না করা। কারো অন্ধ গোলামীতে নিমজ্জিত না হওয়া বরং প্রত্যেককেই আল্লাহর দেয়া

এই মাপকাঠিতে যাঁচাই ও পরখ করে যা মর্যাদা হবে তাকে সেই মর্যাদা দেয়া।

৭. হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর নবুওয়াতের পরে কোন ব্যক্তির এমন কোন মর্যদা মেনে না নেয়া, যার আনুগত্য করা বা না করার উপর ঈমান ও কুফর সম্পর্কে ফায়সালা হতে পারে।

শুধু তাই নয় স্থায়ী কর্মনীতি হিসেবে যা সব সময়ে মনে রাখতে হবে তা হল ঃ

"কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ কিংবা কোন কর্মপন্থা গ্রহণের সময় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শুধুমাত্র আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.) এর নির্দেশ ও বিধানের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করবে।"

উপরোক্ত বিষয়গুলোকে সঠিকভাবে আমল করার জন্য মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবনের কার্যাবলীকে সামনে রেখেই প্রণীত হয়েছে 'ফিকহ্ মুহাম্মদী'। এ কিতাবটি বাংলায় অনুবাদ করার উদ্যোগ নিয়ে আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন মাওলানা মুহাম্মদ শামাউন আলী ইসলামী আন্দোলনের একটি মহৎ কাজ করেছেন। ব্যস্ততার মাঝেও আমি তার অনুবাদটি একবার দেখেছি। ভাষার পরিপক্কতা না থাকলেও মূল কথাটি সহজভাবেই বোধগম্য হয়েছে। সম্ভবতঃ অনুবাদ করায় এটিই তার প্রথম প্রয়াস। দোয়া করি আল্লাহ তার এ শ্রমকে কবুল করুন। আমীন।

পরিশেষে আমি আশা করি ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের জীবনকে রাসূল (সা.) এর পথে পরিচালনার জন্য ফিকহ্ মুহাম্মদী কিতাবটি ইসলামী সাহিত্য জগতে মাইল ফলক হিসাবে গৃহীত হবে।

অস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু।

মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান
প্রাক্তন সংসদীয় দলনেতা
জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ

তারিখ ৮/১/৯৩ ইং

প্রসঙ্গ কথা

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনরে জন্য। যিনি আমাদেরকে আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তার প্রেরিত রাসূল হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের ওপর বর্ষিত হোক দরুদ ও সালাম। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদের পথ চলার জন্য রাসূলুল্লাহ্‌র মাধ্যমে ইসলামকে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। কুরআন ও হাদীসের আলোকেই আমাদের দৈনন্দিন কাজকর্ম, চলাফেরা, ইবাদত, পাক-পবিত্রতা, মুয়ামালাত সবকিছু হওয়া উচিৎ। এ ব্যাপারে বাংলা ভাষায় অনেক কিতাব-পত্র বের হয়েছে কিন্তু সরাসরি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে এবং কুরআন ও হাদীসকে অগ্রাধিকার দিয়ে রচিত কিতাবের খুব অভাব। আল্লামা মহিউদ্দীন বহুপূর্বে উর্দূ ভাষায় এ ধরনের একটি কিতাব লিখেছিলেন যা 'ফিকহ্ মুহাম্মদী' নামে পরিচিত।

এ কিতাবখানা ছাত্র জীবনে পড়ার সময় এর বঙ্গানুবাদ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি। কর্ম জীবনে পদার্পন করে এর অনুবাদের কাজে হাতে দেই। আল্লাহ্‌র অশেষ রহমতে প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের অনুবাদ শেষ করা সম্ভব হয়েছে। সাত খণ্ডের এ কিতাবখানি ক্রমান্বয়ে অনুবাদ করার ইচ্ছা রয়েছে, বাকী আল্লাহ্‌র মর্জি।

অনুবাদের ক্ষেত্রে সহজ-সরল ভাষা ব্যবহার করার চেষ্টা করেছি। এরপরও কোন ভুলক্রটি পরিলক্ষিত হলে এবং কোন সুহৃদয় পাঠক আমাকে অবহিত করলে পরবর্তীতে তা সংশোধন করার চেষ্টা করবো। এ কাজে যাঁরা আমাকে বিভিন্নভাবে সহায়তা করেছেন এবং উৎসাহ যুগিয়েছেন বিশেষভাবে বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের সম্মানিত (সাবেক) সভাপতি বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ (মরহুম) আল্লামা ডক্টর মুহাম্মদ আব্দুল বারী এবং আমার শ্রদ্ধেয় দুই সাবেক জাতীয় সংসদ সদস্য অধ্যাপক মুজিবুর রহমান ও মাওলানা মীম ওবায়দুল্লাহ সাহেব, তাদের সকলকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। এখানে আরেকটি কথা না বললেই নয়, তাহলো এত অল্প সময়ে এ বইটির ৬ষ্ঠ সংস্করণ বের হতে যাচ্ছে যা একমাত্র মহান আল্লাহ্‌র বিশেষ অনুগ্রহ বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে তাঁর দ্বীনকে বুঝে কুরআন ও হাদীসের আলোকে আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন ॥

বিনীত

ঢাকা, জুলাই ২০০৫

অনুবাদক

সূচীপত্র

পানির বিবরণ	১৩
পেশাব-পায়খানার বিবরণ	১৩
অপবিত্র বস্তু হতে পবিত্রতা অর্জণের বিবরণ	১৫
ফরজ গোসলের বিবরণ	১৭
মিসওয়াকের বিবরণ	১৯
অযু ও গোসলের পানির পরিমাণের বর্ণনা	১৯
মশরু অর্থাৎ সুন্নাত গোসলের বিবরণ	১৯
জুতা, মোজা ও জওরাবের উপর মাসহ্ করা	২০
তায়াম্মুমের বিবরণ	২০
হায়েজ (মাসিক স্রাব) এর বিবরণ	২১
নিফাসের বিবরণ	২৩
ইস্তিহাযার (রক্ত প্রদর) বিবরণ	২৩
অযুর বিবরণ	২৪
অযু ভঙ্গকারী বস্তু সমূহের বিবরণ	২৬
নামাযের ওয়াক্তের বিবরণ	২৭
কাযা নামায পড়ার নিয়ম	২৮
ভুল বশত বা ঘুমিয়ে গিয়ে নামায ছুটে গেলে তা পড়ার বিবরণ	২৮
নামায তরককারীর (বেনামাজীর) বর্ণনা	২৯
আযানের বিবরণ	২৯
তাকবীর বা ইকামত বলার নিয়ম	৩২
মসজিদের বিবরণ	৩৩
সতর ঢাকার বিবরণ	৩৫
নামাযীর সামনে দিয়ে গমনাগমনের বর্ণনা	৩৬
নামায পড়ার নিয়ম	৩৬
সালাম ফিরার পর যিকির ও দোয়ার বিবরণ	৪৭
দোয়ার সময় হাত উঠান ও মুখের উপর ফিরানো	৫৩
নামাযে জায়েয ও নাজায়েয বিষয়ের বিবরণ	৫৩
সহু সিজদার বিবরণ	৫৪
তিলাওয়াতে সিজদার বিবরণ	৫৬
শুকরানা সিজদার বিবরণ	৫৬
জামাতের সাথে নামায পড়ার ফজিলত	৫৬

ওযর অসুবিধার কারণে জামায়াত তরক করা ৫৮
জামায়াতের সাথে মহিলাদের নামায পড়া ৫৯
ইমামতির বিবরণ ৫৯
মহিলা কর্তৃক মহিলাদের ইমামতী করা ৬০
নামাযে ইমামকে বলে দেয়ার বিবরণ ৬০
ইমাম কর্তৃক মুক্তাদীদের অবস্থা খেয়াল রাখা ৬০
মুক্তাদীদের ইমামের অনুসরণ করার বিবরণ ৬১
ইমামের পিছনে মুক্তাদীর দাঁড়াবার স্থান ৬২
কাতারসমূহ সোজা করার বিবরণ ৬২
যে সব ওয়াক্তে নামায পড়া নিষেধ ৬৩
সুন্নাত নামাযের বিবরণ ৬৩
তাহাজ্জুদ নামাযের বিবরণ ৬৫
বিতের নামাযের বিবরণ ৬৬
চাশত নামাযের বিবরণ ৬৮
তারাবীর নামাযের বিবরণ ৬৮
ইস্তেখারা নামাযের বিবরণ ৬৯
সফরে নামায কসর করার বিবরণ ৭০
বাড়িতে নামায জমা করার বিবরণ ৭১
ভয়ভীতি কালিন নামায (সালাতে খওফ) ৭১
জমুার নামাযের বিবরণ ৭১
ঈদের নামাযের বিবরণ ৭৬
ইস্তিসকা নামাযের বিবরণ ৭৭
সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণের নামাযের বিবরণ ৭৯
রোগীর দেখাশুনা, সেবা শুশ্রূষা করা ৭৯
মৃত্যুর দুয়ারে উপনিত ব্যক্তিকে তালকীন দেয়া এবং তার নিকট সূরা ইয়াসীন পড়ার বিবরণ ৮১
মৃতের উপর চুমা দেয়া ও অশ্রু ফেলে কাঁদা ৮২
মৃতের জন্য মাতম করা হারাম ৮২
দুনিয়ায় কারো সন্তান মারা যাবার ফলে সে প্রতিদান হিসেবে জান্নাত পাবে তার বিবরণ ৮৩
মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয়ার বিবরণ ৮৪
মৃতকে কাফন দেয়ার বিবরণ ৮৪
জানাযা নিয়ে যাবার বিবরণ ৮৫
জানাযার নামাজ পড়ার বিবরণ ৮৬
মৃতকে দাফন করার বিবরণ ৯০
কবর যিয়ারতের বিবরণ ৯৪

ফিক্‌হ মুহাম্মদী
২য় খণ্ড

কোরবানীর বিবরণ	৯৭
যাকাত না দেয়ার শাস্তি	৯৮
উটের যাকাতের বিবরণ	৯৯
ছাগলের যাকাতের বিবরণ	৯৯
গরুর যাকাতের বিবরণ	১০০
সোনা চান্দির যাকাতের বিবরণ	১০০
গহনার বা অলংকারের যাকাতের বিবরণ	১০০
ওশর এর বিবরণ	১০১
মধুর যাকাতের বিবরণ	১০১
যে সব বস্তুতে যাকাত ফরজ নয় তার বিবরণ	১০১
গুপ্ত ধনের উপর যাকাত	১০১
ভিন্ন মালিকানার পশুর বিবরণ	১০২
যে সব পশু যাকাত হিসেবে দেয়া ঠিক নয়	১০২
যাকাতের খাত এর বিবরণ	১০২
যাকাত সংক্রান্ত বিভিন্ন মাসআ'লার বিবরণ	১০২
যে সব লোককে যাকাত দেয়া ঠিক নয় তার বিবরণ	১০৩
ভিক্ষাবৃত্তির বিবরণ	১০৩
সাদকাহ্ কারীর মর্যাদা ও তার প্রকারভেদ	১০৩
উত্তম সাদকার বিবরণ	১০৫
স্বামীর মাল হতে স্ত্রীর খরচ করার বিবরণ	১০৬
সাদকা করে তা পুনঃ ক্রয় করার বিবরণ	১০৬
সাদকাতুল ফিতর বা ফিতরার বিবরণ	১০৬
রমজানের রোযা ফরজ হবার বিবরণ	১০৭
পবিত্র রমজান মাসের মর্যাদার বিবরণ	১০৭
পবিত্র রমজানের রোযার সওয়াব	১০৮
বিনা ওজরে রোযা ত্যাগ করার বিবরণ	১০৯
রোযাদারকে ইফতার করানোর সওয়াব	১০৯
রোযা রোযাদারের জন্য সুপারিশ করবে	১০৯
রমজানে চাকর চাকরানীদের কাজ হালকা করার বিবরণ	১১০
রমজানে কয়েদীদের মুক্তি দেয়া ও ভিক্ষুককে সাহায্য দেয়ার বর্ণনা	১১০

প্রতি রমজানে বেহেশত সুসজ্জিত করার বর্ণনা ১১০
রমজানের রাতে কিয়াম করার সওয়াব ১১০
চাঁদ দেখে রোজা রাখা ও চাঁদ দেখে ঈদ করা ১১০
সন্দেহযুক্ত দিনে রোজা রাখা নিষেধ ১১০
রমাজনের সম্মানার্থে রোযা রাখা নিষেধ ১১১
রোযা রাখা ও ঈদ করার জন্য সাক্ষ্য ১১১
ফরয রোজার নিয়্যতের সময় ১১১
সেহ্‌রীর সময় এর বিবরণ ১১১
সাহ্‌রী খাবার বিবরণ ১১১
সওমে বেসাল বা মিলান রোযা রাখা নিষেধের বিবরণ ১১১
তাড়াতাড়ি ইফতার করার ফজিলত ১১১
রোযা ভঙ্গের কারণ ও তার বর্ণনা ১১২
রোযা অবস্থায় সঙ্গম করার কাফ্‌ফারা ১১৩
ইফতারের সময় রোযাদারের দোয়া কবুল হয় তার বর্ণনা ১১৩
ইফতারের দোয়া ১১৩
সফরে রোযা রাখার বিবরণ ১১৪
মা ও গর্ভবতী মহিলার রোযার বিবরণ ১১৪
হায়েজ ও নেফাস অবস্থায় মহিলার রোযা রাখার বিবরণ ১১৪
বৃদ্ধলোকের রোযার বিবরণ ১১৪
মৃতের পক্ষ হতে ওয়ারিসদের রোযা ১১৫
রোযার কাজার বিবরণ ১১৫
নফল রোযার বিবরণ ১১৫
লাইলাতুল কদরের বিবরণ ১১৬
ই'তেকাফের বিবরণ ১১৬
হজ্বের বিবরণ ১১৮
হজ্বের শর্ত ১১৮
হজ্ব ও উমরার ফজিলত ১১৯
হজ্ব কিভাবে করতে হবে তার বিবরণ ১২০
মীকাত বা ইহরাম বাঁধার স্থান ১২৩
হজ্বের আরকানের বিবরণ ১৩৮
মদীনার হেরেমের ফজিলত ১৩৮
মদীনার ফলমুলের ফজিলত ১৩৯

মক্কা শরীফের ফজিলতের বিবরণ ১৩৯
বায়তুল্লাহ্ শরীফে ইবাদত করার ফজিলতের বর্ণনা ১৩৯
মসজিদে নববীতে ইবাদত করার ফজিলত ১৩৯
দজ্ব এর ফজিলত ১৪০
তওয়াফ করলে যে সওয়াব হয় তার বর্ণনা ১৪০
সাফা ও মারওয়ার মাঝে সা'য়ী করার সওয়াব ১৪০
হজরে আসওয়াদকে চুম্বনের সওয়াব ১৪১
রুকনে ইয়ামানীতে দোয়া করার বিবরণ ১৪১
মুলতাজিমের পার্শে দোয়া করলে আরোগ্যলাভ হয় তার বিবরণ ১৪১
জমজমের পানির ফজিলতের বর্ণনা ১৪২
যে ব্যক্তির উপর হজ্ব ফরজ হয় তাকে তাড়াতাড়ি হজ্বে যেতে হবে তার বিবরণ ১৪২
হজ্বের মানত করলে তা আদায় করার বিবরণ ১৪৩
আত্মীয় স্বজনের পক্ষ হতে হজ্ব করার বিবরণ ১৪৩
হজ্বে যাওয়ার সওয়াবের বিবরণ ১৪৩
হারাম মাল দ্বারা হজ্ব কবুল না হবার বিবরণ ১৪৩
হজ্ব ও উমরার বিভিন্ন রকম মাসআলার বর্ণনা ১৪৪
বিবাহের ফজিলত ১৪৪
সতরের বিবরণ ১৪৫
বিবাহের সময় পাত্রীর অনুমতির বর্ণনা ১৪৬
ওলীর (অভিভাবকের) বিবরণ ১৪৭
বিবাহের প্রস্তাব দেয়ার বিবরণ ১৪৮
যে সব স্ত্রীলোকের সাথে বিবাহ করা হারাম তার বিবরণ ১৪৮
মসজিদে বিবাহ পড়ানো সুন্নাত, খুতবা পড়া ও ইজাব কবুলের বিবরণ ১৫০
মোহরের বিবরণ ১৫২
যুবক যুবতীদের তাড়াতাড়ি বিবাহ দেয়ার বিবরণ ১৫৩
বিবাহের ঘোষণার বিবরণ ১৫৪
স্বামী-স্ত্রীর মিলামিশার বিবরণ ১৫৪
স্ত্রীদের পালা নির্ধারণ করার বিবরণ ১৫৫
ওলিমার বিবরণ ১৫৬
স্ত্রীর উপর স্বামীর অধিকার ১৫৭
স্বামীর উপর স্ত্রীর অধিকার ১৫৮
পর্দার বিবরণ ১৬০

স্ত্রীকে স্বামীর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করা নিষেধ	১৬১
ব্যভিচারের নিকৃষ্টতার বর্ণনা	১৬১
মহিলাদের জন্য পুরুষদের পোষাক পরিধান নিষিদ্ধ	১৬১
তালাকের বিবরণ	১৬১
খোলা তালাকের বিবরণ	১৬৩
রাজায়াতের বিবরণ	১৬৪
ইদ্দতের বিবরণ	১৬৪
ভরণ-পোষণের (নাফাকার) বিবরণ	১৬৬
দুধ পানের বিবরণ	১৬৭
সন্তান লালন-পালনের বিবরণ	১৬৭
ইলা'র বিবরণ	১৬৮
লেয়ানের বিবরণ	১৬৮
জেহারের বিবরণ	১৬৮
সন্তানের সাথে স্নেহ-সদ্ব্যবহার করার বিবরণ	১৬৯
সন্তানের উত্তম নাম রাখা ও খারাপ নাম পরিবর্তন করা	১৭০
ছেলেমেয়েদের আদব শিক্ষা দেয়ার বিবরণ	১৭০
জারজ সন্তানের বিবরণ	১৭১
আত্মীয়তা রক্ষা ও পিতামাতার অধিকার	১৭১
বিধবা মহিলাদের বিবাহ দেয়ার বিবরণ	১৭৩
আকীকার বিবরণ	১৭৪
খাতনার বিবরণ	১৭৫
প্রতিবেশীর হক (অধিকার)	১৭৬

بسم الله الرحمن الرحيم

ফিকহ্ মুহাম্মদী ১ম খণ্ড

পানির বিবরণ

পানি কম হোক কিম্বা বেশী হোক তাতে অপবিত্র জিনিস পড়ার কারণে যদি তার রং পরিবর্তন হয়ে যায়, বা তাতে গন্ধ আসে অথবা তার স্বাদ নষ্ট হয়ে যায় তাহলে সে পানি অপবিত্র।[১]

যদি প্রায় সোয়া ছয় মণ পরিমান পানি কোন স্থানে জমে থাকে তাতে অজু করা জায়েয। অজুর অঙ্গ প্রতঙ্গের পানি তাতে পড়লে নাপাক হবে না।[২] কিন্তু অপবিত্র অবস্থায় (গোসল ফরজ হওয়া অবস্থায়) তার মাঝে বসে গোসল করা নিষেধ। তার কিনারায় বসে তা হতে পানি উঠিয়ে গোসল করবে।[৩]

পেশাব-পায়খানার বিবরণ

পায়খানা জিন ও শয়তানদের থাকার জায়গা। যে ব্যক্তি পায়খানায় যাবে সে এ দোয়া পড়বে ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ -

অর্থাৎ- হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি নাপাক পুরুষ জিন এবং নাপাক স্ত্রী জিন হতে।[৪]

যখন পায়খানা থেকে বের হবে তখন এ দোয়া পড়বে ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَذْهَبَ عَنِّى الاَذٰى وَعَافَنِىْ -

অর্থাৎ- সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি আমার কষ্ট দুর করেছেন এবং আমাকে সুস্থতা দিয়েছেন।[৫]

পায়খানা হতে বের হবার সময় এ দোয়াটিও পড়া জায়েয ঃ

غُفْرَانَكَ -

অর্থাৎ- হে প্রভু! আমি তোমারই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি।[৬]

---

১. ইবনে মাজা- আবু উমামা আল বাহেলী (রা.)।

২. সুনানে আরবা- ইবনে উমর (রা.)।

৩. মুসলিম- আবু হুরায়রা (রা.)।

৪. ইবনে মাজা- আনাস ইবনে মালেক (রা.)।

৫. আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজা, দারেমী- হযরত আয়েশা (রা.)।

৬. প্রাগুক্ত।

পায়খানা এবং পেশাব করার সময় কিবলার দিকে মুখ বা পিঠ করে বসা নিষেধ। কিন্তু দালান-কোঠার মাঝে (ঘেরা দেয়ালের বা ঘরের মাঝে) জায়েয আছে।[১] ডান হাতে এস্তেঞ্জা করা অর্থাৎ ঢিলা বা পানি ব্যবহার করা নিষেধ।[২] তিন ঢিলার কম নিয়ে পায়খানা যাবে না। কিন্তু তিনটি ঢিলা না পাওয়া গেলে দু'টিই যথেষ্ট।[৩] যতদুর সম্ভব বেজোড় ঢিলা নিবে এবং যে ব্যক্তি বেজোড় ঢিলা নেবে না তার গুনাহ হবে না।[৪]

গোবর, হাড় এবং কয়লা দ্বারা এস্তেঞ্জা করা নিষেধ। কেননা এ তিন বস্তু জিনদের খোরাক।[৫] এ তিন বস্তুর দ্বারা এস্তেঞ্জা করলে পবিত্রতা অর্জন হবে না।[৬] লোকের চলার পথে, ছায়ায় এবং গোসলখানায় পায়খানা-পেশাব করলে (তার উপর খোদার) লানত (অভিসম্পাত) হয়।[৭] গোসলখানায় এবং গর্তে অর্থাৎ কোন ছিদ্রের মুখে পেশাব করা নিষেধ।[৮] পেশাব করার সময় ডান হাতে লজ্জাস্থান ধরা এবং ডানহাতে পায়খানায় ঢিলা ব্যবহার করা না জায়েয।[৯] পায়খানায় যাবার সময় মাটির নিকবটবর্তী হবার পুর্বে লজ্জাস্থান খোলা নিষেধ।[১০] পায়খানা করার সময় যদি দু'জন লোক নিজেদের লজ্জাস্থান খুলে বসে এবং নিজেদের মাঝে কথপোকথন করে তাহলে তারা আল্লাহর কোপানলে পড়বে। মেয়েদের জন্যও এ হুকুম।[১১] পায়খানা করার পর শুধু ঢিলা দিয়ে পবিত্রতা অর্জন হয়। কিন্তু মহিলাদের জন্য পানি ব্যবহার জরুরী এবং পরুষদের জন্য তা উত্তম।[১২]

জ্ঞাতব্য : যদি ঢিলা দিয়ে মুছার সময় হাতে ময়লা লেগে যায় তাহলে হাত মাটিতে ঘষে নিয়ে ধৌত করা সুন্নত এবং যদি নাজাসাত না লাগে তবে মাটিতে ঘষে ধৌত করার প্রয়োজন নেই। কেননা রাসূলুল্লাহ (সঃ) একবার পায়খানা থেকে এসে খাবার খেয়েছিলেন এবং হাত ধৌত করেননি।[১৩]

---

১. বুখারী, মুসলিম- আবু আইউব (রা.)।
২. মুসলিম- সালমান (রা.)।
৩. বুখারী- ইবনে মাসউদ (রা.)।
৪. আবু দাউদ, ইবনে মাজা, দারেমী- আবু হুরায়রা (রা.)।
৫. আবু দাউদ- ইবনে মাসউদ (রা.)।
৬. দারকুতনী- আবু হুরায়রা (রা.)।
৭. আবু দাউদ, ইবনে মাজা- মুয়াজ (রা.)।
৮. প্রাগুক্ত।
৯. তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ- আনাস (রা.)।
১০. আহমাদ, আবু দাউদ।
১১. আহমাদ, আবু দাউদ, নাসাঈ।
১২. মুসলিম- ইবনে আব্বাস (রা.)।
১৩. মুসলিম।

(প্রয়োজন বশত) দাঁড়িয়ে* পেশাব করা জায়েয।[১] রাতে পেয়ালায় পেশাব করা সুন্নত (অর্থাৎ ভয় বা অন্য কোন কারণ বশত পেয়ালায় বা কোন পাত্রে পেশাব করে নিবে এবং সকালে তা ফেলে দিবে।)[২]

পায়খানার জন্য এতদুর যাবে যেন কেউ দেখতে না পায় এবং পেশাব (পায়খানা) করার সময় সালামের জবাব দেয়া নিষেধ।[৩] যে আংটিতে আল্লাহর নাম রয়েছে তা পায়খানায় নিয়ে যাবে না।[৪]

যে ব্যক্তির পেশাব পায়খানার বেগ আসবে সে প্রথমে পেশাব-পায়খানার প্রয়োজন মিটিয়ে নিবে অতপর নামাজ পড়বে।[৫]

অপবিত্র বস্তু হতে পবিত্রতা অর্জনের বিবরণ

যদি কোন ব্যক্তি মসজিদে পেশাব করে দেয় তাহলে উক্ত স্থানে এক বালতি পানি প্রবাহিত করলে পবিত্র হয়ে যাবে।[৬]

যদি জুতার সাথে অপবিত্র বস্তু লেগে যায় তাহলে পবিত্র মাটির উপর তা ঘষলেই পাক হয়ে যায়।[৭] নাপাক জায়গার উপর দিয়ে চলার কারণে যদি মহিলার আঁচল (কাপড় বা চাদরের আঁচল) নাপাক হয়ে যায় তাহলে পবিত্র মাটির উপর দিয়ে চলার ফলে তা আবার পাক হয়ে যাবে।[৮]

কোন ব্যক্তি যদি খালি পায়ে (পায়ে জুতাও নাই এবং ময়লাও লাগেনি) মসজিদে চলে যায় তাহলে গুনাহ্ নাই।[৯]

দুগ্ধপোষ্য পুত্র সন্তান যে এখনও কোন খাদ্য দ্রব্য খায়না যদি কাপড়ে পেশাব করে দেয় তাহলে তা ধোয়া জরুরী নয়। পানির ছিটা দিলেই তা পাক হয়ে

---

১. মুসলিম- ইবনে আব্বাস (রা.)
২. আবু দাউদ, নাসাঈ।
৩. আবু দাউদ।
৪. আবু দাউদ- আনাস (রা.) ।
৫. আবু দাউদ- আব্দুলাহ্ ইবনে আরকাম (রা.)।
৬. বুখারী, মুসলিম- আবু হুরায়রা (রাঃ)।
৭. আবু দাউদ, ইবনে হিব্বান- আবু হুরায়রা (রা.)
৮. আহমাদ, মুয়াত্তা মালেক, তিরমিযী- আবু হুরায়রা (রা.)।
৯. তিরমিযী- হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রা.)

* যে হাদীসের দ্বারা দাঁড়ায়ে পেশাব করা জায়েয বলা হয়েছে তাহলো "একদা নবী করীম (সা.) এক গোত্রের আস্তাকুঁড়ে উপস্থিত হয়ে দাঁড়ায়ে পেশাব করেছিলেন।" আস্তাকুঁড় উচু ছিল এবং তিনি নীচের দিকে ছিলেন। বসে পেশাব করলে তাঁর দিকে গড়ায়ে আসতো। সেজন্য তিনি দাঁড়িয়ে পেশাব করেছিলেন। তাই কারণ বশত দাঁড়ায়ে পেশাব করা জায়েয অন্যথায় বসে পেশাব করাটাই উত্তম। (শরহে নববী)।

যাবে। কিন্তু যদি কন্যা সন্তান পেশাব করে দেয় তাহলে তা নাধুলে পাক হবে না।[১] যদি কাপড়ে বীর্য লেগে যায় এবং ধোয়ার পরও তার চিহ্ন দুর না হয় তাহলে কোন অসুবিধা নাই।[২] বীর্য যদি কাপড়ে লেগে শুকিয়ে যায় এবং ঘর্ষণের ফলে তা উঠে যায় তাহলে কাপড় পাক হয়ে যাবে। অর্থাৎ ধুয়ার প্রয়োজন হবে না।[৩] মুযী* বের হলে অযু নষ্ট হয়ে যাবে। লজ্জাস্থান ধুয়ে অযু করতে হবে।[৪]

স্বর্ন এবং রৌপ্যের বাসনে পানাহার করা নিষেধ। কেননা এগুলি দুনিয়ায় কাফেরদের জন্য এবং পরকালে মুসলমানদের জন্য।[৫] যে ব্যক্তি স্বর্ন এবং রৌপ্যের বাসনে পানাহার করে সে নিজের পেট দোজখের আগুন দিয়ে পূর্ণ করে।[৬] কিন্তু যদি কারো পাত্র ভেঙ্গে বা ফেটে যায় তাহলে সেটা রৌপ্যের তার দিয়ে বাঁধা জায়েয।[৭]

যে ব্যক্তি ঘুম থেকে জাগবে, সে নিজ হাত তিনবার ধুয়ে নিবে। কেননা ঘুমের ঘোরে তার হাত কোথায় লেগেছিল তা সে জানে না।[৮] হালাল জীবজন্তুর মল বা মূত্র যে জায়গায় থাকে (অবশ্য তা শুষ্ক হয়া চায়) সেখানে নামাজ পড়া জায়েয।[৯] যদি কারও পাত্রে কুকুর মুখ দেয় বা খায় কিম্বা পান করে তাহলে প্রথমে উক্ত পাত্রটিকে একবার মাটি দিয়ে মাঁজবে অতপর ছয়বার পানি দিয়ে ধুয়ে নিবে। এ ও বিধান রয়েছে যে, কুকুর উচ্ছিষ্ট পাত্রটি প্রথমে সাতবার পানি দিয়ে ধুয়ে নিবে, অষ্টমবার মাটি দিয়ে মেজে নিবে।[১০] বিড়ালের উচ্ছিষ্ট (ঝুটা) পাক।[১১]

জুতা পরে নামাজ পড়া সুন্নত।[১২] অর্থাৎ জুতা পাক সাফ থাকলে কেউ তা পরে নামায পড়তে পারে। মৃত পশুর চামড়া দাবাগত করলে (লবন ও অন্যান্য দ্রব্য দিয়ে পাকান প্রক্রিয়া) পাক হয়ে যায়।[১৩] মদের সিরকা বানানো এবং তা পান করা হারাম।[১৪]

---

১. আহমাদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজা- লুবাবা বিনতে হারেস (রা.)।
২. বুখারী, মুসলিম- আয়েশা (রা.)।
৩. মুসলিম- আয়েশা (রা.)।
৪. বুখারী, মুসলিম-হযরত আলী (রা.)।
৫. বুখারী, মুসলিম--হুজায়ফা (রা.)
৬. বুখারী, মুসলিম-- উম্মে সালমা (রা.)
৭. বুখারী- আনাস (রা.)।
৮. বুখারী, মুসলিম- আবু হুরায়রা (রা.)।
৯. বুখারী।
১০. মুসলিম।
১১. সুনানে আরবা- আবু কাতাদা (রা.)।
১২. আবু দাউদ।
১৩. বুখারী, মুসলিম- আবু সালমা (রা.)।
১৪. বুখারী- হযরত সাওদা (রা.)।
* কাম ভাবের উদয় হলে (বীর্যপাতের পূর্বে) পুরুষাঙ্গ হতে যে এক প্রকার তরল পদার্থ বের হয়, তাকে মুযী বলে।

ফরজ গোসলের বিবরণ

পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ (খাতনার স্থান পর্যন্ত) যদি স্ত্রী অঙ্গের মাঝে প্রবেশ করে তাহলে উভয়ের উপর গোসল ওয়াজিব হবে।[১] যে ব্যক্তি ঘুম থেকে জেগে কাপড় ভিজা দেখবে অর্থাৎ বীর্যপাত দেখবে তার উপর গোসল ওয়াজিব হবে যদিও স্বপ্নের কথা মনে না থাকে।[২] আর যে ব্যক্তি স্বপ্ন দেখে (অর্থাৎ যেন সে সঙ্গম করছে) এবং কাপড় ভিজা না পায় তাহলে তার উপর গোসল ওয়াজিব নয়।[৩] মেয়েদের ক্ষেত্রেও এ বিধান। কেননা তাদেরও স্বপ্নদোষ হতে পারে। স্বপ্নদোষ হলে তারাও গোসল করবে।[৪]

মহিলার ফরজ গোসলের পানি যদি কোন পাত্রে অবশিষ্ট থাকে তবে তাতে পুরুষের গোসল করা জায়েজ।[৫]

নাপাক অবস্থায় স্বামী-স্ত্রী উভয়ে এক পাত্র হতে পানি উঠায়ে গোসল করার সময় একে অপরের হাতে ঠেকা লাগলে কোন অসুবিধা নেই।[৬]

পুরুষের গোসল করার পর নাপাক স্ত্রীর সাথে শয়ন করা এবং তার শরীরে শরীর লাগানো জায়েয।[৭]

নাপাক অবস্থায় কিছু খেতে চাইলে বা শু'তে চাইলে প্রথমে লজ্জাস্থান ধুয়ে নিবে অতপর নামাযের জন্য যেভাবে অযু করে সেভাবে অযু করে নিবে।[৮] কিন্তু নাপাক অবস্থায় কিছু খেতে চাইলে শুধু হাত ধোয়াও যথেষ্ট।[৯]

যে ঘরে কুকুর বা প্রাণীর ছবি অথবা নাপাক লোক থাকে সে ঘরে (রহমতের) ফেরেস্তা আসে না।[১০]

মুশরিক ব্যক্তিকে দাফন করলে গোসল করা ওয়াজিব।[১১]

ফরজ গোসল করার সময় প্রথমে নিজ হাত তিনবার ধু'বে, অতপর ডানহাত দ্বারা বাম হাতের উপর পানি ঢেলে লজ্জাস্থান এবং উরু ধু'বে। অতপর দু'হাত

১. মুসলিম, আহমাদ, তিরমিযী- আয়েশা (রা.)।
২. তিরমিযী, ইবনে মাজা- আয়েশা (রা.)।
৩. আবু দাউদ, ইবনে মাজা, দারেমী- আয়েশা (রা.)।
৪. বুখারী, মুসলিম- আনাস (রা.)
৫. মুসলিম, আহমাদ- ইবনে আব্বাস (রা.)
৬. বুখারী, মুসলিম- আয়েশা (রা.)।
৭. তিরমিযী, ইবনে মাজা- আয়েশা (রা.)।
৮. বুখারী, মুসলিম- আয়েশা (রা.)।
৯. নাসাঈ- আয়েশা (রা.)।
১০ নাসাঈ- হযরত আলী (রা.)।
১১. প্রাগুক্ত।

মাটির উপর ঘষে নিবে, অতপর অযু করবে। অতপর মাথায় তিনবার পানি ঢালবে এবং চুলের গোড়ায় আঙ্গুল ফিরাবে এবং গোসল করবে। অতপর সেখান থেকে সরে গিয়ে পা ধু'বে এবং (প্রয়োজন না থাকলে) কাপড় দ্বারা শরীর মুছবে না।* [১]

ফরজ গোসলের পূর্বে যে অযু করবে, সে অযুই যথেষ্ঠ। গোসলের পরে অযু করা জরুরী নয়।[২] যে ব্যক্তি একাধিক স্ত্রীর সাথে সহবাস করবে তার জন্য শেষে একবার গোসল করাই যথেষ্ট।[৩] কেহ স্ত্রীর সাথে দ্বিতীয়বার সহবাস করার ইচ্ছা করলে (মধ্যখানে) অযু করে নিবে।[৪]

ফরজ গোসলের পূর্বেই কেহ মাথা ধুয়ে নিলে গোসলের সময় মাথায় পানি না ঢাললেও কোন অসুবিধে নাই এবং খিতমীর (এক প্রকার গাছ) পাতা পানিতে দিয়ে মস্তক ধুয়া সুন্নাত।[৫]

ফরজ গোসলের সময় যদি একটি চুলও শুকনো থাকে তাহলে এর জন্য দোজখের আগুনে ফেলা হবে। হযরত আলী (রাঃ) এ কারণে মাথায় চুল রাখা কাজটিকে শত্রু মনে করতেন।[৬]

অপবিত্র মহিলার গোসলের সময় মাথার চুল (খোপা বা বেনী) খোলা জরুরী নহে। তিনবার পানি দিয়ে চুলের গোড়া ভিজিয়ে নেয় তাহলেই যথেষ্ঠ।[৭] কিন্তু ঋতুবতী মহিলা যখন হজ্বের এহরাম বাঁধার জন্য গোসল করবে তখন চুল খোলা জরুরী।[৮]

নাপাক অবস্থায় মসজিদের ভিতরে প্রবেশ করা হালাল নয়[৯] এবং নাপাক অবস্থায় কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করা নিষেধ।[১০]

১. বুখারী, মুসলিম।
২. সুনানে আরবা- আয়েশা (রা.)।
৩. মুসলিম- আনাস (রা.)।
৪. নাসাঈ- আবু সাঈদ খুদরী (রা.)।
৫. আবু দাউদ।
৬. আহমাদ, আবু দাউদ, দারেমী।
৭. মুসলিম- উম্মে সালমা (রা.)।
৮. নাসাঈ- আয়েশা (রা.)।
৯. আবু দাউদ, ইবনে খুজায়মা- আয়েশা (রা.)।
১০. তিরমিযী- ইবনে উমর (রা.)।

* গরমের সময় একদিন রাসূল (সা.) গোসলের পর কাপড় নেননি। হাত দিয়ে মাথা ও শরীরের পানি ঝেড়ে ফেলেছিলেন। শীতলতার দরকার ছিল বা রুমাল ময়লা যুক্ত ছিল বলে। না জায়েয বলে নয়। সুতরাং রুমাল বা কাপড় দিয়েও মুছতে পারে বা হাত দিয়েও পানি ঝেড়ে ফেলতে পারে। (ফতহুল বারী)।

মিসওয়াকের বিবরণ

রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন যে, আমি যদি আমার উম্মতের উপর কঠিন মনে না করতাম তাহলে এশার নামায বিলম্বে পড়তে হুকুম দিতাম এবং প্রত্যেক নামাযের জন্য মিসওয়াক করতে আদেশ করতাম।[১] যে নামায বিনা মিসওয়াকে পড়া হয় সে নামায হতে মিসওয়াক করে নামায পড়া সত্তর গুণ বেশী মর্যাদা সম্পন্ন।[২]

অন্যের মিসওয়াক অনুমতি নিয়ে ব্যবহার করা জায়েয।[৩] মিসওয়াক কলমের ন্যায় মোটা হওয়া উচিৎ এবং নামাযের সময় তা কলমের মত কানে গুজে রাখা যায়।[৪] আংগুলি দ্বারা মিসওয়াক করা জায়েয।[৫]

অযু ও গোসলের পানির পরিমাণের বর্ণনা

গোসলের জন্য এক সা' এবং অযুর জন্য এক মুদ পরিমাণ পানিই যথেষ্ঠ।[৬] (এক মুদের পরিমাণ প্রায় ৬২৫ গ্রাম। চার মুদে এক সা' হয়। এক সা'র পরিমাণ হলো প্রায় আড়াই কেজি)। এ কথার উপর মুসলমানদের ইজমা আছে যে, অযু এবং গোসলের জন্য পানির কোন পরিমাণ নির্দিষ্ট নেই যদিও পানির পরিমাণ বেশী হয়। পানি বেশী কিম্বা কম হোক তাতে অযু এবং গোসলের শর্ত পাওয়া গেলেই যথেষ্ট। এর শর্ত হচ্ছে অযুর অঙ্গ-প্রতঙ্গের উপর এবং গোসলে সর্বাঙ্গে পানি প্রবাহিত হওয়া।[৭]

মশরু অর্থাৎ সুন্নাত গোসলের বিবরণ

জুমার দিনে, কুলিয়া লাগালে এবং মৃত ব্যক্তিকে গোসল দিলে, গোসল করা সুন্নাত।[৮] যে ব্যক্তি পবিত্র দ্বীন-ইসলাম গ্রহণ করবে, সে পানিতে কুল পাতা মিশিয়ে গোসল করবে।[৯] দুই ঈদের দিন ঈদগাহে যাবার আগে গোসল করবে।[১০] হজ্বের ইহরাম বাঁধার সময় গোসল করবে[১১] এবং মক্কা শরীফে প্রবেশের সময় গোসল করবে।[১২]

---

১. বুখারী, মুসলিম- আবু হুরায়রা (রা.)।
২. মিশকাত- আয়েশা (রা.)।
৩. আবু দাউদ, মিশকাত- আয়েশা (রা.)।
৪. আবু দাউদ, তিরমিযী- আবু সালমান (রা.)
৫. আহমাদ, তিরমিযী।
৬. বুখারী, মুসলিম-আনাস (রা.)
৭. নববীসহ মুসলিম।
৮. আবু দাউদ- আয়েশা (রাঃ.
৯. আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী- কায়স বিন আ'সেম (রা.)।
১০. মুয়াত্তা মালেক- না'ফে (রা.)।
১১. তিরমিযী-জায়েদ বিন সাবেত (রা.)।
১২. বুখারী, মুসলিম- ইবনে উমর (রা.)।

জুতা, মোজা ও জওরাবের উপর মাসহ্ করা

রাসূলুল্লাহ (সা.) মোজার (চামড়ার মোজা) উপর মাসহ্ করতেন।[১] মোজার উপর মাসহ্ করার সময়-কাল হচ্ছে তিনদিন এবং তিনরাত মুসাফিরের জন্য আর একদিন একরাত মুকিম (স্থায়ী বাসিন্দা) এর জন্য।[২]

যে কোন মোজা পরা লোকের উপর গোসল করা ফরজ হলেই মাসহ্ করার সময় শেষ হয়ে যায়। তখন মোজা খুলে ফেলবে।[৩]

জ্ঞাতব্য ঃ জমহুরে উলামার নিকট মাসহ্ করার প্রথম সময় শুরু হয় তখন, যখন অযু নষ্ট হয়। যেমন এক ব্যক্তি দুপুরের সময় অযু করে মোজা পরলো এবং সন্ধ্যায় তার অযু নষ্ট হল। তা হলে সন্ধ্যা থেকে একদিন একরাত গণনা করবে। মোজা মাসহ্ করার পন্থা হচ্ছে যে, হাতের পাঁচ আঙ্গুলি পানি দিয়ে ভিজিয়ে নিবে এবং তা পায়ের আঙ্গুলের মাথা থেকে শুরু করে পাতার উপর দিয়ে গিরা পর্যন্ত টেনে আনবে। যে সব জিনিসে অযু ভঙ্গ হয় সে সব জিনিসে মাসহ্ও ভঙ্গ হয়। দরকার বশত মোজা খুলে ফেললেও মাসহ্ ভঙ্গ হয়। জুতার উপর মাসহ্ করা চলে। জওরাব অর্থাৎ সুতা, উল এবং রেশমের মোজার উপরে মাসহ্ করা জায়েয।[৪]

তায়াম্মুমের বিবরণ

যদি দশ বছর পানি না পাওয়া যায় তায়াম্মুম করবে। যে সময় পানি পাবে সে সময়ই অযু করা ফরজ হবে।[৫]

যদি কেউ পানি এবং মাটি এ দু'টির কোনটিই না পায় তবে বিনা অযু এবং তায়াম্মুমে নামায পড়া জায়েয।[৬] তায়াম্মুমের পূর্বে প্রথমে অন্তরে নিয়্যত করবে, অতপর বিসমিল্লাহ বলে দু'হাত পাক মাটির উপর মারবে, (হাতে) ফুঁদিয়ে মুখ মন্ডলের উপর হাত ফিরাবে অতপর হস্তদ্বয়ের কব্জিসহ মুছবে।[৭]

জ্ঞাতব্য ঃ হস্তদ্বয় কনুই পর্যন্ত মুছা জরুরী নয়। কেননা একথা কোন সহীহ হাদিসে বর্ণিত হয়নি। কাপড়, পাথর, লাকড়ী, লোহা ইত্যাদির উপর তায়াম্মুম

---

১. আহমাদ, আবু দাউদ- মুগীরা (রা.)।
২. মুসলিম- শোরায়হ ইবনে হানী (রা.)।
৩. তিরমিযী, নাসাঈ- সাফ অন বিন আস্সাল (রা.)।
৪. আহমাদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ- আবু যর (রা.)।
৫. আহমাদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ- আবু যর (রা.)।
৬. বুখারী, মুসলিম- আয়েশা (রা.)।
৭. বুখারী, মুসলিম- হযরত আম্মার (রা.)।

করা জায়েয নয়। কেননা আল্লাহ তা'য়ালা কুরআন মজীদে বলেছেন,

فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا -

অর্থাৎ- তোমরা যদি পানি না পাও তাহলে পাক মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করো।' আল্লাহ তায়ালা কাপড় প্রভৃতির উপর তায়াম্মুম করার হুকুম দেননি এবং তার রাসূল (সা.)-ও এ ধরনের হুকুম দেননি।

পানি না পেলে অথবা পানি ব্যবহারে ক্ষতির আশংকা থাকলে অযু গোসল করে যে সমস্ত কাজ করা জায়েয তায়াম্মুম করেও তা করা জায়েয।[১]

যে সমস্ত কারণে অযু ভঙ্গ হয়ে যায় সেই সমস্ত কারণে তায়াম্মুমও ভঙ্গ হয়ে যায়। তায়াম্মুম করে নামায পড়ার পর পানি পাওয়া গেলে উক্ত নামায পুনরায় পড়ার প্রয়োজন নেই।[২] কোন ব্যক্তি নাপাক অবস্থায় পানি না পেলে তায়াম্মুম করে নামায পড়ে নিবে।[৩]

যদি কারো শরীরে আঘাত বা ক্ষত থাকে, তাহলে উক্ত ক্ষতস্থানে পট্টি বেঁধে তার উপরে মাসহ্ করবে এবং সমস্ত শরীর ধুয়ে ফেলবে।[৪]

যদি কারো গোসলের প্রয়োজন হয় আর গোসল করলে পীড়া বৃদ্ধির আশংকা থাকে তবে তায়াম্মুম করে কয়েক ওয়াক্তের নামায পড়া জায়েয।[৫]

হায়েজ (মাসিক স্রাব) এর বিবরণ

হায়েজের মুদ্দত (কমপক্ষে তিনদিন বা উর্ধপক্ষে দশদিন) অথবা এ ধরনের সীমা নির্ধারণ সম্বন্ধে দলিল রূপে গ্রহণযোগ্য কোন হাদীস বর্ণিত হয়নি।

ঋতুবতী স্ত্রীলোক যখন মনে করবে যে, সে হায়েজ হতে পাক-সাফ হয়ে গেছে, তখন গোসল করে নামায পড়বে এবং রোজা রাখবে।[৬]

ঋতুবতী হায়েজ হতে পাক হয়ে যখন গোসল করবে তখন পানিতে লবন মিশিয়ে নিবে। হায়েজ হতে পাক হয়ে গোসল করার পর ন্যাকড়া কিম্বা তুলায় খুশবু লাগিয়ে লজ্জাস্থানে রাখবে।[৭]

---

১. আবু দাউদ, ইবনে মাজা।

২. আবু দাউদ, নাসাঈ- আবু সাঈদ খুদরী (রা.)।

৩. বুখারী, মুসলিম- ইমরান (রা.)।

৪. আবু দাউদ- জাবের (রা.)

৫. নাসাঈ- আবু যর (রা.)

৬. আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজা- হিমনা বিনতে জাহশ (রা.)।

৭. আবু দাউদ- উমাইয়া বিনতে আবী সলত (রা.)।

ঋতুবতী ঋতু অবস্থায় নামায পড়বে না এবং রোযা রাখবে না।[১] ঋতুবতীর সঙ্গে সঙ্গম ব্যতীত আর সবই জায়েয।[২]

হায়েজের অবস্থায় যে ব্যক্তি হালাল মনে করে নিজের স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করে সে ফাকির।[৩]

জ্ঞাবত্য : কেউ হারাম জেনেও যদি হায়েজের অবস্থায় সঙ্গম করে তাহলে কবীরা গুনাহ অর্থাৎ মহাপাপ হবে এবং তার সদকা করা ওয়াজিব। যদি রক্ত লালবর্ণ থাকা অবস্থায় (অর্থাৎ প্রথম দিকে) সঙ্গম করে তবে একদিনার সদকা দিবে।[৪] এক দিনার প্রায় ছয় আনা পরিমাণ। স্বর্ণ ষোল টাকা তোলা হলে এক দিনারের মূল্য ছয়টাকা ও অর্ধ দিনারের মুল্য তিন টাকা হবে।)

হায়েজ ওয়ালীর জন্য নামায মাফ এবং রোযার (পরবর্তী সময়ে) কাযা করতে হবে।[৫]

ঋতুবতীর কুরআন শরীফ পড়া (অপরকে পড়ানো এবং তাতে হাত লাগানো) নিষেধ। অবশ্য আপন ঋতুবতী স্ত্রীর শরীরে শরীর লাগানো জায়েয।[৬]

ঋতুবতী স্ত্রীর কোলে মাথা রেখে কুরআন শরীফ পড়া দুরুস্ত। (বড় চাদর হলে) অর্ধেক চাদর ঋতুবতী স্ত্রীর উপর রেখে বাকী অর্ধেক চাদর নিজের উপর নিয়ে নামায পড়া জায়েয।[৭]

ঋতুবতী মহিলার জন্য মসজিদে যাওয়া এবং বায়তুল্লাহর তওয়াফ করা নিষিদ্ধ। সে মসজিদের বাইরে দাঁড়িয়ে হাত দিয়ে ভিতর হতে কোন জিনিস উঠিয়ে নিলে তাতে কোন দোষ নেই।[৮]

ঋতুবতী কোন পাত্রের যে স্থানে মুখ রেখে কোন কিছু খায় বা পান করে সে জায়গায় তার স্বামীর মুখ রেখে খাওয়া বা পান করা জায়েয।[৯]

স্বামীর ইতেকাফের অবস্থায় তার ঋতুবতী স্ত্রীর দ্বারা মসজিদ হতে মাথা বের করে ধুয়ে নেয়া জায়েয।[১০] নিজ ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে সঙ্গম ব্যতীত হাস্য-রসালাপ

---

১. নাসাঈ- আয়েশা (রা.)।
২. বুখারী, মুসলিম- আবু সাঈদ (রা.)
৩. তিরমিযী, ইবনে মাজা, দারেমী- আবু হুরায়রা (রা.)।
৪. তিরমিযী।
৫. বুখারী, মুসলিম- আয়েশা (রা.)
৬. তিরমিযী- ইবনে উমর (রা.)।
৭. বুখারী, মুসলিম- আয়েশা (রা.)।
৮. মুসলিম।
৯. বুখারী, মুসলিম- আয়েশা (রা.)।
১০. মুসলিম- আয়েশা (রা.)।

করা, সঙ্গদান করা এবং একত্রে বসবাস করা জায়েয। কিন্তু সে অবস্থায় (স্ত্রীর) নাভী হতে হাঁটু পর্যন্ত কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা একান্ত প্রয়োজন।[১]

যদি কাপড়ে রক্ত লেগে যায়, তবে প্রথমে খড়ি দিয়ে ধুয়ে পরে কুলের পাতা পানিতে মিশিয়ে ধুবে।[২]

ঋতুবতী ঈদের দিন ইদগাহে মাসুলমানদের সাথে দোয়ায় শরীক হবে, কিন্তু নামায পড়বে না।[৩]

নিফাসের বিবরণ

নিফাসের অতিরিক্ত সময়সীমা চল্লিশদিন। (এবং সর্বনিম্ন সময়ের কোন সীমা নেই।) রক্তপাত বন্ধ হলেই গোসল করে নামায পড়বে।[৪]

জ্ঞাতব্য ঃ নিফাস হায়েজের মতই। অর্থাৎ সে অবস্থায় পুরুষের সাথে সঙ্গম করা, নামায পড়া, রোযা রাখা, কুরআন শরীফ পড়া, অপরকে পড়ান, তাতে হাত লাগান, কাবা শরীফ তওয়াফ করা এবং মসজিদে যাওয়া নিষেধ। নিফাসেও নামায মাফ এবং রোযা কাযা করতে হবে।

সন্তান প্রসবের পর জরায়ু বা রেহেম হতে যে রক্তপাত হয় তাকে নিফাস বলে। ৪০ দিনের পরও যদি রক্তস্রাব হতে থাকে তাহলে তা ইস্তিহাযা বা রোগ বিশেষ।

ইস্তিহাযার (রক্ত প্রদর) বিবরণ

স্ত্রীলোক যখন হায়েজের রক্ত ব্যতীত অন্য কোন রক্ত দেখবে তখন সে মুস্তাহাযা অর্থাৎ রক্তপ্রদরে আক্রান্ত। মুস্তাহাযা পাক মহিলার মত। (অর্থাৎ তার সাথে সঙ্গম করা জায়েয। সে নামায রোযা আদায় করবে।)

ইস্তিহাযা হবার পূর্বে প্রত্যেক মাসে যে কয়দিন মাসিক হতো সে কয়দিন অপেক্ষা করবে। অর্থাৎ নামায, রোযা ইত্যাদি কাজ, যা ঋতুবতী মহিলার জন্য নিষেধ তা করবে না। ঠিক সে কয়দিন গত হলে রক্ত ধুয়ে ফেলবে এবং গোসল করবে।[৫] অতপর প্রত্যেক নামাযের জন্য নতুন অযু করে নামায পড়বে।[৬]

---

১. নাসাঈ- আয়েশা (রা.)।
২. নাসাঈ- মায়মুনা (রা.)।
৩. নাসায়ী- উম্মে কয়স বিনতে মুহসিন (রা.)।
৪. বুখারী, মুসলিম- উম্মে সালমা (রা.)।
৫. আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজা।
৬. মুসলিম- আয়েশা (রা.)।

আর এরূপ বিধানও আছে যে, মুস্তাহাযা পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের জন্য তিনবার গোসল করবে। অর্থাৎ এক গোসলে যোহর এবং আসর জমা করে পড়বে। আরেক গোসলে মাগরিব এবং এশা পড়বে এবং ফজরের পূর্বে গোসল করে ফজর পড়বে।[১] আর সে পাঁচ ওয়াক্তের নামাযে পাঁচবার গোসল করেও নামায পড়তে পারে।[২] মুস্তাহাযার সাথে মিলন করা জায়েয।[৩]

জ্ঞাতব্য : মুস্তাহাযার পাঁচ ওয়াক্তের নামায পাঁচ গোসলে বা তিন গোসলে পড়ার কথা যা বলা হয়েছে তা ওয়াজিব নয়। অবশ্য উত্তম বটে।[৪]

অযুর বিবরণ

অযু করার সময় প্রথমে অন্তরে নিয়ত করবে।[৫] অতপর বিসমিল্লাহ্ বলে[৬] দু'হাত কব্জিসহ তিনবার ধুবে। অতপর (ডান) হাতে পানি নিয়ে অর্ধেক দ্বারা কুলি করবে এবং অর্ধেক নাকের মাঝে প্রবেশ করিয়ে (বাম হাত দিয়ে) নাক ঝেড়ে ফেলবে।[৭] আবার মুখমণ্ডল ধৌত করবে (দাড়ি থাকলে) পূর্ণ এক অঞ্জলি পানি নিয়ে দাড়ির নিচ দিয়ে খিলাল করবে।[৮] অতপর ডান হাত কনুইসহ তিনবার ও বামহাত কনুইসহ তিনবার ধুবে। উভয়হাত দু'দু বার ধুয়ার বিধানো রয়েছে।[৯]

হাত ধোয়ার সময় হাতের আঙ্গুলিতে খেলাল করবে এবং আংটি থাকলে তা ঘুরায়ে ফিরায়ে ধৌত করবে।[১০]

তারপর মাথা মাসহ করবে। ডান হাতে পানি নিয়ে বাম হাতে দিয়ে দু'হাত কপালে উপরের চুল হতে আরম্ভ করে মাথার উপর দিয়ে পিছনে নিয়ে যাবে। পিছন হতে পুনরায় আরম্ভ করার স্থানে দু'হাত ফিরিয়ে আনবে।[১১] পাগড়ীর উপর মাসহ করাও জায়েয।[১২]

---

১. বুখারী, মুসলিম- আয়েশা (রা.)।
২. আবু দাউদ- হিমনা বিনতে জাহশ (রা.)।
৩. তিরমিযী।
৪. মুসলিম- আয়েশা (রা.)।
৫. বুখারী, মুসলিম- উমর (রা.)।
৬. মিশকাত- সাঈদ ইবনে যায়েদ (রা.)।
৭. আহমাদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজা- আবু হুরায়রা (রা.)।
৮. বুখারী, মুসলিম।
৯. আবু দাউদ।
১০. বুখারী, মুসলিম।
১১. ইবনে মাজা।
১২. বুখারী, মুসলিম- আব্দুল্লাহ বিন জায়েদ বিন আ'সেম (রা.)।

(মাথা) মাসহ করার জন্য নুতন পানি নিবে।[১] অতপর কান মাসহ করার জন্য নতুন পানি নিবে।[২] কান মাসহ করার নিয়ম হলো দু'হাতের তর্জনী আঙ্গুলীদ্বয় দু'কানের ভিতরে প্রবেশ করাবে এবং বৃদ্ধাঙ্গুলিদ্বয় কানের বাহিরের দিক দিয়ে নিচ হতে উপরের দিতে টেনে মাসহ করবে।[৩] তারপর ডান পা গিরা সহ (টাখনুসহ) তিনবার ধুবে এবং বাম পা গিরাসহ তিন বার ধুবে[৪] এবং পায়ের আঙ্গুলি সমূহে খিলাল করবে।[৫] তারপর এ দোয়া পড়বে ঃ

اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ ـ

অর্থাৎ- "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই। তিনি একক তার কোন শরীক নেই এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সা.) তাঁর বান্দা ও রাসূল।" যে ব্যক্তি অযুর পরে এ দোয়া পাঠ করবে তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খোলা থাকবে, যে দরজা দিয়ে ইচ্ছে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[৬]

অযু করার সময় অন্য কারো দ্বারা অযুর অঙ্গ প্রত্যঙ্গে পানি ঢেলে নেয়া জায়েয।[৭]

অযুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এক এক বার ও দুই দুই বার ধোয়াও জায়েয।[৮] যে ব্যক্তি অজুর অবয়ব তিন বারের অধিক ধুবে, সে খারাপ আচরণ করলো এবং সীমা লংঘন ও জুলুম করলো।[৯]

অযু করার সময় যদি নখ পরিমাণ জায়গাও শুকনো থেকে যায় তবে পুনরায় অযু করতে হবে।*[১০]

---

১. মুসলিম- আব্দুল্লাহ বিন জায়দ (রা.)।
২. বায়হাকী- আব্দুল্লাহ বিন জায়দ (রা.)।
৩. নাসাঈ-ইবনে আব্বাস (রা.)।
৪. বুখারী, মুসলিম- উসমান (রাঃ)।
৫. তিরমিযী, ইবনে মাজা-ইবনে আব্বাস (রা.)।
৬. মুসলিম-উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)।
৭. বুখারী, মুসলিম- মুগীরা (রা.)।
৮. বুখারী।
৯. আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজা-আমর ইবনে শোয়াইব (রা.)।
১০. আহমদ, আবু দাউদ- খালিদ ইবনে মা'দান (রা.)।
* যদি অযু করার সময় কোন জায়গা শুকনো থাকে তবে তা ধুলে বা ভিজালেই জায়েয হবে। অবশ্য পুনরায় অযু করাটা উত্তম। (আবু দাউদ)।

(প্রয়োজন না পড়লে) অযুর অংগ সমূহ রুমাল বা চাদর দিয়ে মুছবে না[১] এবং অযুর শেষে পাজামা বা কাপড়ের উপর শরমগাহের দিকে পানির ছিটা দিবে. (তাতে সন্দেহ দুর হয়।)[২]

এক অযুতে কয়েক ওয়াক্তের নামায পড়াও জায়েয।[৩]

যদি অযু করার সময় কোন জায়গা শুকনো থাকে তবে তা ধুলে বা ভিজালেই জায়েয হবে। অবশ্য পুনরায় অযু করাটা উত্তম।

অযু করার সময় যখন কেউ কুলি করে, নাকে পানি দেয়, নাক ঝাড়ে তখন তার মুখের এবং নাকের ভিতরের গুনাহ্ গুলি খসে পড়ে। অতপর যখন মুখমণ্ডল ধোয়, তখন মুখমণ্ডলের গুনাহ্ পানির সাথে দাড়ির দু'পাশ দিয়ে ঝরে পড়ে। যখন দুই হাত কনুই পর্যন্ত ধোয়, তখন তার গুনাহ্ গুলি আঙ্গুলের ডগা দিয়ে পানির সাথে ঝরে পড়ে। অতপর যখন মাথা মাসহ্ করে, তখন তার গুনাহ্ সমূহ কেশের পার্শ দিয়ে ঝরে পড়ে। যখন দুই পা গিরাসহ ধোয় তখন তার পাপরাশি পায়ের আঙ্গুলির ডগা দিয়ে খসে পড়ে। তারপর যদি সে নামাযে দাঁড়ায় এবং আল্লাহ্ তা'য়ালা যে রূপ সম্মানের অধিকারী, সে রূপে তার গুণগান করে এবং হুজুর দিলে নামায পড়ে তবে সে আপন গুনাহ্ হতে সদ্যজাত সন্তানের মত পাক পবিত্র হয়ে ফিরে আসে।[৪]

অযু ভঙ্গকারী বস্তুসমূহের বিবরণ

কারো অযু না থাকলে বা অযু সঠিক না হলে নামায কবুল হয় না।[৫]

বায়ু নির্গত হলে নতুন ভাবে অযু করে নামায পড়বে।[৬]

জ্ঞাতব্য ঃ বায়ু বের হলে, পায়খানা ও পেশাবের রাস্তা দিয়ে কিছু বের হলে এবং যে সমস্ত কারণে গোসল ওয়াজিব হয়, সে সমস্ত কারণে অযুও নষ্ট হয়ে যায়।[৭]

নামাযের মধ্যে বাতকর্ম হয়েছে কিনা? কারো এরূপ সন্দেহ হলে- যে পর্যন্ত শব্দ না শুনে বা গন্ধ না পায়, যে পর্যন্ত অযু করবে না।[৮]

---

১. বুখারী, মুসলিম- মায়মুনা (রা.)।
২. আবু দাউদ- হাকাম বিন সুফিয়ান (রা.)।
৩. মুসলিম- বুরায়দা (রা.)।
৪. মুআত্তা মালেক।
৫. বুখারী- আবু হুরায়রা (রা.)।
৬. প্রাগুক্ত।
৭. আহমাদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজা- আলী বিন তলক (রা.)।
৮. মুসলিম- আবু হুরায়রা (রা.)।

শুয়ে ঘুমালে অযু নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু বসে তন্দ্রা আসলে অযু নষ্ট হয় না।[১] (অনাবৃত) পুরুষাঙ্গে হাত লাগলে অযু নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু মাঝে যদি কাপড় বা কোন কিছুর আড় থাকে তবে অযু নষ্ট হয় না। এইরূপ মহিলার গুপ্তাঙ্গে হাত লাগালে (বিনা পর্দায়) মহিলার অযু নষ্ট হয়ে যাবে।[২]

জ্ঞাতব্য ঃ হাদীসে যে শব্দটি উল্লেখিত হয়েছে তাহলে فرج (ফারজ)। فرج বলতে পুরুষ এবং স্ত্রীলোক উভয়ের পেশাব-পায়খানার রাস্তাকে বুঝায়। সুতরাং উভয়েরই পেশাব এবং পায়খানার রাস্তায় বিনা পর্দায় হাত লাগালে অজু নষ্ট হবে।[৩] মুযী বের হলে অজু নষ্ট হয়ে যায়।[৪]

বমি হলে ও নাক দিয়ে রক্ত পড়লে অযু নষ্ট হবে।*[৫] উটের গোস্ত খেলে অযু নষ্ট হয়ে যায়।[৬]

নামাযের ওয়াক্তের বিবরণ

সূর্য্য ঢলে পড়লেই যোহরের ওয়াক্ত হয়ে যায়[৭] এবং সূর্য এতদুর থাকতে আসরের নামাযের ওয়াক্ত হয়ে যায়, যেন চার ক্রোশ (আট মাইল) যাওয়ার পর সূর্য্য অস্ত যায়।[৮]

জ্ঞাতব্য ঃ প্রত্যেক বস্তুর ছায়া এক ছায়া হতে আরম্ভ করে সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত আসরের সময়।[৯] সূর্য ডুবলেই মাগরিবের ওয়াক্ত হয়ে যায় এবং পশ্চিম আকাশের লাগ রেখা বিলীন না হওয়া পর্যন্ত এর ওয়াক্ত থাকে।[১০]

এশা'র নামাযের ওয়াক্ত পশ্চিমাকাশের লাল আভা বিলীন হওয়ার পর হতে অর্ধরাত পর্যন্ত থাকে।[১১] সুবহে সাদিক অর্থাৎ পূর্বাকাশ শ্বেত বর্ণ হতে আরম্ভ করে

---

১. মুসলিম- আবু হুরায়রা (রা.)।
২. আহমাদ, নায়লুল আওতার।
৩. নায়লুল আওতার।
৪. বুখারী, মুসলিম- হযরত আলী (রা.)।
৫. তিরমিযী- আবু দারদা (রা.)।
৬. আবু দাউদ- আয়েশা (রা.)।
৭. মুসলিম- জাবের ইবনে সামরা (রা.)।
৮. মুসলিম- ইবনে উমর (রা.)।
৯. আবু দাউদ, তিরমিযী।
১০. বুখারী, মুসলিম- আনাস (রা.)।
১১. মুসলিম- আব্দুল্লাহ বিন জায়দ (রা.)।
* এ হাদীসটি দুর্বল। সুতরাং তাতে অযু নষ্ট হবে না। পেশাব ও পায়খানার রাস্তা ব্যতীত অন্য কোন স্থান হতে রক্ত বের হলে অযু নষ্ট হবে না (আওনুল মা'বুদ, তোহফা)

সূর্য উঠা পর্যন্ত ফজরের সময়।[১] ভীষণ গরমের সময় যোহরের নামায কিছু দেরী করে পড়া ভাল[২] এবং শীতের সময় যোহরের নামায তাড়াতাড়ি পড়বে।[৩]

যে ব্যক্তি আসরের নামায আখেরী ওয়াক্তে পড়ে, তার নামায মুনাফিকের নামাযের মত।[৪]

যে ব্যক্তি আসরের নামায পড়ে না, তার আমল নষ্ট হয়ে যায়। (অর্থাৎ- তার পূর্বের নামাযও নষ্ট হয়ে যায়।)[৫] ফজরের নামায অন্ধকার থাকতে পড়া উচিৎ।[৬] ফজরের নামায যতদূর সম্ভব মুক্তাদীদের ধৈর্য অনুযায়ী লম্বা কিরায়াতা পড়বে কিন্তু তাদেরকে অসুবিধায় বা কষ্টে নিপতিত করা উচিৎ নয়।[৭]

গরমের মওসুমে ফজরের নামায ফর্সা করে পড়া উচিৎ। কারণ তখন রাত ছোট হয়ে থাকে।[৮]

কাযা নামায পড়ার নিয়ম

কোন কারণে নামায ছুটে গেলে পূর্বের বাকী নামায এবং আদা-হালী নামাযের মাঝে তরতীব ওয়াজিব। অর্থাৎ আগের নামায আগে ও পরের নামায পরে পড়তে হবে।[৯]

ভুলবশত এবং ঘুমিয়ে যাওয়ার জন্য নামায পড়া না হয়ে থাকলে তা পড়ার বিবরণ

যে ব্যক্তি নামায পড়তে ভূলে যাবে, সেটি যখনই তার স্মরণে আসবে তখনই তা পড়ে নিবে।[১০]

যদি ঘুমের অবস্থায় নামাযের সময় শেষ হবার উপক্রম হয় বা চলে যায়, তাহলে যখন ঘুম হতে জাগবে তখনই নামায পড়ে নিবে।[১১]

---

১. মুসলিম- ইবনে উমর (রা.)।
২. বুখারী, মুসলিম-আবু হুরায়রা (রা.)।
৩. বুখারী।
৪. মুসলিম- আনাস (রা.)।
৫. আহমাদ, নাসাঈ, ইবনে মাজা- বুরায়দা (রা.)।
৬. মুসলিম- আনাস (রা.)।
৭. শরহুস্ সুন্নাহ- মুয়ায বিন জাবাল (রা.)।
৮. শরহুস সুন্নাহ্।
৯. বুখারী, মুসলিম- জাবের (রা.)।
১০. বুখারী, মুসলিম- আনাস (রা.)।
১১. মুসলিম- জাবের (রা.)।

নামায তরককারীর (বেনামাযীর) বর্ণনা

যে নামায পড়ে না সে কাফির অর্থাৎ ধর্মহীন।[১] বেনামাযীকে সাহাবায়ে কিরাম (রা.) কাফির জানতেন।* [২]

আযানের বিবরণ

উত্তম নিয়ম এটাই যে আযান দাতা প্রথমে অজু করবে।[৩] তারপর নিম্ন লিখিত রূপে আযান দিবে ঃ[৪]

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

(অর্থঃ আল্লাহ্ সর্ব শ্রেষ্ঠ। ৪ বার)

اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ، اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ

(অর্থঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই। ২ বার)

اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ، اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ

(অর্থঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর রাসূল। ২ বার)

حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ ، حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ

(অর্থঃ নামাযের জন্য এসো, নামাযের জন্য এসো। ২ বার)

حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ ، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ

(অর্থঃ মঙ্গলের জন্য এসো, মঙ্গলের জন্য এসো। ২ বার) তারপর শুধু

---

১. সুনানে আরবা- বুরায়দা (রা.)।

২. তিরমিযী- আব্দুল্লাহ ইবনে শাকীক (রা.)।

৩. তিরমিযী- আবু হুরায়রা (রা.)।

৪. আযানের হাদীসটি আবু দাউদ, তিরমিযীসহ অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।

* নামায তরককারীর দু'টি অবস্থা। (এক) নামায ফরজ হবার কথা জেনে বুঝেও আদায় করতে অস্বীকার করা। এরকম হলে উলামাদের সম্মিলিত মতে সে কাফির এবং তার শাস্তি হচ্ছে মৃত্যুদন্ড। (দুই) নামায ফরজ জেনেও অবহেলা করে নামায আদায় করে না। যেমনটি আজ অধিকাংশ মুসলমানদের অবস্থা। এ অবস্থায় তাকে তৌবা করার নির্দেশ দেয়া হবে। এ সুযোগ সে গ্রহণ না করলে শরিয়ত মোতাবেক তার শাস্তির ব্যাপারে উলামাদের মাঝে মত পার্থক্য রয়েছে। ইমাম আহমাদের (রহ.) মতে সে কাফির এবং তাকে হত্যা করা হবে। ইমাম মালেক এবং শাফেরীর (রহঃ) মতে সে ফাসিক এবং তাকে 'হদ' হিসেবে হত্যা করা হবে। ইমাম আবু হানিফার (রহ.) মতে তাকে নামায না পড়া পর্যন্ত বন্দী করে রাখতে হবে। (নায়লুল আওতার খ. ১, পৃ. ২৯১)

ফজরের ওয়াক্তে বলবে-

اَلصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ، اَلصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ -

(অর্থঃ ঘুম হতে নামায উত্তম। ২ বার)

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ، لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ -

(অর্থঃ আল্লাহ সর্ব শ্রেষ্ট। (২ বার) আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই)।

তরজীর সঙ্গে আযান দেয়াও সুন্নত। তার নিয়ম এই যে, শুধু আশহাদু আল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ ২ বার অনুচ্চস্বরে ও আশাহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ্ ২ বার অনুচ্চস্বরে বলে পুনরায় আশহাদু আল্‌লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ উচ্চ স্বরে বলবে এছাড়া এর উপরের অংশ ও নীচের অংশগুলি পুর্বোল্লিখিত ভাবেই বলবে।[১]

আযানদাতা দুই তর্জনী আঙ্গুলী দু'কানের ছিদ্রের মাঝে দিয়ে আযান দিবে। (ডান দিকে) ঘাড় ফিরায়ে হাইয়া আলাস্ সলাহ্ ২ বার ও (বাম দিকে) ঘাড় ফিরায়ে হাইয়া আলাল ফালাহ্ ২ বার বলবে।[২] আযান শ্রবনকারী মুযায্যীনের সাথে আযানের শব্দগুলি বলে যাবে। শুধু হাইয়া আলাস্ সলাহ ও হাইয়া আলাল ফালাহ্ বলার সময় لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ বলবে। আযান শেষ হলে রাসূলের উপর এভাবে দরুদ পড়বে,

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ - اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ -

অর্থাৎ- হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মদ (সা.) ও তার বংশধরগণের উপর অনুগ্রহ কর, যেমন ইব্রাহীম (আ.) ও তার বংশধরগণের উপর অনুগ্রহ করেছে। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসিত ও সম্মানী। হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মদ (সা.) ও তার বংশধরগণের উপর বরকত নাজিল কর, যেমন ইব্রাহীম (আ.) ও তার বংশধরগণের উপর

---

১. আবু দাউদ- আবু মাহযুরা (রা.)।

২. আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজা, বুলুগুল মারাম- আবু হুজায়ফা (রা.)।

বরকত নাজিল করেছে। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসিত ও সম্মানী।[১] অতপর এ দোয়া পড়বে-

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلٰوةِ الْقَائِمَةِ اٰتِ مُحَمَّدًا نِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُوْدًا نِ الَّذِىْ وَعَدْتَهُ -

অর্থাৎ- 'হে এই পরিপূর্ণ আহব্বান (আযান) ও প্রতিষ্ঠিত নামাযের প্রভু! মুহাম্মদ (সা.)-কে অসিলা (বেহেশতের সর্বোচ্চ স্থান) ও সম্মান দান কর এবং তাকে মাকামে মাহমুদে পৌঁছাও; যার তুমি ওয়াদা করেছ।' রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি এ দোয়া পড়বে, কিয়ামতের দিন তার শাফায়াত করা আমার উপর ওয়াজিব হয়ে যাবে।[২]

আযানের শেষে নিম্নলিখিত দোয়াটি পড়ার বিধানও রয়েছে ঃ

اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُوْلُهُ رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِمُحَمَّدٍ رَّسُوْلاً وَبِالاِسْلاَمِ دِيْنًا -

অর্থাৎ- আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই। তিনি এক, তার কেউ শরীক নাই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সা.) তার বান্দা ও রাসূল। আমি আল্লাহকে রব হিসেবে, মুহাম্মদ (সা.)-কে রাসূল হিসেবে এবং ইসলামকে জীবন বিধান হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট আছি।[৩]

উচ্চস্বর বিশিষ্ট লোককে মুয়াযযিন নিযুক্ত করা ও উচুস্থান হতে আযান দেয়া উচিত[৪] এবং যে ব্যক্তি বিনা বেতনে আযান দিবে তাকে মুয়াযযিন নিযুক্ত করা উচিত।[৫]

---

১. মুসলিম।

২. মুসলিম- সা'দ ইবনে আবী অক্কাস (রা.)।

৩. আহমাদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজা- আবু হুরায়রা (রা.)।

৪. আহমাদ।

৫. আহমাদ, সুনানে আরবা- উসমান বিন আবীল আ'স (রা.)।

যে আযান দিবে, সে তকবীর (ইকামত) বলারও হকদার।[১] সফরেও আযান ও তকবীর দিয়ে নামায পড়া উচিৎ এবং যিনি উপস্থিত সকল লোক হতে শ্রেষ্ঠ তাকেই ইমাম নিযুক্ত করতে হবে।[২]

এক মসজিদে দু'জন মুয়ায্যিন নিযুক্ত করা মুস্তাহাব। একজন সুবহে সাদেকের পূর্বে আযান দেয়ার জন্যে এবং দ্বিতীয়জন সুবহে সাদেকের পরে আযান দেয়ার জন্যে।* [৩]

আযান এবং তকবীর বলার মধ্যবর্তী সময়ে দোয়া কবুল হয়।[৪]

তাকবীর বা ইকামত বলার নিয়ম

নামযের জন্য তাকবীর বা ইকামত নিম্নলিখিত রূপে বলবে :[৫]

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ، اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ ، اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ ، حَىَّ عَلَى الصَّلٰوةِ ، حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ ، قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ، لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ ـ

আযান শ্রবনকারী যেভাবে মুয়ায্যিনের সঙ্গে সঙ্গে আযানের শব্দগুলি বলে, তকবীর শ্রবণকারীও সেভাবে মুকাব্বিরের সঙ্গে সঙ্গে তকবীরের শব্দগুলি (অনুচ্চস্বরে) বলবে। কেবল মাত্র মুকাব্বির যখন কাদ কা মাতিস্ সালাহ্ বলবে, তখন শ্রবনকারী اَقَامَهَا اللّٰهُ وَاَدَامَهَا (অর্থ- আল্লাহ পাক নামাযকে কায়েম রাখেন ও চিরস্থায়ী করেন।) পূর্বাপর অন্যান্য শব্দগুলি তকবীর দাতার মতই বলবে।[৬]

---

১. বুখারী, মুসলিম।

২. বুখারী।

৩. আবু দাউদ, তিরমিযী- আব্দুল্লাহ বিন জায়দ আনসারী (রা.)।

৪. আহমাদ।

৫. আবু দাউদ।

৬. আবু দাউদ।

* রাসূলুল্লাহ (সা.) রমজানে দুইজন মুয়ায্যিন নিযুক্ত করেছিলেন। একজন সেহরী খাবার পূর্বে আযান দিতেন এবং অপর জন সেহরীর সময় শেষ হলে আযান দিতেন।

মসজিদের বিবরণ

যে ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে মসজিদ তৈরী করে, আল্লাহ তা'য়ালা তার জন্য জান্নাতে ঘর তৈরী করেন।[১]

মসজিদে প্রবেশ করার সময় এ দোয়া পড়বে ঃ

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ -

অর্থাৎ- হে আল্লাহ! তুমি আমার জন্য রহমতের দরজা সমূহ খুলে দাও।[২]

এবং মসজিদ হতে বের হবার সময় এ দোয়া পড়বে ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ -

অর্থাৎ- হে আল্লাহ! আমি তোমারই করুনা চাচ্ছি।[৩]

মসজিদে প্রবেশ করার সয়ম এ দোয়াটি পড়ার বিধানও এসেছে ঃ

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَبِسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ -

অর্থাৎ- আমি মহান আল্লাহ নিকট তার সম্মানিত সত্তা এবং তার রাজত্বের যা অতিব পুরাতন- মাধ্যমে আশ্রয় চাচ্ছি বিতাড়িত শয়তান হতে।[৪]

রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করার সময় এ দোয়া পাঠ করে তখন শয়তান বলে এ বান্দা আমার অনাচার হতে সারাদিন রক্ষা পেল।[৫] যে ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করবে, সে বসার পূর্বে দুই রাকাত নামায পড়বে।[৬] মসজিদের মাঝে শোয়া জায়েয।[৭]

যে ব্যক্তি ভালভাবে অযু করে নামায পড়ার জন্য মসজিদে যায় এবং তার পৌছার আগেই জামায়াত হয়ে যায়, তাহলে সে জামায়াতের সওয়াব পাবে।[৮]

বাড়িতে নামায পড়ার চেয়ে ওয়াক্তিয়া মসজিদে নামায পড়লে পঁচিশ গুণ,

---

১. আবু দাউদ।
২. বুখরী, মুসলিম- উসমান (রা.)
৩. মুসলিম- আবু উসাইদ (রা.)।
৪. আবু দাউদ- আমর ইবনুল আ'স (রা.)।
৫. বুখারী মুসলিম- আবু কাতাদাহ (রা.)।
৬. তিরমিযী- ইবনে উমর (রা.)।
৭. আবু দাউদ- আবু হুরায়রা (রা.)।
৮. ইবনে মাজা- আনাস (রা.)।

জামে মসজিদে পড়লে পাঁচশ' গুণ, মসজিদে আকসায় এবং মসজিদে নববীতে পড়লে পঞ্চাশ হাজার গুণ এবং কাবা ঘরে নামায পড়লে এক লাখ গুণ বেশী নেকী হয়।

নাপাকী (আবর্জনা) ফেলার জায়গায়, পশু যবহ করার স্থানে, রাস্তার মাঝখানে, গোসল খানায়, উট বাঁধার জায়গায় এবং কাবাঘরের (মূল ঘরের) ছাদের উপর নামায পড়া নিষেধ।[১]

মসজিদের মাঝে নামাযের অবস্থায় কেবলার দিকে থুথু ফেলা গুনাহর কাজ যদি অগত্যা ফেলতে হয়, তাহলে বাম দিকে অথবা পায়ের নীচে ফেলবে। আর উত্তম হচ্ছে, কাপড়ে থুথু ফেলে তা কাপড়ের সাথে মিশিয়ে ফেলা।[২]

মসজিদে থুথু ফেলার কাফ্ফারা হলো তা মুছে ফেলা।[৩] খুব মন্দকাজ সমূহের মাঝে সবচেয়ে মন্দ ও খারাপ কাজ হলো, মসজিদে থুথু ফেলে তা মুছে না ফেলা।[৪] মসজিদ হতে যার বাড়ী যত দূর হবে, তার চলার প্রতি ধাপের নেকী তার আমলনামায় লেখা যাবে।[৫]

যে ব্যক্তি মসজিদে হারান জিনিস খোজ করে, তাকে বলা উচিত, খোদা করুন যে তুমি এটা না পাও।[৬] যদি কেউ মসজিদে বেচাকিনা করে, তাহলে তাকে বলা উচিৎ যে, খোদা যেন এ ব্যবসায় তোমাকে লাভবান না করেন।[৭]

কাঁচা পেয়াজ ও রসুন খেয়ে মসজিদে যাওয়া নিষেধ। কেননা এতে ফেরেস্তাদের কষ্ট হয়।[৮]

মসজিদে বাতি জ্বালালে বা তেল দিলে অনেক নেকী পাওয়া যায়।[৯] মসজিদে ঝাড়ু দিলে ও আবর্জনা তুলে ফেললে অনেক সওয়াব হয়।[১০]

---

১. তিরমিযী, ইবনে মাজা- ইবনে উমর (রা.)।
২. বুখারী- আনাস (রা.)।
৩. বুখারী, মুসলিম- আনাস (রা.)।
৪. মুসলিম।
৫. বুখারী, মুসলিম- আবু মুসা (রা.)।
৬. মুসলিম- আবু হুরায়রা (রা.)।
৭. নাসাঈ- আবু হুরায়রা (রা.)।
৮. বুখারী, মুসলিম- জাবের (রা.)।
৯. আবু দাউদ- মায়মুনা (রা.)।
১০. তিরমিযী, আবু দাউদ- আনাস (রা.)।

যে ব্যক্তি নামায পড়ে অজু ভঙ্গ না হওয়া পর্যন্ত উক্ত জায়নামাযে বসে থাকে, উঠে না দাড়ায় তাহলে সে পর্যন্ত ফেরেস্তারা এ দোয়া করতে থাকে, প্রভু হে! তাকে ক্ষমা কর, প্রভু হে! তার উপর রহমত কর।[১] যে ব্যক্তি আযান শুনে মসজিদ থেকে চলে যায়, সে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর অবাধ্য হয়ে যায়।[২]

কিন্তু যে মসজিদে বিদআতের কাজ হয় এবং বিদআতের কারণেই যদি আযান শুনে চলে যায় তবে কোন গুনাহ নাই।[৩]

সতর ঢাকার বিবরণ

যে স্ত্রীলোকের হায়েজ আরম্ভ হয়েছে অর্থাৎ সাবালিকা হয়েছে, তার নামায আল্লাহ্ পাক বিনা চাদর-ওড়নায় কবুল করবেন না। অর্থাৎ সমস্ত শরীরের উপর কাপড় দিয়ে ঢেকে নামায পড়বে। জামা-পাজামার উপরও চাদর জড়াতে হবে।[৪]

একাধিক কাপড় থাকলেও (পুরুষের জন্য) একখানা কাপড়ে নামায পড়া জায়েয।[৫] পুরুষের জন্য একই (লম্বা) জামা পরে নামায পড়া জায়েয। কিন্তু জামার বোতাম বা গুন্টি অবশ্যই লাগাতে হবে।[৬]

যে জামা পায়ের পৃষ্ঠদেশ ঢেকে নেয়, স্ত্রীলোকদের সে জামা ও চাদর পরে বিনা তহবন্দে নামায পড়া জায়েয।[৭] শুধু তহবন্দ পরে আরো একখানা কাপড় কাঁধে না দিয়ে নামাজ পড়বে না।[৮]

যে কাপড় মাথা কিম্বা কাঁধের উপর থাকে, তার দুই প্রান্ত ঝুলিয়ে রেখে নামায পড়বে না। বরং বগল মেরে (প্রান্তদ্বয় কাঁধের উপরে উঠায়ে) নামায পড়বে।[৯]

---

১. আবু দাউদ- আবু হুরায়রা (রা.)।

২. আবু দাউদ, তিরমিযী- আবু শা'শা (রা.)।

৩. আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজা- আয়েশা (রা.)।

৪. বুখারী-মুহাম্মদ বিন মুনকাদার (রা.)।

৫. আবু দাউদ, নাসাঈ- সালামা ইবনুল আক'ওয়া (রা.)।

৬. আবু দাউদ- উম্মে সালমা (রা.)।

৭. বুখারী, মুসলিম- আবু হুরায়রা (রা.)।

৮. আবু দাউদ, তিরমিযী- আবু হুরায়রা (রা.)।

৯. ইবনে মাজা- আবু হুরায়রা (রা.)।

নামাযীর সামনে দিয়ে গমনাগমনের বর্ণনা

নামাযীর সম্মুখ দিয়ে নামায পড়ার সময় যাতায়াত করলে কি পরিমাণ গুণাহ্ হয়? যার জানা আছে, তার পক্ষে শত বছর দাঁড়িয়ে থাকাও ভাল তবুও যেন সে তার সামনে দিয়ে না যায়।[১] আর এ রকমও বর্ণিত আছে যে, নামাযী ব্যক্তির সামনে দিয়ে যাতায়াত করলে কি পরিমাণ গুনাহ্ হয় তা কারো জানা থাকলে সে মাটি ধ্বসে তার তলায় বিলীন হয়ে যাওয়াকেও সহজ মনে করবে তার সামনে দিয়ে যাওয়ার চেয়ে।[২]

যে ব্যক্তি নামায পড়বে সে তার সামনে সুতরা গেড়ে নিবে। তবুও যদি কেহ সুতরার মধ্যদিয়ে যায় তাকে নিষেধ করবে। যদি না শুনে তাহলে (লড়াই করবে) হাত দিয়ে বাধা দিবে। কেননা তার সঙ্গী হচ্ছে শয়তান।[৩]

নামায পড়ার নিয়ম ঃ

প্রথমে (অন্তঃকরণে) নামাযের জন্য নিয়্যত* করবে।[৪] অতপর কেবলার দিকে মুখ করে হাত উঠায়ে আল্লাহ্ আকবার বলবে।[৫] হাতের আঙ্গুলীগুলো খোলা রাখবে[৬] এবং হস্তদ্বয় কাঁধ কিম্বা কান পর্যন্ত উঠাবে।[৭] অতপর ডান হাত বাম হাতের উপরে করে বুকের উপরে বাঁধবে।[৮] তারপর মনে মনে এ দোয়া পাঠ করবে ঃ

اَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ خَطَايَاىَ كَمَا بَاعَدْتَّ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اَللّٰهُمَّ نَقِّنِيْ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اَللّٰهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَاىَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ .

---

১. ইবনে মাজা।
২. মুয়াত্তা মালেক- কা'ব ইবনে আহবার (রা.)।
৩. বুখারী, মুসলিম- আবু সাঈদ খুদরী (রা.)।
৪. বুখারী, মুসলিম- উমর (রা.)।
৫. বুখারী- আবু হুমাইদ সায়েদী (রা.)।
৬. তিরমিযী- আবু হুরায়রা (রা.)।
৭. মুসলিম।
৮. ইবনে খুজাইমা, নায়লুল আওতার।
* নিয়্যত বলতে অন্তরের ইচ্ছাকেই বুঝায়। এ কারণে মুখে নিয়্যতের উচ্চারণ করাকে বিদআত বলা হয়েছে। দেখুন দুররে মুখতার ৪৯/১ আয়নুল হিদায়া ২২/১।

অর্থাৎ- হে আল্লাহ! আমার এবং আমার পাপরাশির মধ্যে পূর্ব ও পশ্চিমের মত ব্যবধান করে দাও। হে আল্লাহ! আমাকে গুনাহ্ হতে পরিষ্কার কর যেমন সাদা কাপড় ময়লা হতে পরিষ্কার করা হয়। হে প্রভু! আমার সমস্ত পাপ পানি, বরফ এবং শিলার পানি দিয়ে ধুয়ে দাও।[১] তারপর চুপে চুপে এভাবে তা'আউয পড়বে,

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمْزِهٖ وَنَفْخِهٖ وَنَفْثِهٖ -

অর্থঃ আমি আশ্রয় চাচ্ছি, মহাজ্ঞানী শ্রবনকারী আল্লাহর নিকট বিতাড়িত শয়তানের পাপ- প্রবঞ্চনা ও কুমন্ত্রণা হতে।[২]

অতপর চুপে চুপে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পড়বে।[৩]

জ্ঞাতব্য ঃ ফজর, মাগরিব এবং এশা নামাযে বিসমিল্লাহ্ জোরে পড়াও জায়েয। কিন্তু অধিকাংশ সহীহ্ হাদীসে নীরবে পড়ার কথাই সাব্যস্ত রয়েছে। যদি কেউ জোরে বিসমিল্লাহ্ পড়ে তাহলে তাকে নিন্দা (ভর্ৎসনা) করা চলবে না।

তারপর ফরজ, মাগরিব ও এশা নামাযে জোরে এবং যোহর ও আসর নামাযে আস্তে সূরা ফাতিহা পড়বে।[৪]

সূরা ফাতিহা ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ - اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ - غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ - (اٰمِيْنَ).

অর্থাৎ- "সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য যিনি সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক।

---

১. বুখারী, মুসলিম- আবু হুরায়রা (রা.)।
২. আবু দাউদ, তিরমিযী।
৩. আহমাদ, সুনানে আরবা- আবু সাঈদ খুদরী (রা.)।
৪. বুখারী, মুসলিম।

(যিনি) পরম করুনাময় ও দায়ালু। (তিনি) বিচার দিনের মালিক। আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করছি এবং তোমারই নিকট সাহায্য চাচ্ছি। তুমি আমাদের সরল পথের হেদায়াত দাও। তাদের পথ যাদের উপর তুমি অনুগ্রহ করেছ। যাদের উপর তুমি রাগান্বিত ও যারা পথ ভ্রষ্ট তাদের পথ নয়।"

সূরা ফাতিহা পড়া ছাড়া নামায সঠিক হয় না।[১] ইমামের পিছনে মুক্তাদীও চুপে চুপে সূরা ফাতিহা পড়বে।[২] ফজর, মাগরিব ও এশার নামাযে ইমাম সূরা ফাতিহার পর জোরে 'আমীন' বলবে[৩] এবং মুক্তাদীও ইমামের আমীনের শব্দ শুনে জোরে আমীন বলবে।[৪] এরূপ বিধানও আছে যে, ইমাম যখন وَلَا الضَّالِّيْنَ বলবে তখন মুক্তাদী জোরে 'আমীন' বলবে।[৫]

আমীন বলার পর একটু চুপ থাকবে।[৬] তারপর বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম পড়বে।[৭] তারপর কুরআন মজীদ হতে যে কোন সূরা তা ছোট হোক বা বড় হোক যা স্মরণে আছে পড়বে।[৮]

জ্ঞাতব্য ঃ সাধারণ অল্পশিক্ষিত লোকদের জন্য সূরা ইখলাস পাঠ করাও যথেষ্ট।

সূরা ইখলাস

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ - اَللّٰهُ الصَّمَدُ - لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ - وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا اَحَدٌ -

অর্থাৎ- 'বলুন, তিনি আল্লাহ একক। আল্লাহ মুখাপেক্ষিহীন। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাঁকে জন্ম দেয়নি আর তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।'

জ্ঞাতব্য ঃ এ সূরায় আল্লাহর গুণাবলীর বর্ণনা করা হয়েছে। এজন্যই অন্য সূরা পাঠ করার চেয়ে অশিক্ষিত লোকদের জন্য এ সূরা পাঠ করাই ভাল মনে করা হয়েছে।[৯] ইমাম যদি সূরা ত্বীন পড়ে, যখন তিনি

اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحَاكِمِيْنَ -

১. বুখারী, মুসলিম- উবাদা বিন সামেত (রা.)।
২. আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ- উবাদা বিন সামেত (রা.)।
৩. তিরমিজী, আবু দাউদ, দারেমী- অয়েল বিন হুজুর (রা.)।
৪. বুখারী- আতারেদ (রা.)।
৫. বুখারী- আবু হুরায়রা (রা.)।
৬. আবু দাউদ, তিরমিযী।
৭. দারকুতনী- আবু হুরায়রা (রা.)।
৮. মুয়াত্তা মালেক- আমর বিন শোয়াইব (রা.)
৯. বুখারী, মুসলিম- আয়েশা (রা.)।

(অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা কি সব বিচারকের বিচারক নন?) বলবে তখন (ইমাম ও মুক্তাদী) এ দোয়া পাঠ করবে-

بَلٰى وَاَنَا عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ ـ

(অর্থাৎ- হাঁ এবং আমি এর উপর সাক্ষ্যদাতাদের অন্তর্ভূক্ত।) আর যদি সূরা কিয়ামতের শেষ আয়াতের এ অংশটুকু পড়ে

اَلَيْسَ ذٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلٰى اَنْ يُّحْيِىَ الْمَوْتٰى ـ

(অর্থাৎ- আল্লাহ তা'য়ালা কি মৃতকে জীবিত করতে সক্ষম নন?) তাহলে বলবে بَلٰى (অর্থাৎ হাঁ! তিনি সক্ষম) আর সূরা মুরসালাতের এ আয়াত পাঠ করলে ـ فَبِاَيِّ حَدِيْثٍ بَعْدَهٗ يُؤْمِنُوْنَ (অর্থাৎ এরপর আর কোন কথার দ্বারা ঈমান আনবে?) তাহলে اٰمَنَّا بِاللّٰهِ। (আমরা আল্লাহর উপর ঈমান এনেছি) বলবে। আর যদি سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى (অর্থাৎ তোমরা মহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা বর্ণনা কর) পড়ে তাহলো- سُبْحَانَ رَبِّىَ الْاَعْلٰى। (আমার মহান প্রতিপালক অতি পবিত্র) বলবে।[১]

ইমাম সাহেব যোহর ও আসরের প্রথম দু'রাকাতে সূরা ফাতিহা এবং আরো দু'টি সূরা পড়বে।[২] আর শেষ দু'রাকাতে যদি শুধু সূরা ফাতিহা পড়ে তাহলেই যথেষ্ট। অবশ্য সূরা ফাতিহার সাথে অন্য সূরা পাঠ করাই উত্তম।[৩] যোহর এবং আসরের নামাযে সূরা লাইল ও সূরা আ'লা পড়বে কিম্বা বুরুজ ও তারেক বা অনুরূপ সূরাগুলি পড়বে।[৪]

মাগরিবের নামাযে সূরা তুর পাঠ করবে অথবা সূরা মুরসিলাত[৫] কিম্বা উভয় রাকাতে সূরা আ'রাফ পাঠ করবে[৬] অথবা সূরা কাফিরুন ও সূরা ইখলাস পড়বে।[৭]

---

১. আবু দাউদ, মিশকাত।

২. বুখারী, মুসলিম- আবু কাতাদাহ (রা.)।

৩. মুসলিম- আবু সাঈদ খুদরী (রা.)।

৪. মুসলিম, নাসাঈ।

৫. বুখারী, মুসলিম- উম্মে ফজল বিনতে হারেস (রা.)।

৬. নাসাঈ- আয়েশা (রা.)।

৭. মিশকাত।

এশার নামাযে সূরা শামস ও সূরা যোহা অথবা সূরা লাইল ও সূরা আ'লা পাঠ করবে।[১]

ফজরের নামাযে সূরা কাফ এবং অনুরূপ অন্য সূরা সমূহ পাঠ করবে।[২]

জুমার দিন ফজরের প্রথম রাকাতে আলিফ লাম মীম তানজীল (সূরা সাজদা) এবং দ্বিতীয় রাকাতে সূরা দাহার পাঠ করবে।[৩] আর যদি সময় কম থাকে তাহলে সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়বে।[৪] অথবা উভয় রাকাতেই সূরা জিলজাল পাঠ করবে।[৫] আর ফজরের দু'রাকাত সুন্নাত নামাযে সূরা কাফিরুন এবং সূরা ইখলাস পড়বে।[৬]

জুমা এবং দু'ঈদের প্রথম রাকাতে সূরা কাফ এবং দ্বিতীয় রাকাতে সূরা কামার পড়বে। অথবা প্রথম রাকাতে সূরা আ'লা এবং দ্বিতীয় রাকাতে সূরা গাশিয়া পাঠ করবে এবং জুমার প্রথম রাকাতে সূরা জুমার এবং দ্বিতীয় রাকাতে সূরা মুনাফিকুন পড়ার কথাও রয়েছে।*[৭] নামাযে কেরাত পড়ার সময় প্রত্যেকটা অক্ষর আলাদা আলাদা করে উচ্চারণ করবে (স্পষ্ট উচ্চারণ করবে) এবং (আয়াতের) শেষ শব্দে টান দিবে। প্রত্যেক আয়াতের শেষে থামবে এবং কুরআন মজীদ (যথা সম্ভব) সুমিষ্ট স্বরে পাঠ করবে।[৮]

যে সমস্ত নামাযে জোরে কেরাত পাড়ার বিধান রয়েছে সে সমস্ত নামাযে যে কয় রাকাত ইমামের সাথে নামায পাওয়া যাবে না, (সে কয় রাকাত মুক্তাদী) জোরে কেরাত পড়ে নিবে।[৯]

অতপর আল্লাহু আকবার বলে রুকুতে যাবার সময় দুই হাত কাঁধ বা কান পর্যন্ত উঠাবে[১০] এবং হাতের আঙ্গুলগুলো খোলা রাখবে।[১১] রুক করার সময় মাথা

---

১. মুসলিম- জাবের (রা.)।
২. বখারী, মুসলিম- আবু হুরায়রা (রাঃ)।
৩. আবু দাউদ।
৪. মুসলিম- আবু হুরায়রা (রা.)।
৫. মুসলিম-উমর (রা.)।
৬. মুসলিম- নোমান বিন বশীর (রা.)।
৭. আবু দাউদ, মিশকাত।
৮. আবু দাউদ।
৯. মুয়াত্তা মালেক- না'ফে (রা.)।
১০. বুখারী- ইবনে উমর (রা.)
১১. বুখারী, মুসলিম- মালেক বিন হুওয়ায়রেস (রা.)

* রাসূলুল্লাহ (সা.) একই নামাযে বিভিন্ন সূরা পড়েছেন এবং অনুরূপ সূরা পড়ার কথা বলেছেন। মোট কথা কুরআন মজীদ হতে যে কোন সূরা পাঠ করতে হবে। তবে রাসূলুল্লাহ (সা.) যে নামাযে যে সূরা পড়েছেন তা পড়াই উত্তম। (আওনুল মা'বুদ)

উঁচু নিচু করবে না, সমান রাখবে এবং উভয় হাত দিয়ে উভয় হাঁটু শক্ত করে ধরবে।[১] রুকুতে নিম্নলিখিত দোয়াগুলোর মাঝে যে কোনটি পড়বে।

প্রথম দোয়া ঃ

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ ـ

অর্থাৎ- তুমি পবিত্র, হে আমাদের রব! তোমার প্রশংসার সাথে তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। হে আল্লাহ ! তুমি আমাকে ক্ষমা কর।[২]

দ্বিতীয় দোয়া ঃ سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوْحِ ـ

অর্থাৎ- অতি পুত-পবিত্র; ফেরেস্তাগণ এবং রূহের প্রতিপালক।[৩]

তৃতীয় দোয়া ঃ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ

অর্থাৎ- আমার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিপালক অতি প্রবিত্র।[৪]

উত্তম হচ্ছে রুকুতে দশবার তসবীহ পাঠ করা। তবে তিন তসবীহ এর কম পড়বে না[৫] এবং রুকুতে কুরআন শরীফ পড়বে না (পড়া নিষেধ)।[৬]

অতপর যখন রুকু হতে মাথা উঠাবে তখন দু'হাত কাঁধ অথবা কান পর্যন্ত উত্তোলন করবে এবং সোজাভাবে দাঁড়াবে।[৭] যদি ইমাম হয় তাহলে নিম্ন লিখিত দোয়াগুলির মধ্যে যেটা ইচ্ছা পড়বে।

প্রথম দেয়া ঃ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ

অর্থাৎ- আল্লাহ্ তায়ালা শুনেছেন, যে তার প্রশংসা করেছে।[৮]

দ্বিতীয় দোয়া ঃ

سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْأَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمِلْأَ مَاشِئْتَ مِنْ شَيْئٍ بَعْدُ ـ

---

১. মুসলিম।
২. বুখারী, মুসলিম- আয়েশা (রা.)
৩. মুসলিম- আয়েশা (রা.)।
৪. সুনানে আরবা, দারেমী- হুজায়ফা (রা.)।
৫. তিরমিযী, আবু দাউদ।
৬. মুসলিম- আবু হুরায়রা (রা.)।
৭. বুখারী, মুসলিম।
৮. বুখারী, মুসলিম- আবু হুরায়রা (রা.)।

অর্থাৎ- আল্লাহ তায়ালা শুনেছেন, যে তার প্রশংসা করেছে। হে আমাদের রব! তোমার আকাশ সমূহ এবং দুনিয়া ভর্তি (সমস্ত দুনিয়া জোড়া) এবং তুমি এর পরে যে পরিমাণ চাও, সে পরিমাণ প্রশংসা।[১]

তৃতীয় দোয়া ঃ

سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلأُ السَّمٰوَاتِ وَالاَرْضِ وَمِلأُ مَاشِئْتَ مِنْ شَيْئٍ بَعْدُ، اَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ اَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ - اَللّٰهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلاَمُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجِدِّ مِنْكَ الْجَدُّ -

অর্থাৎ- আল্লাহ তা'আলা শুনেছেন, যে তার প্রশংসা করেছে। হে আমাদের রব! তোমারই জন্য সমস্ত প্রশংসা আকাশ সমূহ পরিপূর্ণ এবং জমিনভর্তি এবং তুমি এর পরও যা কিছু ভর্তি চাও সে সমস্ত ভর্তি প্রশংসা, তুমিই প্রশংসার পাত্র। তুমি সে সব প্রশংসার হকদার যা তোমার বান্দা বলেছে এবং আমরা সকলেই তোমার বান্দা। হে আল্লাহ! তুমি যা দিয়েছ তাতে বাধা দেয়ার কেউ নাই। আর তুমি যা বন্ধ রেখেছ (দাওনা) তা দেয়ার কেউ নেই। কোন প্রচেষ্টাকারীর প্রচেষ্টা উপকারে আসবে না (তোমার আজাব হতে রক্ষা করতে)।[২]

মুক্তাদীগণ নিম্নলিখিত দোয়াগুলির মধ্যে যেটি ইচ্ছা পাঠ করবে ঃ

প্রথম দোয়া ঃ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ -

অর্থাৎ- হে আমাদের রব! তোমার জন্যই সমস্ত প্রশংসা।[৩]

দ্বিতীয় দোয়াঃ

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ -

অর্থাৎ- হে আমাদের রব! তোমার জন্যই অসংখ্য পবিত্রতা এবং বরকতময় (সমৃদ্ধশালী) প্রশংসা।[৪]

অতপর 'আল্লাহু আকবার' বলে সিজদায় যাবে এবং নিম্নলিখিত দোয়াগুলির

---

১. মুসলিম- আব্দুল্লাহ ইবনে আওফা (রা.)।

২. মুসলিম- আবু সাঈদ খুদরী (রা.)।

৩. বুখারী, মুসলিম- আবু হুরায়রা (রা.)।

৪. বুখারী- রিফাআ বিন রা'ফে (রা.)।

যে কোন একটি পড়বে ঃ

প্রথম দোয়া ঃ سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ

অর্থাৎ- তুমি পবিত্র, হে আমাদের রব! তোমার প্রশংসার সাথে তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা কর।[১]

দ্বিতীয় দোয়া ঃ سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوْحِ -

অর্থাৎ- অতিপূত পবিত্র ফেরেশতাগণ এবং রূহের প্রতিপালক।[২]

তৃতীয় দোয়া ঃ سُبْحَانَ رَبِّىَ الاَعْلٰى -

অর্থাৎ- আমার মহান প্রভু পবিত্র।[৩]

চতুর্থ দোয়া ঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذَنْبِىْ كُلَّهُ دِقَّهُ وَجِلَّهُ وَاَوَّلَهُ وَاٰخِرَهُ وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ -

অর্থাৎ- হে আল্লাহ! আমার ছোট বড় আগের ও পরের এবং প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সমস্ত গুনাহ্ মাফ করে দাও।[৪] সিজদা করার সময় (ধুলা বালি লাগার ভয়ে) কাপড় এটে ধরবে না।[৫] কপাল, নাক, দুই হাত, দুই হাঁটু এবং দুই পায়ের অগ্রভাগের দ্বারা সিজদা করবে।[৬] সিজদায় দশবার তসবীহ্ পড়াই উত্তম। কিন্তু তিন তসবীহ্র কম যেন না পড়ে।[৭] আর সিজদায় গিয়ে কুরআন মজীদ পড়বেনা।[৮] সিজদার সময় দু'হাতের আঙ্গুলগুলো না ফাক করবে, না এঁটে রাখবে (বরং স্বাভাবিক অবস্থায় রাখবে) এবং দু'পায়ের আঙ্গুলগুলো কেবলামুখী করে রাখবে।[৯] আর দুই হাত মাটির উপর কান বরাবর রাখবে এবং কনুই এতদূর উঁচু করবে যেন এর নীচ দিয়ে ছাগলের বাচ্চা ইচ্ছা করলে যেতে পারে। আর বগলের

১. বুখারী, মুসলিম- আয়েশা (রা.)।
২. বুখারী- আয়েশা (রা.)।
৩. সুনানে আরবা, দারেমী- হুজায়ফা (রা.)
৪. মুসলিম- আবু হুরায়রা (রা.)।
৫. বুখারী- আবু হুরায়রা (রা.)
৬. আবু দাউদ, নাসায়ী।
৭. আবু দাউদ, তিরমিজী, ইবনে মাজা- আউন ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.)।
৮. মুসলিম- আবু হুরায়রা (রা.)।
৯. বুখারী-আবু হুমাইদ (রা.)।

মাঝে শ্বেতাংশ ভাগ দৃষ্টি গোচার হয়। সিজদার সময় কুকুরের মত দুই হাত (মাটিতে কনুইসহ) বিছাবে না।[১]

অতপর প্রথম সিজদা হতে মাথা উঠিয়ে বা পা বিছায়ে তার উপর বসবে (ডান পা আঙ্গুলির ভরে খাড়া করে রাখবে।) এবং শরীরের হাড় বা অস্থিগুলি আপন আপন স্থানে ঠিক হতে যে সময় লাগে ততক্ষণ বসে থাকবে।[২] বসাকালীন সময়ের এ দোয়া পড়বে ঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَارْحَمْنِىْ وَاهْدِنِىْ وَعَافِنِىْ وَارْزُقْنِىْ .

অর্থাৎ- হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা কর, আমার প্রতি রহম কর, আমাকে হেদায়াত দান কর, আমাকে সুস্থ, বিপদ মুক্ত রাখ এবং আমাকে রিজিক দান কর।[৩] তারপর 'আল্লাহ আকবার' বলে দ্বিতীয় সিজদা করবে এবং এতেও প্রথম সিজদায় যেভাবে তসবীহ পড়া হয়েছিল তা পড়বে।[৪]

অতপর 'আল্লাহ্ আকবার' বলে সিজদা হতে মাথা উঠিয়ে বাম পা বিছিয়ে তার উপর বসবে এবং যতক্ষণ না শরীরের অস্থিসমূহ আপন স্থানে যায় ততক্ষণ পর্যন্ত বসে থাকবে।[৫] তারপর মাটির উপর দু'হাত ঠেস দিয়ে দ্বিতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়াবে।[৬]

প্রথম রাকাত যে ভাবে পড়া হয়েছে, সেভাবেই দ্বিতীয় রাকাত পড়বে কিন্তু দোয়ায়ে ইস্তেফতা (সানা) পড়বে না।[৭]

দ্বিতীয় রাকাতের উভয় সিজদা সমাপ্ত করার পর বাম পা বিছায়ে তার উপরে বসবে এবং ডান পা খাড়া করবে (আঙ্গুলির উপর ভর করে বসবে)[৮] এবং বাম হাত বাম হাঁটুর উপর এবং ডান হাত ডান হাঁটুর উপরে রাখবে।[৯] এ বিধানও রয়েছে যে, ডান হাত ডান জানুর উপর এবং বাম হাত বাম জানুর উপর রাখবে।[১০] তারপর (ডান হাতের) আঙ্গুলি ৫৩ এর মত করে মুঠা ধরবে অর্থাৎ

---

১. মুসলিম।
২. বুখারী, মুসলিম- আনাস (রা.)
৩. আবু দাউদ তিরমিযী- ইবনে আব্বাস (রা.)।
৪. আবু দাউদ তিরমিযী, ইবনে মাজা,, দারেমী- আবু হুমইদ (রা.)।
৫. বুখারী- ইবনে মাজা (রা.)।
৬. ইবনে মাজা- আবু দারদা (রা.)।
৭. মুসলিম- আবু হুরায়রা (রা.)।
৮. আবু দাউদ, তিরমিযী- ইবনে বাকরাহ (রা.)।
৯. আহমাদ, রাজ্জাক, হাকেম- আব্দুর রহমান বিন আউস (রা.)।
১০. বুখারী, মুসলিম- ইবনে উমর (রা.)।

তর্জনীর গোড়ায় বৃদ্ধাঙ্গুলির অগ্রভাগ রেখে তর্জনী মুঠা বন্ধ করত তার দ্বারা ইশারা করবে।[১] এ বিধানও রয়েছে যে, তর্জনী ব্যতীত সব আঙ্গুলগুলো দিয়ে মুঠা বাধবে এবং ইশারা করার সময় আঙ্গুলির দিকে চেয়ে থাকবে।[২] আর এভাবে তাশাহ্হুদ পড়বে-

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوٰتُ وَالطَّيِّبٰتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰـهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ -

অর্থাৎ- মৌখিক, দৌহিক ও আর্থিক সমস্ত ইবাদতই একমাত্র আল্লাহর জন্য। রাসূলুল্লাহ (সা.) এর প্রতি শান্তি, আল্লাহর রহমত এবং বরকত নাজিল হোক। আমাদের ও আল্লাহর নেককার বান্দাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর বান্দা ও রাসুল।[৩] অতপর তৃতীয় রাকাতের জন্য উঠার সময় দু'হাত মাটিতে ঠেস দিয়ে উঠবে এবং দাঁড়ায়ে দুই হাত কাঁধ বা কান পর্যন্ত উঠাবে।[৪] তারপর তৃতীয় এবং চতুর্থ রাকাত, প্রথম ও দ্বিতীয় রাকাতের মত পড়বে।[৫]

অতপর যখন সালাম ফিরার জন্য শেষ রাকআতে বসবে তখন ডানপার নীচ দিয়ে বাম পা বের করে এবং বাম নিতম্বের উপর বসবে।[৬] তারপর (চুপে চুপে) তাশাহ্হুদ, দরুদ ও অন্যান্য দোয়া পড়বে। তাশাহ্হুদ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে বাকী দরুদ ও দোয়া উল্লেখ করা হলো।

দরুদ ঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى

---

১. মুসলিম- ইবনে উমর (রা.)।
২. আহমাদ- না'ফে (রা.)।
৩. বুখারী- ইবনে মাসউদ (রা.)।
৪. বুখারী।
৫. আবু দাউদ, ইবনে মাজা।
৬. আবু দাউদ, তিরমিযী।

اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ - اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ -

অর্থাৎ- হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মদ (সা.) ও তার বংশধরগণের উপর অনুগ্রহ কর, যেমন ইব্রাহীম (আ.) ও তার বংশধরগণের উপর অনুগ্রহ করেছে। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসিত ও সম্মানী। হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মদ (সা.) ও তার বংশধরগণের উপর বরকত নাজিল কর, যেমন ইব্রাহীম (আ.) ও তার বংশধরগণের উপর বরকত নাজিল করেছে। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসিত ও সম্মানী।[১]

দোয়া মাসুরা ঃ (১)

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ فَاغْفِرْلِىْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِىْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ -

অর্থাৎ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি আমার নাফসের উপর অনেক জুলুম করেছি এবং তুমি ছাড়া কেহ পাপ সমূহ ক্ষমাকারী নেই। অতএব তুমি স্বীয় অনুগ্রহে আমাকে ক্ষমা কর এবং আমার প্রতি করুনা কর। নিশ্চয় তুমিই ক্ষমাশীল করুনাময়।[২]

(২) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَاىَ وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ -

(অর্থ- হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট কবরের আযাব হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং দাজ্জালের ফিতনা হতে আশ্রয় চাচ্ছি। আরও আশ্রয় চাচ্ছি দুনিয়ার জীবনের ফিতনা ও বিপর্যয় এবং মৃত্যুর যাতনা হতে। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি সমস্ত গুনাহ এবং সব রকমের দেনার (কর্জের) দায় হতে।।[৩]
অতপর ডান দিকে (ঘাড়সহ) মুখ ফিরিয়ে বলবে-

১. মুসলিম- ইবনে উমর (রা.)।
২. আহমাদ- না'ফে (রা.)।
৩. বুখারী- ইবনে মাসউদ (রা.)।

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ ـ

অতপর বাম দিকে (ঘাড়সহ) মুখ ফিরিয়ে বলবে-[১]

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ ـ

সালাম ফিরার সময় ওয়াবারাকাতুহ যোগ করে-

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ ـ বলাও জায়েয।[২]

সালাম ফিরার পর যিকির ও দোয়ার বিবরণ

যখন নামায পড়ে ইমাম সালাম ফিরবে তখন মুক্তাদীদের দিকে মুখ করে বসবে। কোন সময় ডান দিকে এবং কোন সময় বাম দিকে মুখ করে বসবে।[৩] এরপর এসব দোয়াগুলো পড়বে।

প্রথম দোয়া ঃ

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ ، اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ ، اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ ، اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالاِكْرَامِ ـ

অর্থাৎ- আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাচ্ছি (৩ বার) হে আল্লাহ! তুমি শান্তিময়। তোমা হতেই সব শান্তি (তুমি শান্তিদাতা) বরকতময় আমাদের রব, হে মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী প্রভু![৪]

দ্বিতীয় দোয়াঃ

لَا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَه ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ـ اَللّٰهُمَّ لَامَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ ـ

অর্থাৎ- আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। তিনি এক, তার কোন অংশীদার নেই। একমাত্র তার জন্যই রাজত্ব ও প্রশংসা এবং তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। হে আল্লাহ! তুমি যা দিয়েছ তাতে বাধা দেয়ার কেউ নেই। আর

---

১. সুনানে আরবা।

২. আবু দাউদ।

৩. বুখারী।

৪. মুসলিম- সওবান (রা.)।

তুমি যা বন্ধ রেখেছ (দাওনা) তা দেয়ার কেউ নেই এবং কোন প্রচেষ্টাকারীর প্রচেষ্টা উপকারে আসবে না। (তোমার আযাব হতে রক্ষা করতে)।[১]

তৃতীয় দোয়া ঃ

لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَه ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ - لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَلاَ نَعْبُدُ اِلاَّ اِيَّاهُ ، لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ -

অর্থাৎ- আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। তিনি এক, তার কোন অংশীদার নেই। তার জন্যই রাজত্ব এবং প্রশংসা। আর তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। আল্লাহর অনুগ্রহ ছাড়া পাপ হতে বিরত থাকা এবং পুন্য কার্য করা যায় না। আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। আমরা একমাত্র তাঁরই ইবাদত করি। তাঁরই (নিকট হতে) সমস্ত নিয়ামত এবং তাঁর জন্যই শ্রেষ্ঠত্ব ও উত্তম প্রশংসা। আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। একান্তভাবে আমরা তাঁর আরাধনা করি যদিও মুশরিকগণ তা অপছন্দ করে।[২]

চতুর্থ দোয়া ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ اَنْ اُرَدَّ اِلٰى اَرْذَلِ الْعُمُرِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ-

অর্থাৎ- হে আল্লাহ! আমি কাপুরুষতা ও কৃপণতা হতে তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। আর অত্যধিক বার্ধক্য হতে তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি এবং দুনিয়ার ফিতনা এবং কবরের আযাব হতে তোমরা নিকট আশ্রয় প্রাথনা করছি।[৩]

---

১. বুখারী, মুসলিম- মুগীরা ইবনে শো'বা (রা.)।

২. মুসলিম- আবদুল্লাহ বিন জুবাইর (রা.)।

৩. বুখারী- মুসআ'ব (রা.)।

পঞ্চম দোয়া ঃ

اَللّٰهُمَّ اَعِنِّيْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ ـ

অর্থাৎ- হে আল্লাহ! আমাকে তোমার স্মরণ, কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন এবং উত্তমভাবে তোমার ইবাদত করতে সাহায্য কর।[১]

ষষ্ঠ দোয়া ঃ

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ـ

অর্থাৎ- হে আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ! আমাদেরকে দুনিয়া ও পরকালে কল্যাণ দান কর এবং দোযখের আগুন হতে রক্ষা কর।[২]

সপ্তম দোয়াঃ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ـ

অর্থাৎ- আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। আল্লাহ পবিত্র, মহান এবং তার জন্যই সমস্ত প্রশংসা। আর আল্লাহর অনুগ্রহ ছাড়া পাপ হতে বিরত থাকা ও পুন্য কাজ করা যায় না।[৩]

অষ্টম দোয়া ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ وَجَمِيْعِ سَخَطِكَ-

অর্থাৎ- হে আল্লাহ! আমি আশ্রয় চাচ্ছি তোমার নেয়ামতের বিনাশ হওয়া থেকে, তোমার দেয়া শান্তি ও নিরাপদতার পরিবর্তন হতে, তোমার সহসা আযাব শাস্তির আগমন হতে এবং তোমার সর্বপকার অসন্তোষ হতে।[৪]

নবম দোয়া ঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ خَطِيْئَتِيْ وَجَهْلِيْ وَاِسْرَافِيْ فِيْ اَمْرِيْ

১. আহমাদ, আবু দাউদ, নাসাঈ- মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা.)।
২. বুখারী- আনাস (রা.)।
৩. নাসায়ী- আবু সাঈদ খুদরী (রা.)।
৪. মুসলিম- ইবনে উমর (রা.)।

وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهِ مِنِّىْ - اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ جِدِّىْ وَهَزْلِىْ وَخَطَائِىْ وَعَمْدِىْ وَكُلُّ ذٰلِكَ عِنْدِىْ - اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهِ مِنِّىْ وَاَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَاَنْتَ الْمُؤَخِّرُ وَاَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ -

অর্থাৎ- হে আল্লাহ! আমার পাপ, অজ্ঞতা ও কাজের মধ্যে সীমা লংঘন যা আমার চাইতে তুমি বেশী অবগত আছ, সবই ক্ষমা করে দাও। হে আল্লাহ! আমার পাপ কাজের চেষ্টা, অন্যায় কথাবার্তা, ভুলত্রুটি এবং ইচ্ছাকৃত অন্যায় তুমি ক্ষমা করে দাও, এসবই আমার মাঝে রয়েছে। তুমি ক্ষমা কর যা আমি আগে ও পরে এবং প্রকাশ্যে ও গোপনে করেছি, যা তুমি আমার চেয়ে ভালভাবে অবগত। তুমি অনাদি ও অনন্ত এবং সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।[১]

দশম দোয়া ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهٖ عَاجِلِهٖ وَاٰجِلِهٖ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ اَعْلَمْ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهٖ عَاجِلِهٖ وَاٰجِلِهٖ مَاعَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ اَعْلَمُ - اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرِ سَأَلَكَ بِهٖ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا اَعَاذَبِهٖ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ - اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ اِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ اَو عَمَلٍ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ اِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ اَوْ عَمَلٍ وَاَسْأَلُكَ اَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لِىْ خَيْرًا -

অর্থাৎ- হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট সমস্ত কল্যাণ কামনা করছি, বর্তমান ও ভবিষ্যতের যা আমি জানি এবং যা জানি না এবং তোমার আশ্রায় কামনা করছি বর্তমান ও ভবিষ্যতের অমঙ্গল হতে যা আমি জানি এবং যা জানি না। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট সেই সব কল্যাণ কামনা করছি যা তোমার বান্দা ও নবীগণ চেয়েছিলেন এবং সেই সব অকল্যাণ ও অনিষ্ট হতে আশ্রায় চাচ্ছি। যা

১. বুখারী, মুসলিম- আবু মুসা আল-আশয়ারী (রা.)।

হতে তোমার বান্দা ও নবী আশ্রায় চেয়ে ছিলেন। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট জান্নাত প্রার্থনা করছি এবং যে সমস্ত কাজ ও কথা তার নিকটবর্তী করে দেয় তা কামনা করছি এবং দোযখ হতে পরিত্রান চাচ্ছি ও যে সমস্ত কথা ও কাজ দোযখের নিকটবর্তী করে তা হতে তোমার আশ্রায় কামনা করছি এবং তুমি অদৃষ্টে যা কিছু ফয়সালা করেছ, তা কল্যাণকর ও মঙ্গলময় কর এই প্রার্থনাই করছি।[১]

একাদশ দোয়া ঃ

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّىْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ خَلَقْتَنِىْ وَاَنَا عَبْدُكَ وَاَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَاصَنَعْتُ وَاَبُوْءُلَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَىَّ وَاَبُوْءُ عِنْدَكَ بِذَنْبِىْ فَاغْفِرْلِىْ فَاِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ اَنْتَ -

অর্থাৎ- হে আল্লাহ! তুমি আমার প্রভু, তুমি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ। আমি তোমার বান্দা এবং আমি সাধ্যানুযায়ী তোমার ওয়াদা-অঙ্গীকারের উপর ঠিক রয়েছি। আমি তোমার নিকট আমার নিজ কৃত অন্যায় আচরণ হতে আশ্রয় চাচ্ছি। আমি স্বীকার করছি তোমার নিকট আমার দেয়া নেয়ামতের, যা তুমি আমাকে দিয়েছ এবং আমি তোমার নিকট আমার গুনাহের স্বীকার করছি, সুতরাং তুমি আমাকে ক্ষমা কর। কেননা তুমি ব্যতীত আর কেহ পাপ সমূহ ক্ষমা করতে পারে না।[২]

জ্ঞাতব্য ঃ রাসূলুল্লাহ (সা.) এ দোয়াকে সাইয়েদুল ইসতেগফার বা গুনাহ মাফের শ্রেষ্ঠ দোয়া বলে অবহিত করেছেন।

দ্বাদশ দোয়া ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِىْ دِيْنِىْ وَدُنْيَاىَ وَاَهْلِىْ وَمَالِىْ - اَللّٰهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِىْ وَاٰمِنْ رَوْعَاتِىْ وَاحْفَظْنِىْ مِنْ بَيْنِ يَدَىَّ وَمِنْ خَلْفِىْ وَعَنْ يَمِيْنِىْ وَعَنْ شِمَالِىْ وَمِنْ

---

১. ইবনে মাজা- আয়েশা (রা.)।

২. বুখারী- শাদ্দাদ বিন আউস (রা.)।

فَوْقِيْ وَاَعُوْذُ بِعَظَمَتِكَ اَنْ اُغْتَالَ مِنْ تَحْتِيْ -

অর্থাৎ- হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আমার দ্বীন, দুনিয়া, পরিবার এবং ধন সম্পদের মাঝে নিরাপত্তা ও শান্তি প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ ! আমার দোষ (কলঙ্ক) সমূহ গোপন কর এবং ভয়ভীতি (সন্ত্রাস) হতে আমাকে নিরাপত্তা দান কর, আর অগ্র-পশ্চাত ও ডানে বামে এবং উপরের দিক হতে হেফাজত কর এবং আমি নীচের দিকে পুঁতে যাওয়া (ধ্বংশ হওয়া) হতে তোমার শ্রেষ্ঠত্বের দ্বারা আশ্রয় চাচ্ছি।[১]

জ্ঞাতব্য ঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সকাল বেলায় এ দোয়াটি পড়তেন। কখনও এটা পড়া থেকে বিরত থাকতেন না।

ত্রয়োদশ দোয়া ঃ

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ -

অর্থাৎ- আল্লাহ পবিত্র এবং সমস্ত প্রশংসা একমাত্র তারই জন্য। আল্লাহ পবিত্র, মহান মর্যাদাশীল।

জ্ঞাতব্য ঃ রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন "এই কালেমা ২টি মুখে বলতে খুবই সহজ, ওজনে ভারী এবং আল্লাহর নিকট প্রিয় ও পছন্দনীয়। অর্থাৎ ঐ বাক্য ২টি পাঠ করা সহজ কিন্তু এর নেকী কিয়ামতের দিনে ওজনে অনেক বেশী হবে এবং তা আল্লাহর নিকট খুবই পছন্দনীয় কথা।[২]

চতুর্দশ দোয়া ঃ

سُبْحَانَ اللّٰهِ (আল্লাহ পবিত্র) ৩৩ বার। অতঃপর اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য) ৩৩ বার। অতঃপর اَللّٰهُ اَكْبَرُ (আল্লাহ মহান-সর্বশ্রেষ্ঠ) ৩৩ বার এবং শেষে পড়বে ঃ

لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَعَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ -

অর্থাৎ- "আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। তিনি এক, তার কোন অংশীদার নেই। তারই জন্য সমস্ত সাম্রাজ্য ও প্রশংসারাজি। তিনি সব কিছুর উপর পরাক্রমশালী।"

---

১. নাসাঈ, ইবনে মাজা- ইবনে উমর (রা.)।

২. বুখারী, মুসলিম, এটি বুখারী শরীফের সর্বশেষ হাদীস।

যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর এ দোয়া পড়বে তার পাপ সমূহ আল্লাহ তা'য়ালা মাফ করে দিবেন, যদিও তা সমুদ্রের ফেনারাশির মত অসীম হয়।*[১]

যে ব্যক্তি প্রত্যহ একশত বার سُبْحَانَ اللهِ পাঠ করবে, তার আমল নামায় প্রতিদিন এক হাজার নেকী লিখা হবে।[২]

জ্ঞাতব্য : একশত বার পড়লে এক হাজার নেকী এ জন্য হবে যে, আল্লাহ তা'য়ালা একটি নেকীর জন্য দশগুণ নেকী নির্দিষ্ট করেছেন। সে হিসেবে একশতে এক হাজার নেকী হবে।

দোয়ার সময় হাত উঠান * ও তা মুখের উপর ফিরান

দোয়া করার সময় দুই হাত উঠিয়ে মুখের সামনে রাখবে এবং দোয়া করে উভয় হাত দিয়ে মুখমণ্ডল মুছবে।[৩]

দোয়া করার সময় উভয় হাতের ভিতরের দিক মুখের সামনে রাখবে উপরের দিকে নয়, অর্থাৎ উল্টা হাতে দোয়া করবে না।[৪] অবশ্য ইসতিস্কার সময় উল্টা হাতেই দোয়া করবে[৫] এবং ফরজ নামাজের পর হাত উঠিয়ে দোয়া করবে।[৬]

নামাযে জায়েয ও নাজায়েয বিষয়ের বিবরণ

নামাযরত অবস্থায় কোন কিছু ঘটলে পুরুষ হলে সুবহানাল্লাহ বলবে এবং মহিলা হাততালি দিবে।[৭] নামাযরত অবস্থায় হাত দিয়ে একবার সিজদার স্থানে হতে কঙ্কর (বা ঐ ধরনের কিছু) সরানো জায়েয[৮] এবং নামাযে এদিক সেদিক তাকানো নিষেধ।[৯]

---

১. মুসলিম- আবু হুরায়রা (রা.)
২. মুসলিম- সা'দ ইবনে আবী অক্কাস (রা.)।
৩. তিরমিযী।
৪. আবু দাউদ- মালেক বিন ইয়াসার (রাঃ)।
৫. মুসলিম- আনাস (রা.)।
৬. ইবনে আবী শায়বা।
৭. বুখারী, মুসলিম- সাহল বিন সা'দ (রা.)।
৮. বুখারী, মুসলিম- আবু হুরায়রা (রা.)।
৯. বুখারী, মুসলিম- আয়েশা (রা.)।

* প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর আয়তাল কুরসী পড়ার কথা উল্লেখ রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যহ ফরজ নামাযের পর আয়তাল কুরসী পড়বে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (নাসাঈ)

* ফরজ নামাজের পর সম্মিলিতভাবে হাত উঠিয়ে দোয়া করার বিধান রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে সাব্যস্ত নয়। এজন্য ফরজ নামাজের পর হাত উঠিয়ে সম্মিলিতভাবে দোয়া করাকে বিদআত মুহাক্কিক আলেমগণ মনে করেন।-(বিস্তারিত দেখুন, ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়্যাহ, খ. ২২, পৃ. ৫১২; শারহে সিফরুস সা'আদাহ, পৃ. ১২২; আইনী তুহফা সলাতে মুস্তফা, খ. ২, পৃ. ৫২-৫৩)

নামাযরত অবস্থায় যদি কারো হাই আসে তাহলে যথাসম্ভব মুখ বন্ধ করতে হবে। কেননা হাই হলে শয়তান হাসে।[১] নামাযে হাই হলে হাত দিয়ে মুখ বন্ধ করা জায়েয।[২]

নামাযে কারো হাঁচি হলে এ দোয়া পড়বে :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا عَلَيْهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضٰى -

অর্থাৎ- সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য, অসংখ্য প্রশংসা বরকত পূর্ণ, তার উপর বরকত যাকে আল্লাহ ভালবাসেন এবং পছন্দ করেন।[৩]

নামাযে যে ব্যক্তি হাঁচি আসার কারণে উক্ত দোয়া পড়বে, তার জবাবে يَرْحَمُكَ اللّٰهُ বলা নিষেধ।[৪]

সহু সিজদার বিবরণ

যদি নামাযে কারো সন্দেহ দেখা দেয় যে, সে কি তিন রাকাত পড়েছে নাকি চার রাকাত? তাহলে তার যত রাকাতের পড়ার ব্যাপারে ইয়াকীন (দৃঢ় প্রত্যয়) হয় তার উপর ভিত্তি করবে এবং সালামের পূর্বে দুটি সিজদা করবে।[৫] যদি সে পাঁচ রাকাত পড়ে থাকে তাহলে এই দুই সিজদা তার জন্য এক রাকাত হয়ে যাবে, অর্থাৎ তার চার রাকাত ফরজ এবং দুই রাকাত নফল হিসেবে গণ্য হবে। আর সে যদি চার রাকাত পড়ে থাকে তাহলে এই দুই সিজদা শয়তানের জন্য অপমান এবং লাঞ্ছনা স্বরূপ হবে।[৬]

ইমাম যদি প্রথম বৈঠকে না বসেন এবং দাঁড়িয়ে যান, তাহলে মুক্তাদীদেরকেও দাঁড়িয়ে যেতে হবে অতঃপর শেষ রাকাতে সালাম ফিরার পূর্বে ইমাম বসে বসে দুই সিজদা দিবে এবং মুক্তাদীরাও ইমামের সাথে সিজদা করবে।[৭]

যে ব্যক্তির চার রাকাত নামায পড়া আবশ্যক ছিল সে যদি তিন রাকাত নামায পড়ে সালাম ফিরে দেয় এবং চতুর্থ রাকাত না পড়ে থাকে এমতাবস্থায় সে যদি বাড়ীও চলে যায় অথবা কথাবার্তা বলে থাকে তাহলেও উক্ত বাকী এক রাকাত

---

১. বুখারী, মুসলিম- আবু হুরায়রা (রা.)।
২. তিরমিযী, ইবনে মাজা- আবু হুরায়রা (রা.)।
৩. আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ- রেফাআ বিন রা'ফে (রা.)।
৪. মুসলিম- মুয়াজ বিন হাকাম (রা.)।
৫. মুসলিম- আতা (রা.)।
৬. বুখারী, মুসলিম- ইবনে মাসউদ (রা.)।
৭. মুসলিম- ইমরান বিন হুসাইন (রা.)।

নামায পড়ে সালাম ফিরতে হবে। অতঃপর দুই সিজদা দিয়ে আবার সালাম ফিরতে হবে।[১]

কোন ব্যক্তি যদি চার রাকাতের স্থলে দুই রাকাত নামায পড়ে এবং সালাম ফিরে মসজিদ হতে বের হয়ে যায় অথবা কথাবার্তা বলে তবুও সে বাকী উক্ত দুই রাকাত নামাযই পড়বে এবং সালাম ফিরবে। অতঃপর তাকবীর দিয়ে দুইটি সিজদা করবে এবং সালাম ফিরবে।[২]

যে ব্যক্তি চার রাকাতের স্থলে পাঁচ রাকাত পড়ে ফেলে তবে নিজে নিজেই অথবা কারো বলার ফলে যদি একথা স্মরণে আসে তাহলে সে সালামের পর দুইটি সিজদা দিবে।[৩]

ইমাম যদি ভুলে যান তাহলে কোন মুক্তাদী তাকে সুবহানাল্লাহ বলে স্মরণ করিয়ে দিবে।[১]

নামাযে যে ব্যক্তির সংশয় হয় যে, সে কি এক রাকাত নামায পড়েছে না দুই রাকাত তাহলে এক রাকাত বলে ধরে নিবে। আর যদি কারো সন্দেহ হয় যে, সে কি দুই রাকাত নামায পড়লো না তিন রাকাত, তাহলে দুই রাকাত ধরে নিবে এবং সালামের পূর্বে দুইটি সিজদা দিয়ে নিবে।[৫]

যে ব্যক্তি সন্দেহের বশবর্তী হয়ে প্রথম বৈঠকে না বসে এবং উঠে দাঁড়ায় অতঃপর বসে যায়, তাহলে সালাম ফিরার পূর্বে দুইটি সিজদা করে নিবে। আর যদি কেহ সম্পূর্ণ না দাঁড়িয়ে বসে পড়ে তাহলে তার উপর সিজদায়ে সহু আবশ্যক নয়।[৬]

মুক্তাদী যদি নামাযে কোন কিছু ভুলে যায় তাহলে সহুসিজদা দিবে না। কিন্তু যদি ইমাম সাহেব কোন কিছু ভূলে করেন তাহলে তিনি সহু সিজদা করবেন এবং মুক্তাদীরাও ইমামের সাথে সিজদা করবে।[৭]

নামাযে একাকী অবস্থায় বা ইমাম হিসেবে নামায পড়ার সময় কোন কিছু ভুল হলে সহুসিজদা করে নিবে।[৮]

---

১. বুখারী, মুসলিম- ইবনে সিরীন (রা.)।
২. বুখারী, মুসলিম- ইবনে মাসউদ (রা.)।
৩. আহমাদ- আব্দুর রহমান বিন আউফ (রা.)।
৪. আবু দাউদ, ইবনে মাজা, দারকুতনী- মুগীরা (রা.)।
৫. তিরমিযী, বায়হাকী - উমর (রা.)।
৬. আবু দাউদ, ইবনে মাজা, দারকুতনী- সাওবান (রা.)।
৭. তিরমিযী, বায়হাকী- উমর (রা.)।
৮. আবু দাউদ, ইবনে মাজা।

তিলাওয়াতে সিজদার বিবরণ

কুরআন মজীদের ১৫ জায়গায় তিলাওয়াতে সিজদা করা সুন্নত।[১] (১) সূরা আ'রাফের শেষে।[২] (২) সূরা রা'দ والاصال -এর পর (১৫ নং আয়াত)। (৩) সূরা নহলে يؤمرون -এর পর (৫০ নং আয়াত)। (৪) সূরা বনী ইসরাঈলে خشوعا -এর পর (১০ নং আয়াত) (৫) সূরা মরিয়মে بكيا এর পর (৫৮ নং আয়াত (৬) সূরা হজ্জে প্রথম সিজদা يشاء -এর পর (১৮ নং আয়াত) (৭) সূরা হজ্জে দ্বিতীয় সিজদা تفلحون এর পর (৭৭ নং আয়াত) (৮) সূরা ফুরকানে। نفورا এর পর (৬০ নং আয়াত) (৯) সূরা নমলে العظيم। -এর পর (২৬ নয় আয়াত)। কারো নিকট تعلنون -এর পর (২৫ নং আয়াত)। (১০) সূরা সিজদায় لايستكبرون -এর পর (১৫ নং আয়াত) (১১) সূরা স'দে واناب এর পর (২৪ নং আয়াত) (১২) সূরা ফুসসেলাতে لايسئمون -এর পর (৩৮ নং আয়াত)। (১৩) সূরা নজমের শেষে। (১৪) সূরা ইনশিকাকের لايسجدون -এর পর (২১ নং আয়াত) এবং (১৫) সূরা আলাকের শেষে।

তেলাওয়াতে সিজদা অযু ছাড়াও করা যায়।[৩]

শুকুরানা সিজদার বিবরণ

কারো যদি আনন্দদায়ক বা খুশীর কোন কাজ ঘটে, তবে তার শুকুরানা (কৃতজ্ঞতা) সিজদা করা উচিৎ।[৪] সিজদারত অবস্থায় দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত থাকবে।[৫]

জামাতের সাথে নামায পড়ার ফজিলত

যদি বাড়ীর মাঝে কেউ নামায পড়ে তাহলে সে নামায আদায় হয়ে যাবে। তবে মসজিদে জামাতের সাথে নামায পড়লে ২৭ গুণ বেশী নেকী পাওয়া যাবে।[৬]

---

১. বুখারী- ইবনে উমর (রা.)।
২. ইবনে মাজা- আবু দাউদ।
৩. মুসলিম- আবু হুরায়রা (রা.)।
৪. আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজা- আবু বাকরা (রা.)।
৫. আহমাদ, রাজ্জাক, হাকেম- আব্দুর রহমান বিন আউফ (রা.)।
৬. বুখারী, মুসলিম- ইবনে উমর (রা.)।

রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, আমার ইচ্ছা হয় যে, নামাযের সময় কাউকে আমার স্থলে এসে ইমামতী করতে বলি এবং যে ব্যক্তি জামাতের সাথে নামায পড়ার জন্য মসজিদে আসে না, তার বাড়ীঘর নিজে গিয়ে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেই।[১]

কোন গ্রামে বা জঙ্গলে যদি তিনজন লোক থাকে, তারা জামাত করে নামায না পড়ে, তাহলে শয়তান তাদের উপর প্রাধান্য লাভ করে।[২]

যদি দুইজন লোক থাকে তাহলে একজন ইমাম এবং অপরজন মুক্তাদী হবে। আর যদি তিনজন থাকে তাহলে একজন ইমাম হবে এবং অন্য দু'জন মুক্তাদী। অতঃপর সংখ্যা যত বেশী হবে আল্লাহ তাদের তত বেশী পছন্দ করবেন।[৩]

ফজর এবং এশা নামায জামাতের সাথে পড়া মুনাফিকদের জন্য বড় কষ্টকর। যদি তারা এর মর্যাদা ও ফজিলত জানতো তাহলে তারা হামাগুড়ি দিয়ে হলেও এ নামায আদায় করার জন্য মসজিদে আসতো।[৪]

যে ব্যক্তি জামাতের সাথে এশার নামায আদায় করলো সে যেন অর্ধেক রাত পর্যন্ত নামায পড়তে থাকলো। আর যে ব্যক্তি ফজরের নামাজ জামাতের সাথে পড়লো, সে যেন সারারাত নামায পড়তে থাকলো।[৫]

যে ব্যক্তি ৪০ (চল্লিশ) দিন জামাতের সাথে এভাবে নামায পড়তে থাকলো যে, প্রত্যেক ওয়াক্তে প্রথম তাকবীর পেলো, তাহলে তার জন্য দুইটি বৈশিষ্ট লেখা হবে। একটি বৈশিষ্ট হচ্ছে আল্লাহ তাকে দোজখের আগুন থেকে রক্ষা করবেন। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট হচ্ছে আল্লাহ তাকে মুনাফিকদের কাজকর্ম এবং তাদের অভ্যাস-চরিত্র হতে রক্ষা করবেন।[৬]

যে ব্যক্তি ভাল করে অযু করে জামাতের সাথে নামায পড়ার উদ্দেশ্যে মসজিদে যাবে এবং মসজিদে ইতপূর্বে জামাত হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে আল্লাহ তাকে যারা জামাতের সাথে নামায পড়েছে তাদের সমপরিমাণ নেকী দিবেন।[৭]

---

১. বুখারী, মুসলিম- আবু হুরায়রা (রা.)।
২. মুসলিম- আনাস (রা.)।
৩. আহমাদ, আবু দাউদ, নাসাঈ- আবু দারদা (রা.)।
৪. বুখারী, মুসলিম- আনাস (রা.)।
৫. মিশকাত- আনাস (রা.)।
৬. আবু দাউদ- ইবনে আব্বাস (রা.)।
৭. আবু দাউদ- আবু হুরায়রা (রা.)।

মসজিদে জামাত হয়ে যাবার পর যদি কেউ নামায পড়ার জন্য যায় এবং তার সাথে নামায পড়ার জন্য কাউকে না পায়, তবে যারা ইতিপূর্বে নামায পড়ে ফেলেছে তাদের মধ্যে কেউ যেন তার সাথে নামাযে শামিল হয়, এমতাবস্থায় সে জামাতের সোয়াব পাবে এবং যে ব্যক্তি তার সাথে শামিল হয়েছিল সে সাদকা করার সোয়াব পাবে।[১]

যদি নামাযের জন্য তাকবীর দেয়া হয়ে যায় তবে জামাতে শামিল হবার জন্য দৌড়ে যাওয়া উচিৎ নয়। কেননা কোন লোক যখন বাড়ী হতে নামাযের উদ্দেশ্যে মসজিদের পানে যায় তাহলে সে সোয়াব এবং হুকুমের দিক থেকে নামাযের মাঝেই শামিল হয়ে যায়।[২]

ওযর-অসুবিধার কারণে জামাত তরক করা

যে ব্যক্তি আযান শোনার পর কোন ওযর বা অসুবিধে ব্যতিরেকে মসজিদে জামায়াতের জন্য যাবে না, তার নামায দুরস্ত হয় না।[৩]

জ্ঞাতব্য : ওযরের মধ্যে হচ্ছে- পথে দুশমনের ভয় থাকা অথবা অসুখ হওয়া,[৪] শীত বা ঠান্ডা, ঝড়-বাতাস এবং বৃষ্টির কারণে বাড়ীতে নামায পড়া জায়েয।[৫]

যদি এশার নামাযের সময় কারো সামনে খাবার এসে যায় এবং পাশেই জামায়াত শুরু হয়ে যায় তবুও খাবার খেয়ে নামায পড়বে এবং তাড়াহুড়া করবে না।[৬]

যদি কারো পায়খানা বা পেশাবের প্রয়োজন হয়ে পড়ে তবে প্রথমে তা সেরে নিবে এরপর নামাজ পড়বে। যদি জামাত ছুটে যায় তবুও কোন অসুবিধা নেই।[৭]

যার খাবার প্রস্তুত হয়ে যাবে বা যার পেশাব-পায়খানার প্রয়োজন হবে, সে যদি খাবার খাওয়ার পূর্বে বা পেশাব পায়খানার কাজ শেষ করার পূর্বে নামায পড়ে নেয় তাহলে তার নামায অসম্পূর্ণ রয়ে যায়।[৮]

যে ব্যক্তি আযান শুনতে পাবে তার জন্য মসজিদে গিয়ে জামায়াতের সাথে নামায পড়া অবশ্যকর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়- যদিও সে ব্যক্তি অন্ধ হয়।[৯]

---

১. তিরমিযী, আবু দাউদ, মিশকাত- আবু সাঈদ খুদরী (রা.)।
২. বুখারী, মুসলিম- আবু হুরায়রা (রা.)।
৩. ইবনে মাজা, দারকুতনী, ইবনে হিব্বান, হাকেম- ইবনে আব্বাস (রা.)।
৪. আবু দাউদ, দারকুতনী।
৫. বুখারী, মুসলিম- ইবনে উমর (রা.)।
৬. প্রাগুক্ত।
৭. প্রাগুক্ত।
৮. মুসলিম- আয়েশা (রা.)।
৯. মুসলিম- আবু হুরায়রা (রা.)।

জামাতের সাথে মহিলাদের নামায পড়া

ঘরের মধ্যে নামায পড়া মহিলাদের জন্য উত্তম। কিন্তু কোন মহিলা যদি মসজিদে গিয়ে জামাতের সাথে নামায পড়তে চায় তবে কেউ যেন বাধা না দেয়।[১]

যে মহিলা সুগন্ধী লাগিয়ে নামায পড়ার জন্য মসজিদে যাবে তার নামায কবুল হবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত সে অপবিত্র অবস্থা হতে পাক হবার জন্য গোসল করার মত গোসল না করবে।[২]

মহিলাদের বাড়ীর আঙ্গিনায় নামায পড়ার চেয়ে দেয়াল বা দালানের নীচে নামায পড়া উত্তম। দেয়াল বা দালানের নীচের চেয়ে কামরার মধ্যে নামায পড়া আরো অধিক উত্তম।[৩]

জ্ঞাতব্য ঃ মহিলারা অন্দর মহলে যতই পর্দার সাথে নামা. পড়বে ততই বেশী সোয়াব পাবে, কারণ তাদেরকে পর্দা রক্ষা করার জন্য বিশেষভাবে আদিষ্ট করা হয়েছে।

ইমামতীর বিবরণ

যে ব্যক্তি উত্তমভাবে কুরআন পড়তে পারে তাকেই ইমাম বানানো উচিৎ, তবে তাকে নামাযের আরকান এবং হুকুম-আহকাম ভালভাবে জানতে হবে। যদি দুইজন লোক কুরআন পড়ার ক্ষেত্রে সমান হয় তবে এদের মাঝে প্রথমে যে হিজরত করেছে (মক্কা হতে মদীনায়) তাকে ইমাম হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। ইলম, কিরাত ও হিজরতের দিক থেকে দু'জনই সমান হলে এদের মাঝে যে বয়সে বড় তাকে ইমাম বানাতে হবে।[৪]

কারো নিয়োগকৃত ইমামতীর স্থলে ইমামতী করবে না এবং কারো বিছানায় (বা আসনের) উপর তার অনুমতি ব্যতীত বসবে না। কিন্তু কারো সাথে দেখা সাক্ষাৎ করতে গিয়ে (বা এমনিতেই) কাউকে ইমামতী করার অনুমতি দেয় তাহলে ইমামতী করা জায়েয[৫] এবং অন্ধ লোককে ইমাম নিযুক্ত করা জায়েয।[৬]

---

১. আবু দাউদ- ইবনে উমর (রা.)।

২. প্রাগুক্ত।

৩. আবু দাউদ- ইবনে উমর (রা.)।

৪. মুসলিম- আবু মাসউদ (রা.)।

৫. মুসলিম।

৬. আবু দাউদ- আনাস (রা.)।

তিন প্রকার লোকের নামায কবুল হয় না। ১. যার উপর তার জাতি অসন্তুষ্ট থাকে, ২. সেই মহিলা যার উপর তার স্বামী ক্রোধান্বিত এবং সে সারারাতে তার স্বামীকে সন্তুষ্ট করেনি, ৩. তারা পরস্পর দুই ভাই অসন্তুষ্ট রয়েছে অর্থাৎ তারা ইসলামী অধিকার (যেমন সালাম দেয়া ইত্যাদি) এর সম্পর্ক ছেদ করেছে তিন দিনের অধিক সময় ধরে। তিন দিনের অধিক পর্যন্ত সম্পর্ক ছিন্ন করা জায়েয নয়।[১] যেখানে কুরআন পড়া ছেলে নাবালেগ হবে এবং কোন বড় মানুষ (ভাল করে কুরআন পড়তে পারে) না পাওয়া যাবে, সেখানে ঐ ছেলেই নামায পড়াবে। এতে শরয়ী কোন নিষেধ নাই।[২]

ইমাম যেখানে নামায পড়িয়েছেন সেখানে সুন্নত নফল না পড়ে জায়গা বদল করে পড়বে।[৩]

মহিলা কর্তৃক মহিলাদের ইমামতী করা

মহিলা কর্তৃক মহিলাদের নামাযের ইমামতী করা জায়েয এবং ইমামতকারিনী মহিলাদের কাতারের মাঝে দাঁড়াবে। অর্থাৎ পুরুষ ইমাম সামনে দাঁড়িয়ে যেভাবে নামায পড়ায় সেভাবে দাঁড়াবে না।[৪]

বৃদ্ধ পুরুষ এবং ছোট বাচ্চা যদি মহিলার পিছনে নামায পড়ে তাহলে সেটা জায়েয।[৫]

নামাযে ইমামকে বলে দেয়ার বিবরণ

ইমাম নামাযে কুরআন তিলাওয়াত করতে করতে যদি ভুলে যায় তাহলে মুক্তাদী তাকে লোকমা দিয়ে বলে দিবে।[৬]

ইমাম কর্তৃক মুক্তাদীর অবস্থা খেয়াল রাখা

ইমামের পিছনে নামাযরত কোন মহিলার বাচ্চা যদি কাঁদতে শুরু করে তাহলে ইমামকে তার নামায সংক্ষেপ করে (তাড়াতাড়ি শেষ করে) দেয়া উচিৎ। কেননা বাচ্চা কাঁদার কারণে তার মা ভীষণ কষ্ট পাবে।[৭]

---

১. ইবনে মাজা- ইবনে আব্বাস (রা.)।

২. বুখারী- আমর ইবনে সালমান (রা.)।

৩. আবু দাউদ- আতা খোরাসানী (রা.)।

৪. দারাকুতনী, বায়হাকী- আয়েশা (রা.)।

৫. মিসকুল খিতাম।

৬. তালখীস।

৭. বুখারী- আবু কাতাদা (রা.)।

যে ব্যক্তি লোকদের ইমামতী করে তার নামায হালকা করা উচিৎ। কেননা তার পিছনে অসুস্থ, দুর্বল বৃদ্ধলোক থাকে। এটাও বর্ণিত হয়েছে যে, তার পিছনে ছোট ছেলে এবং (জরুরী) প্রয়োজন ওয়ালা লোকও থাকতে পারে।[১]

ইমাম যদি ভালভাবে নামায পড়ান তাহলে তিনিও সোয়াব পাবেন এবং মুক্তাদীরাও সোয়াব পাবে। আর তিনি যদি ভালভাবে নামায না পড়ান, তাহলে মুক্তাদীরা সে নামাযের সোয়াব পেয়ে যাবে এবং ইমামের জিম্মায় গুনাহ্ এবং আযাব রয়েছে।[২]

মুক্তাদীদের ইমামের অনুসরণ করার বিবরণ

মুক্তাদীদের ইমামের পূর্বে রুকু করা, সিজদা করা এবং সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যাওয়া ইত্যাদি সব কাজকর্ম নিষেধ। রাসূলে করীম (সঃ) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি ইমামের পূর্বে মাথা উঠাবে বা সিজদায় যাবে তার জানা উচিৎ যে, তার কপালে শয়তানের হাত রয়েছে।[৩] তিনি আরো ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি ইমামের পূর্বে নিজ মাথা উঠায় সে কি এ কথা হতে ভয় করে না যে এ ধরনের যেন না হয় যে, আল্লাহ্ তার মাথাকে গাধার মাথায় রূপান্তরিত করে দিবেন।[৪]

ইমাম যদি নামাযে কোন কিছু ভূলে যান তাহলে সুবহানাল্লাহ্ বলে কোন মুক্তাদী তাকে সচেতন করে দিবে। মহিলাদের ইমামতী যদি কোন মহিলা করেন এবং তিনি কোন কিছু ভুল করেন তবে কোন মহিলা মুক্তাদী তাকে হাততালি দিয়ে সতর্ক করে দিবে।[৫]

কোন ব্যক্তি একই নামাযে ইমাম এবং মুক্তাদী হতে পারে।[৬]

জ্ঞাতব্য ঃ এতে এটাই সাব্যস্ত হয় যে, মাসবুক এর পিছনেও ইক্তিদা (অনুসরণ) করা জায়েয। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সাধারণ ব্যক্তির পিছনে নামায আদায় করা জায়েয।

যার কোন রাকাত ইমামের সাথে পড়তে বাকী রয়ে যায়, সে যতক্ষণ পর্যন্ত

---

১. বুখারী, মুসলিম- আবু হুরায়রা (রা.)।

২. বুখারী- আবু হুরায়রা (রা.)।

৩. মুসলিম- আনাস (রা.)।

৪. মুয়াত্তা মালেক- আবু হুরায়রা (রা.)।

৫. বুখারী- সাহল বিন সা'দ (রা.)।

৬. মুসলিম- মুগীরা ইবনে শোবা (রা.)।

ইমাম সাহেব সালাম না ফিরেন ততক্ষণ উঠে দাঁড়াবে না।[১]

- ইমাম যদি কোন ওযরের কারণে বসে নামায পড়েন তাহলে মুক্তাদীদের দাঁড়িয়ে নামায পড়া উচিৎ।[২]

ইমামের পিছনে মুক্তাদীর দাঁড়াবার স্থান

যদি একজন ইমাম এবং একজন মুক্তাদী হন তাহলে মুক্তাদী ইমামের সাথে ডান পাশে দাঁড়াবে। যদি দ্বিতীয় মুক্তাদী এসে যায় তাহলে প্রথম মুক্তাদী পিছনে হটে যাবে অথবা দ্বিতীয়জন তাকে ছিপনে টেনে নিবে। যদি দু'জন ইমামের সাথে ডানে বামে দাঁড়িয়ে যায় তাহলে ইমাম তাদের হাত দিয়ে পিছনে হটিয়ে দিবেন।[৩]

যদি ইমাম, দু'জন পুরুষ এবং একজন মহিলা মুক্তাদী হয়, তাহলে পুরুষ মুক্তাদী দুজন ইমামের পিছনে এবং মহিলা মুক্তাদী এদের পিছনে দাঁড়াবে। আর যদি ইমাম ও একজন পুরুষ এবং একজন মহিলা মুক্তাদী হয়, তাহলে ইমামের সাথে পুরুষ মুক্তাদী দাঁড়াবে এবং মহিলা মুক্তাদী পিছনে দাঁড়াবে।[৪]

কাতারসমূহ সোজা করার বিবরণ

মুক্তাদী তার পার্শ্ববর্তীর সাথে কাঁধে কাঁধ মিলায়ে এবং পায়ের সাথে নিজ পা মিলায়ে দাঁড়াবে।[৫]

তাকবীর হয়ে যাবার পর ইমাম ডান পাশের মুক্তাদীদের বলবেন, সোজা হয়ে দাঁড়ান এবং কাতার সমান করুন, অতপর বাম পাশের মুক্তাদীদের বলবেন, সোজা হয়ে দাঁড়ান এবং কাতার সোজা করুন।[৬]

যে ব্যক্তি নামাযে আপন স্কন্ধ নরম রাখে (পাশে কাউকে ঘেঁসে দাঁড়াতে দেয়) সে খুব ভাল লোক।[৭]

মুক্তাদীদের উচিৎ ইমামকে মধ্যখানে রাখা। অর্থাৎ যেন এ ধরনের না হয় যে, একপাশে বেশী লোক এবং অন্য পাশে কম এবং মধ্যকার ফাক বন্ধ করবে।

---

১. মুসলিম।

২. বুখারী, মুসলিম- আয়েশা (রা.)।

৩. মিশকাত- জাবের (রা.)।

৪. মুসলিম- আনাস (রা.)।

৫. বুখারী- আব্বাস (রা.)।

৬. মিশকাত- আনাস (রা.)।

৭. আবু দাউদ- ইবনে আব্বাস (রা.)।

অর্থাৎ একে অপরের সাথে মিলে (ঘেঁষে ঘেঁষে) দাঁড়াবে।[১] মসজিদের থামের মাঝে কাতার করা নিষেধ।[২] পুরুষদের জন্য প্রথম কাতারে দাঁড়ানো বেশী সোয়াব[৩] এবং মহিলাদের উপর আল্লাহ তায়ালা এবং ফেরেস্তারা রহমত বর্ষণ করেন।[৪]

যে ব্যক্তি কাতারের পিছনে একাই নামায পড়ে তার নামায সঠিক হয় না।[৫]

যে সব ওয়াক্তে নামায পড়া নিষেধ

সূর্য উঠার সময়, ঠিক দুপুরের সময়, সূর্য ডুবার সময় নামায পড়বে না এবং ফজরের নামাযের পর সূর্য ভালভাবে না উঠা পর্যন্ত নামায পড়া উচিৎ নয়। আসরের নামাযের পর হতে সুর্যাস্ত পর্যন্ত নামায পড়া নিষেধ।[৬] কিন্তু যে যে ওয়াক্তে নামায পড়া প্রয়োজন সে নামায যদি কোন কারণে ছুটে যায় বা পড়তে না পারা যায় তাহলে এসব (নিষেধ) ওয়াক্তে পড়া জায়েয।[৭] মক্কা শরীফে নামায পড়া কোন ওয়াক্তেই নিষেধ নাই।[৮]

সুন্নাত নামাযের বিবরণ

জোহর নামাযের পূর্বে চার রাকাত সুন্নত পড়বে। দুই রাকাত পড়াও সহীহ হাদীস দ্বারা সাবেত রয়েছে। জোহর নামাযের পর দুই রাকাত সুন্নাত পড়বে। মাগরিবের পর নিজঘরে দুই রাকাত পড়বে। এশার নামাযের পর দুই রাকাত পড়বে এবং ফজরের নামাযের পূর্বেই দুই রাকাত হালকা ভাবে পড়বে। এই বার রাকাত (ফরজ ব্যতীত) যা উল্লেখ হয়েছে তা সুন্নত নামায। যে ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশ্য তা পড়ে আল্লাহ তার জন্য বেহেশতে ঘর তৈরী করেন।[৯]

এটাও বর্ণিত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি সর্বদা জোহরের পূর্বে চার রাকাত এবং পরে চার রাকাত পড়ে আল্লাহ তার উপর জাহান্নামের আগুন হারাম করে দনে।[১০] যদি কারো জোহরের পূর্বে চার রাকাত পড়তে বাকী থেকে যায় তাহলে

---

১. আবু দাউদ- আবু হুরায়রা (রা.)।
২. আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ- আব্দে হুমাইদ বিন মাহমুদ (রা.)।
৩. মুসলিম- আবু হুরায়রা (রা.)।
৪. আবু দাউদ- আয়েশা (রা.)।
৫. আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযী- অবেসা ইবনে সাঈদ (রা.)।
৬. মুসলিম- আমের (রা.)।
৭. বুখারী, মুসলিম- আবু সাঈদ খুদরী (রা.)।
৮. আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ- জুবাইর ইবনে মুতআম (রা.)।
৯. মুসলিম- উম্মে হাবীবা (রা.)।
১০. আহমাদ, সুনানে আরবা- উম্মে হাবীবা (রা.)।

জোহরের পরে তা পড়ে নিবে।[১]

জোহরের পূর্বের চার রাকাত এক সালামে পড়ার কথাও প্রমাণিত এবং দুই সালামে পড়াও প্রমাণিত।[২]

যে ব্যক্তি আসরের নামাযের পূর্বে চার রাকাত নামায পড়বে, সে রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর এ দোয়া পাবে- আল্লাহ্ তায়ালা তার উপর রহম করুন।[৩] এও বর্ণিত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি আসরের আগে চার রাকাত নামায পড়ে আল্লাহ্ তায়ালা তার শরীরের উপর জাহান্নামের আগুনকে হারাম করে দেন।[৪]

আসরের পূর্বে চার রাকাত নামায এবং ফরজ নামাযের মাঝে সালাম দ্বারা পার্থক্য করবে।[৫] আসরের পূর্বে দুই রাকাত নামায পড়ার কথাও বর্ণিত হয়েছে।[৬] সূর্যাস্তের পর এবং মাগরিব নামাযের পূর্বে দুই রাকাত নামায পড়বে।[৭]

মাগরিবের পরের দুই রাকাত সুন্নাতে (বেশীর ভাগ সময়ে) সূরা কাফিরুন এবং সুরা ইখলাস পড়বে।[৮]

ফজরের সুন্নাত এবং ফরজ নামাযের মাঝে প্রয়োজনের সময় কথা বলা জায়েয।[৯] ফজরের সুন্নাত এবং ফরজ নামাজের মাঝে ডান পাশে কাত হয়ে কিছুক্ষণ শুয়ে থাকা সুন্নত।[১০]

ফজরের পূর্বে ফরজ নামায শুরু হয়ে যাবার কারণে সুন্নত না পড়তে পারলে তা ফরজ নামাযের পরে পড়ে নেয়া জায়েয।[১১]

ফরজ নামায সমূহের তাকবীর হয়ে যাবার পর সুন্নাত ইত্যাদি নামায পড়া জায়েয নয়।[১২]

ফজরের সুন্নাত নামায যদি ফজরের পূর্বে না পড়া হয়ে থাকে তাহলে তা সূর্যোদয়ের পর পড়াও জায়েয।[১৩]

---

১. আবু দাউদ, ইবনে মাজা- আবু আইউব আনসারী (রা.)।
২. তিরমিযী- আসেম ইবনে হামযা (রা.)।
৩. আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযী।
৪. তবারানী।
৫. তিরমিযী- আলী (রাঃ)।
৬. আবু দাউদ- উম্মে সালমা (রা.)।
৭. বুখারী- আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল (রা.)।
৮. তিরমিজী- ইবনে মাসউদ (রা.)।
৯. মুসলিম- আয়েশা (রা.)।
১০. তিরমিযী।
১১. নায়লুল আওতার।
১২. মুসলিম- আবু হুরায়রা (রা.)।
১৩. তিরমিযী- আবু হুরায়রা (রা.)।

তাহাজ্জুদ নামাযের বিবরণ

তাহাজ্জুদ নামায ১৩ রাকাত এভাবে পড়বে যে দুই রাকাতে সালাম ফিরে আট রাকাত পড়বে। অতপর পাঁচ রাকাত বিতের পড়বে এবং এদের মাঝে তাশাহুদের জন্য বসবে না। একেবারে পঞ্চম রাকাতে তাশাহুদের জন্য বসবে। কিম্বা তের রাকাত এভাবে পড়বে যে ছয় সালামে বার রাকাত পড়বে এবং শেষে এক রাকাত বিতের পড়বে।[১]

যদি ১১ রাকাত তাহাজ্জুদ পড়ে তাহলে দুই দুই রাকাতে সালাম ফিরে ১০ রাকাত পড়বে এবং এক রাকাত বিতের পড়বে। অথবা ১১ রাকাত এভাবে পড়বে যে আট রাকাত চার চার রাকাতে সালাম ফিরবে এবং তিন রাকাত বিতের পড়বে।[২]

তাহাজ্জুদ নামায কখনো ৯ রাকাত কখানো ৭ রাকাত পড়বে।[৩]

তাহাজ্জুদ নামায আওয়াজ করে পড়তে পারে এবং নিঃশব্দেও পড়তে পারে, দুভাবেই পড়া জায়েয।[৪] বৃদ্ধ বয়সে কেউ যদি তাহাজ্জুদ নামাযের মধ্যে কেরাত লম্বা করতে চায় তবে বসে বসে কুরআন পড়বে। অতপর কেরাতের অল্প কিছু বাকী থাকতে উঠে দাঁড়াবে এবং কিছু কেরাত করে রুকু এবং সিজদা করবে। এভাবেই দ্বিতীয় রাকাত পড়বে।[৫]

ফরজ নামায সমূহের পর সবচেয়ে উত্তম নামায হচ্ছে তাহাজ্জুদের নামায। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তায়ালা রহম করল ঐ ব্যক্তির উপর যে রাতে তাহাজ্জুদ নামায পড়ে অতপর আপন স্ত্রীকে তাহাজ্জুদ নামাযের জন্য উঠায়। স্ত্রী যদি উঠতে না পারে তাহলে তার মুখে পানির ছিটা দিয়ে উঠায়। আল্লাহ তায়ালা ঐ মহিলার উপর রহম করুন যে রাতে উঠে তাহাজ্জুদের নামায পড়ে অতপর নিজ স্বামীকে তাহাজ্জুদ নামাযের জন্য উঠায়। সে যদি না উঠে তাহলে তার মুখে পানির ছিটা দিয়ে উঠায়।[৬]

---

১. বুখারী।

২. বুখারী, মুসলিম- আয়েশা (রা.)।

৩. আহমাদ, আবু দাউদ, নাসাঈ- আয়েশা (রা.)।

৪. আবু দাউদ- আবু হুরায়রা (রা.)।

৫. মুসলিম- আয়েশা (রা.)।

৬. মুসলিম- আবু হুরায়রা (রা.)।

যখন তাজাজ্জুদের নামাযের জন্য উঠবে তখন দশবার اَللّٰهُ اَكْبَرُ দশবার سُبْحَانَ দশবার سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ দশবার اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ দশবার لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ দশবার اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ দশবার اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ ضِيْقِ الدُّنْيَا وَضِيْقِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

দশবার পড়বে। অর্থ- হে আল্লাহ। আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি দুনিয়ার সংকীর্ণতা হতে, কিয়ামতের দিনের সংকীর্ণতা এবং কাঠিন্যতা হতে।[১]

বিতের নামাযের বিবরণ

বিতের নামায ৯ রাকাত ৭ রাকাত ৫ রাকাত ৩ রাকাত এবং ১ রাকাত পড়ার কথাও সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

যে ব্যক্তি ৯ রাকাত বিতের পড়তে চায় সে ৮ রাকাত পড়ে বসবে এবং আত্তাহিয়্যাতু পড়বে এবং সালাম না ফিরে উঠে দাঁড়াবে। অতপর নবম রাকাত পড়ে বসবে এবং আত্তাহিয়্যাতু দরুদ এবং অন্যান্য দোয়া পড়বে এবং সালাম ফিরবে।[২]

যে ব্যক্তি ৭ রাকাত বিতের পড়তে চায় সে ৬ রাকাত পড়ে বসবে এবং আত্তাহিয়্যাতু পড়বে এবং সালাম না ফিরে উঠে দাঁড়াবে। অতপর সপ্তম রাকাত পড়ে বসবে এবং আত্তাহিয়্যাতু দরুদ এবং অন্যান্য দোয়া পড়ে সালাম ফিরবে।[৩]

যে ব্যক্তি ৫ রাকাত বিতের পড়তে চায় সে তাশাহুদের জন্য কোথাও বসবে না এবং শেষ রাকাতে বসে আত্তাহিয়্যাতু দরুদ এবং অন্যান্য দোয়া পড়ে সালাম ফিরবে।[৪] যে ব্যক্তি ৩ রাকাত বিতের পড়তে চায় সে তাশাহুদের জন্য কোথাও না বসে তৃতীয় রাকাতে বসবে এবং আত্তাহিয়্যাতু দরুদ এবং অন্যান্য দোয়া পড়ে সালাম ফিরবে।[৫]

তিন রাকাত বিতের পড়লে প্রথম রাকাতে সূরা আ'লা এবং দ্বিতীয় রাকাতে সূরা কাফিরুন এবং তৃতীয় রাকাতে সূরা ইখলাস পড়বে।[৬]

---

১. আবু দাউদ, মিশকাত- শরীক হুজানী (রা.)।
২. বুখারী, মুসলিম- আয়েশা (রা.)।
৩. মুসলিম- সা'দ ইবনে হিশাম (রা.)।
৪. বুখারী মুসলিম- আয়েশা (রা.)।
৫. জুরকানী, শরহে মুয়াত্তা- আয়েশা (রা.)।
৬. আহমাদ, আবু দাউদ, নাসাঈ- উবাই ইবনে কা'ব (রা.)।

বিতের নামায পড়ে যখন সালাম ফিরবে তখন তিনবার سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ। পড়বে এবং তৃতীয় বার আওয়াজ একটু উচু করবে।[১]

যার এ আকাংখা হয় যে, সে শেষ রাতে উঠবে (নফল বা তাহাজ্জুদ পড়ার জন্য) সে রাতের প্রথম ভাগে বিতের পড়বে না।[২] যার এ আশংকা হবে যে, সে শেষ রাতে উঠতে পারবে না তাহলে সে রাতের প্রথমে ভাগেই বিতের পড়ে নিবে।[৩] যে ব্যক্তির বিতের নামায রয়ে যাবে সে ফজর নামাযের পূর্বে তা পড়ে নিবে।[৪]

ফজর নামাযে পর বিতের পড়া ঠিক নয়[৫] এবং এক রাতে দুই বিতের পড়াও জায়েয নহে।[৬]

যানবাহনের উপর নামায পড়া জায়েয।[৭] যানবাহনে নামায পড়ার শর্ত হচ্ছে তাকবীরে তাহরীমা বলার সময় মুখ কিবলার দিকে নিবে অতপর যে দিকেই মুখ থাক নামায পড়তে থাকবে।[৮] সুয়ারীর উপর রুকু এবং সিজদা ইশারায় করবে এবং সিজদার সময় বেশী ঝুকে মাথা নত করবে আর রুকুর সময় সমান্য ঝুকবে।[৯]

বিতেরের পর দুই রাকাত নামায বসে বসে পড়া মুস্তাহাব।[১০]

কেহ যদি তিন রাকাত বিতের নামাযে দুই রাকাত পড়ে সালাম ফিরে দেয় এবং জরুরী কথা বার্তা বলে অতপর তৃতীয় রাকাত পড়ে তাহলে তা জায়েয। বিতেরে এ দোয়া কুনুত (রুকুর পর হাত উঠায়ে) পড়বে ঃ

اَللّٰهُمَّ اهْدِنِىْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِىْ فِيْمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِىْ فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِىْ فِيْمَا اَعْطَيْتَ وَقِنِىْ شَرَّ مَا قَضَيْتَ فَانَّكَ تَقْضِىْ وَلَايُقْضٰى عَلَيْكَ اِنَّهٗ لَايَذِلُّ

---

১. তিরমিযী, নাসাঈ- আলী (রা.)।
২. মিশকাত।
৩. মুসলিম- জাবের (রা.)।
৪. হাকেম, বায়হাকী- আবু দারদা (রা.)।
৫. মুসলিম- সা'দ ইবনে হিশাম (রা.)।
৬. আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ- তলক ইবনে আলী (রা.)।
৭. বুখারী, মুসলিম- ইবনে উমর (রা.)।
৮. আবু দাউদ- জাবের (রা.)।
৯. মুসলিম।
১০. আহমাদ, সুনানে আরবা।

مَنْ وَالَيْتَ وَلَايَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ
وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ -

অর্থাৎ- 'হে আল্লাহ! আপনি আমাকে হেদায়েত দান করুন হেদায়েত দানকারীদের মাঝে (যাদেরকে আপনি হেদায়েত দান করেছেন তাদের অন্তর্গত করুন) এবং আমাকে নিরাপদে রাখুন ঐ দলের মাঝে যাদের আপনি নিরাপদে রেখেছেন (দুনিয়া এবং আখেরাতের বিপদ- হতে) এবং আপনি আমার অভিভাবকত্ব গ্রহণ করুন যাদের আপনি তত্ত্বাবধান গ্রহণ করেছেন এবং আপনি যা আমাকে দান করেছেন তাতে কল্যাণ ও বরকত দান করুন এবং আপনি আমাকে রক্ষা করুন অকল্যাণ হতে যা আপনি আমার জন্য ফয়সালা করেছেন। নিশ্চয় আপনি ফয়সালা করেন এবং আপনার উপর কোন ফয়সালা করা হয় না। আপনি যার বন্ধু তাকে কেউ লাঞ্ছিত করতে পারে না। আর আপনি যার বিপক্ষে (শত্রুতা করেন) তাকে কেউ ইজ্জত দিতে পারে না। আপনি বরকতময়, সুমহান হে আমার প্রভূ! এবং নবী (সা.) এর উপর আল্লাহর করুনা ও অনুগ্রহ বর্ষিত হোক।'[১]

ফজর এবং মাগরিবের নামাযে দোয়া কুনুত পড়া জায়েয।[২]

চাশত নামাযের বিবরণ

চাশত নামায চার রাকাত পড়বে। যদি কেহ চার রাকাতের বেশী পড়ে তাহলে সে এর সোয়াব পাবে।[৩]

তারাবী নামাযের বিবরণ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম রাতের প্রথম ভাগে, মধ্যভাগে এবং শেষ ভাগে ২৩, ২৫ এবং ২৭শে রমজানে জামায়াত করে তারাবী নামায পড়েছেন।[৪]

হযরত উমর (রা.) এর খেলাফত কালে তারাবী নামায নিয়মিতভাবে সাহাবীদের (জামায়াতবদ্ধ হয়ে) পড়ার কথা প্রমাণিত।

জ্ঞাতব্য ঃ তারাবী নামায রমজানে রাসূল (সা.) কর্তৃক বিতের সহ এগার রাকাতের বেশী পড়ার কথা কোন সহী হাদীসে নাই। মহিলারা তাবারী নামায পড়বে।

---

১. আহমাদ, সুনানে আরবা- হাসান ইবনে আলী (রা.)।

২. আহমাদ।

৩. মুসলিম- আয়েশা (রা.)।

৪. সুনানে আরবা- আবু যর (রা.)।

এস্তেখারা নামাযের বিবরণ

যদি কোন ব্যক্তির সামনে কোন (গুরুত্বপূর্ণ) কাজ এসে উপস্থিত হয় (এ কাজের ব্যাপারে কি সিদ্ধান্ত নিতে হবে সে জন্য) তাহলে সুন্নাত হলো এস্তেখারা করা। এভাবে এস্তেখারা করবে, প্রথমে অযু করবে, অতপর দুই রাকাত নফল নামায পড়বে। অতপর আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করবে এবং রাসূলুল্লাহ (সা.) এর প্রতি দরূদ পাঠ করবে। অতপর নিম্নোক্ত দোয়া পড়ে শুয়ে যাবে-

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْتَخِیْرُكَ بِعِلْمِكَ وَاَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَاَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِیْمِ فَاِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا اَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا اَعْلَمُ وَاَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوْبِ ـ اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ ... خَیْرٌ لِّیْ فِیْ دِیْنِیْ وَمَعَاشِیْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِیْ فَاقْدِرْهُ لِیْ وَیَسِّرْهُ لِیْ ثُمَّ بَارِكْ لِیْ فِیْهِ وَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ... شَرٌّ لِّیْ فِیْ دِیْنِیْ وَمَعَاشِیْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِیْ فَاصْرِفْهُ عَنِّیْ وَاصْرِفْنِیْ عَنْهُ وَاقْدِرْنِیْ لِلْخَیْرِ حَیْثُ كَانَ ثُمَّ اَرْضِنِیْ بِهٖ ـ

অর্থাৎ- হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট কল্যাণ কামনা করছি আপনার ইলমের সহযোগতিায় এবং আমি আপানার কল্যাণ পাবার জন্য আপনার কুদরত কামনা করছি এবং আমি প্রার্থনা করছি আপনার অনুকম্পা যা অতি বিরাট। নিশ্চয় আপনি ক্ষমতা রাখেন এবং আমি কোন কিছুর উপর ক্ষমতা রাখি না এবং আপনি গায়েব সমূহ জানেন। হে আল্লাহ! আপনি যদি জানেন যে এ কাজটি বা বিষয়টি (তার নাম উল্লেখ করবে) আমার দ্বীনের ক্ষেত্রে, আমার কর্মের দ্রুত বা মন্থর পরিণামের ক্ষেত্রে কল্যাণকর, তাহলে আমার জন্য তা নির্দিষ্ট করে দিন। এবং আমার জন্য তা সহজ করে দিন অতপর আমার জন্য তাতে বরকত দান করুন। আর আপনি যদি জানেন যে এ কাজটি ক্ষতিকারক আমার দ্বীনের ক্ষেত্রে, আমার জীবন যাপনের ক্ষেত্রে আমার কর্মের দ্রুত বা মন্থর পরিণামের ক্ষেত্রে, তাহলে তা আমার হতে দূর করুন এবং তা হতে আমাকে দূর করুন এবং

যেখানে আমার জন্য কল্যাণ রয়েছে তা নির্দিষ্ট করে দিন। অতপর আমাকে তাদ্বারা রাজী সন্তুষ্ট করুন।[১]

জ্ঞাতব্য ঃ এ দোয়া পড়ে কাজ করলে অবশ্যই আল্লাহ্ তায়ালা তার জন্য কল্যাণ করবেন এবং অকল্যাণ হতে রক্ষা করবেন। কেউ কেউ বলেন এ দোয়া তিনদিন বা সাত দিন পড়লে ফলাফল পাওয়া যাবে। স্বপ্নে কিছু জানা যাবে অথবা মনের মাঝে একাজ করা বা না করার ব্যাপারে একটা সিদ্ধান্ত বা অনুরাগ সৃষ্টি হবে। সেটাকেই আল্লাহর হুকুম বলে মনে করবে।

সফরে নামায কসর করার বিবরণ

মুসাফির যখন নিজঘর থেকে সফরের ইচ্ছায় বের হবে তখন নামায কসর করবে অর্থাৎ চার রাকাতের স্থলে দুই রাকাত পড়বে। কিন্তু মাগরিবের নামায তিন রাকাত। তা বাড়ীতে এবং সফরে তিন রাকাতই পড়বে। ফরজ নামাযেও কসর নাই এর কেরাত লম্বা হওয়ার কারণে।[২]

মুসাফিরের জন্য নামায কসরের যে হুকুম রয়েছে তা আল্লাহ্ তা'য়ালার দেয়া সদকা। এ সাদকা গ্রহণ করা উচিৎ।[৩] আল্লাহ্ তায়ালা এটা পছন্দ করেন যে, তার রুখসাত (অনুমতি) দেয়া কাজকর্ম পালন করা হয়।[৪] যদি কোন ব্যক্তি কোন শহরে অবস্থানের ব্যাপারে অনিশ্চিত অবস্থায় থাকে (কতদিন থাকতে হবে তা নিশ্চিত নয়) তাহলে ২০ দিন পর্যন্ত কসর পড়বে। আর যখন কেউ চার দিন অবস্থানের এরাদা করে তখন পুরা নামায পড়বে।[৫] যদি চার দিনের বেশী কেউ তার বাসস্থান থেকে সফরের এরাদা করে বের হয়ে থাকে তাহলে তাকে মুসাফির বলে গণ্য করা হবে। সে কসর করবে যদিও সে স্থান এক বারীদ অর্থ বার মাইলেরও কম দুরত্ব হয়।[৬]

রাসূলুল্লাহ (সা.) কর্তৃক সফরে সুন্নাত নামায পড়াও সাব্যস্ত হয়েছে। সুতরাং যে ব্যক্তি তা পড়বে সোয়াব পাবে এবং যে পড়বে না, তাকে এ ব্যাপারে ধরা হবে না।

---

১. বুখারী।
২. বুখারী- আয়েশা (রা.)।
৩. মুসলিম।
৪. আহমাদ।
৫. দুরারুল বাহিয়া।
৬. রওযাতুন নাদিয়া।

সফরে নামায জমা করে পড়া জায়েয। জোহরের ওয়াক্তে জোহরের সাথেই আসর পড়া কিম্বা আসরের সাথে জোহর পড়া চলবে। এভাবেই মাগরিবের ওয়াক্তে মাগরিব এবং এশা, কিম্বা এশার ওয়াক্তে এশা এবং মাগবির পড়ে নিবে।[১]

বাড়িতে নামায জমা করার বিবরণ

জরুরী প্রয়োজনের সময়ে বাড়ীতে নামায জমা করে পড়া জায়েয।[২]

ভয়ভীতি কালীন নামায (সালাতে খওফ)

যুদ্ধ চলাকালীন শত্রুর মোকাবিলা করার সময় এক রাকাত নামায পড়লেই চলবে।[৩] শত্রুর মোকাবিলা করার সময় রাসূলুল্লাহ (সা.) কর্তৃক কয়েকভাবে নামায পড়ার বর্ণনা এসেছে, এর যে কোন একটা অনুসরণ করলেই চলবে।*

যখন ভয় বিদ্যমান ও প্রবল থাকে, মারামারী এবং লড়াই শুরু হয়ে যায় তখন পদাতিক বা সোয়ারী যে অস্থায় হোক নামায পড়বে, যদিও কিবলার দিকে মুখ না থাকে এবং ইশারা করে নামায আদায় করতে হয়।[৪]

জুমার নামাযের বিবরণ

জুমার নামায ফরজ। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نُوْدِىَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ -

"হে ঈমানদারগণ! যখন তোমাদেরকে জুমার দিন নামাযের জন্য আহ্বান করা হয় (অর্থাৎ যখন জুমার জন্য আযান দেয়া হয়) যখন তোমরা আল্লাহর স্মরণের জন্য দৌড়িয়ে এসো এবং বেচাকিনা ত্যাগ করো।" (সূরা জুমা ঃ ৯)

---

১. আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযী- মুয়ায (রা.)।
২. মুসলিম- ইবনে আব্বাস (রা.)।
৩. মুসলিম।
৪. দুররুল বহিয়া।

* এখানে দুইটি পন্থা উল্লেখ করা হলো ঃ ১. ইমামের সাথে এক দল দুই রাকাত নামায পড়বে অন্যদল শত্রুর মোকাবিলা করবে। দুই রাকাত পড়ে তারা শত্রুর মোকাবিলায় যাবে এবং প্রহরারত দল এসে ইমামের সাথে দুই রাকাত পড়বে। ২. একদল ইমামের পিছনে দাঁড়াবে অন্যদল শত্রুর মোকাবিলা করবে। ইমামের সাথে দাঁড়ান দল ইমামের সাথে এক রাকাত পড়া হলে ইমাম দাঁড়িয়ে থাকবে আর তারা নিজেরা নিজেরা আরেক রাকাত পড়ে নিয়ে শত্রুর মোকাবিলায় চলে যাবে। মোকাবিলাকারী দল এসে ইমামের সাথে দাঁড়ায়ে এক রাকাত পড়বে। এরপর নিজেরা আরো এক রাকাত পড়ে নিবে। ইমাম এদের নিয়ে সালাম ফিরবে।

জুমার নামায দাস, মহিলা, অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক, অসুস্থ এবং মুসাফিরের উপর ফরজ নয়।[১]

রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন ঃ আমার ইচ্ছা হয় যে, আমি আমার স্থলে কাউকে জুমা পড়াতে বলি এবং যে ব্যক্তি জুমা পড়তে আসে না, নিজে গিয়ে তার ঘর জ্বালিয়ে দেয়।[২]

যে ব্যক্তি এক জুমা পড়বে না সে এক দিনার সাদকা করবে। যার এক দিনার সাদকা করার সামর্থ নেই সে অর্ধেক দিনার সাদকা করবে এবং যে ব্যক্তি খুবই দরিদ্র সে এক দিরহাম সাদকা করবে। এক দিরহামের সামর্থ না রাখলে অর্ধেক দিরহাম সাদকা করবে। এতে সামর্থবান না হলে এক সা গম সাদকা করবে। এর সামর্থ না থাকলে অর্থ সা' গম অথবা এক মুদ বা অর্ধ মুদ সাদকা করার কথাও এসেছে।[৩]

জ্ঞাতব্য ঃ সোনা যদি ষোল টাকা তোলা হয়, তাহলে এক দিনারে ছয় টাকা এবং অর্ধ দিনারে তিন টাকা আসে। মুদ হচ্ছে চোঙ্গা বা এ ধরনের পাত্রে মাপ। এক মুদে তিন পোয়া মত আসে। চার মুদে এক সা' এবং তা প্রায় পৌনে তিনসের মত ওজন হয়। (এক মুদকে কেহ কেহ এক অঞ্জলীও ধরেন।)

গ্রামে জুমার নামায পড়া জায়েয।[৪]

যে ব্যক্তি ইমামের সাথে এক রাকাত জুমার নামায পাবে তার জুমা আদায় হয়ে যাবে। সে উঠে আর এক রাকাত পড়ে নিবে।[৫] আর যে ব্যক্তি ইমামের সাথে জুমার পুরা এক রাকাত পাবে না সে চার রাকাত জোহর নামায পড়বে।[৬]

যে ব্যক্তি জুমার দিন গোসল করবে এবং মুসজিদে যাবে এবং আল্লাহ তায়ালা তার জন্য যে পরিমাণ নির্ধারিণ করেছেন নামায পড়বে। (অর্থাৎ যতদূর সম্ভব নফল নামায পড়বে) অতপর ইমামের খুতবা পড়া পর্যন্ত চুপ থাকবে এবং ইমামের সাথে জুমা পড়বে, আল্লাহ তা'য়ালা তার সেসব গুনাহ মাফ করে দিবেন যা সে গত জুমা থেকে এ জুমা পর্যন্ত করেছিল এ ছাড়া আরো অতিরিক্ত তিন দিনের গুনাহ মাফ করে দিবেন।[৭]

---

১. আবু দাউদ, দারকুতনী।
২. মুসলিম- ইবনে মাসউদ (রা.)।
৩. আবু দাউদ।
৪. বুখারী- ইবনে আব্বাস (রা.)।
৫. নাসাঈ, ইবনে মাজা, দারকুতনী- ইবনে উমর (রা.)।
৬. জুরকানী শরহে মুয়াত্তা।
৭. মুসলিম- আবু হুরায়রা (রা.)।

এও বর্ণিত হয়েছে যে, জুমার দিন যথাসম্ভব পবিত্রতা অর্জন করবে (অর্থাৎ গোফ, নখ কাটবে, বগল ও অন্যান্য স্থানের লোম দূর করবে, কাপড় পরিষ্কার করবে এবং মাথা ধুবে) এবং তেল অথবা সুগন্ধি যদি নিজের কাছে থাকে লাগাবে নতুবা স্ত্রীর নিকট থেকে নিয়ে লাগাবে। অতপর মসজিদে যাবে এবং দুজনের মাঝ ফেড়ে সামনে যাবে না, তাহলে আল্লাহ্ তায়ালা তার গত জুমা হতে এ জুমা পর্যন্ত সংঘটিত গুনাহ্ সমূহ মাফ করে দিবেন।[১]

যে ব্যক্তি জুমার দিন খসবু পাবে না, তার জন্য পানিই খসবু অর্থাৎ পানি দিয়ে উত্তমভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হবে।[২]

জুমার দিন মসজিদের দরজায় ফেরেস্তা থাকে। যে ব্যক্তি প্রথমে মসজিদে প্রবেশ করে তাকে লিখে নেয়। যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম মসজিদে আসে তার উদাহরণ হলো ঐ ব্যক্তির মত যে মক্কায় কুরবানীর জন্য উট প্রেরণ করলো তাতে অনেক সোয়াব মিলে। এরপর যে ব্যক্তি মসজিদে আসে তার উদাহরণ হলো দুম্বা প্রেরণের। এরপর যে ব্যক্তি আসে তার উদাহরণ হলো মুরগী প্রেরণের। এরপর যে আসে তার উদাহরণ হলো ডিম প্রেরণের মতো। যখন ইমাম খুতবা দিতে শুরু করেন তখন ফেরেশতা নিজ দফতর গুটিয়ে নেয় এবং খুতবা শুনতে শুরু করে।[৩]

ইমাম সাহেব মিম্বরে বসার সময় যে আযান দেয়া হয় তা রাসূলুল্লাহ (সা.) এর মুবারক যুগে এবং আবু বকর ও উমর (রা.) এর খেলাফত কালেও সেই (একই) আযান ছিল এবং ইহাই সুন্নাত। এর পূর্বে যে আযান বলা হয়ে থাকে তা হযরত উসমান (রা.) নির্দিষ্ট করেছিলেন এবং এ আযান জায়েয।

যে আযান ইমাম মেম্বরে সবার সময় বলা হয়ে থাকে তা মসজিদের দরজার উপর দিতে হবে।[৪]

জুমা বা জুমা ছাড়া অন্য নামাযে কাউকে তার জায়গা হতে উঠিয়ে সে জায়গায় নিজে বসে পড়া নিষেধ।[৫]

নিজ কাজ কারবারের কাপড় ছাড়া জুমার জন্য আলাদা কাপড় করে রাখা

---

১. বুখারী।
২. আহমদ, তিরমিযী- বারা (রা.)।
৩. বুখারী, মুসলিম- আবু হুরায়রা (রা.)।
৪. তবারানী।
৫. বুখারী, মুসলিম- নাফে (রা.)।

জায়েয।[১] জুমার দিন যখন ইমাম মিম্বরের উপর বসবে তখন লোকদের সালাম দিবে[২] এবং ইমাম সাহেব লাঠি কিম্বা ছড়ির উপর ঠেস দিয়ে খুতবা পাঠ করবে।[৩]

জুমার দিন ইমাম যখন খুতবা দেবার জন্য মিম্বরের উপর উঠবে, তখন কেবলার দিকে পিঠ এবং লোকদের দিকে মুখ করে মিম্বরের উপর বসবে। যখন মুয়ায্যিন আযান দেয়া শেষ করবে তখন খুতবা দেবার জন্য দাঁড়াবে। প্রথম খুতবা শেষ করে বসবে (এবং প্রয়োজন ব্যতিরেকে কথাবার্তা বলবে না)। এরপর দাঁড়িয়ে দ্বিতীয় খুতবা দিবে।[৪]

প্রয়োজনের সময় ইমামের কথা বার্তা বলা জায়েজ। একবার হযরত রাসূলে করীম (সা.) জুমার খুতবা দিতে দিতে মিম্বর হতে নীচে নামেন এবং আবু রিফাআকে দ্বীনের শিক্ষাদেন। (আরেকবার) রাসূলে কারীম (সা.) জুমার দিন খুতবা দিতে দিতে মিম্বর হতে নেমে পড়েন এবং হাসান ও হোসানইকে উঠিয়ে নিয়ে মিম্বরে উঠেন এং বলেন আল্লাহ্ তায়ালা সত্যই বলেছেন "নিশ্চয় তোমাদের ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি ফিতনা স্বরূপ।" আমি এদের দু'জনকে দেখে সবুর করতে পারিনি। অতপর তিন খুতবা দিতে শুরু করেন।[৫] (আরেক বার) রাসূলুল্লাহ (সা.) খুতবা দিতে ছিলেন এমন সময় এক ব্যক্তি আসে। তিনি তাকে বললেন তুমি নামায (অর্থাৎ সুন্নাত নামায) পড়েছ? সে উত্তর দিলো, না। অতপর রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন দাঁড়াও এবং দুই রাকাত নামায পড়ো এবং অল্প কেরাত করো।[৬] জুমার নামায লম্বা করা এবং খুতবা সংক্ষিপ্ত করা ইমামের বিচক্ষণতার আলামত।[৭] জুমার খুতবা শুনতে যদি কারো তন্দ্রা আসে তাহলে নিজ জায়গা পরিবর্তন করে নেবে।[৮]

জুমায় গোট মেরে বসা জায়েয।[৯]

---

১. মুয়াত্তা, ইবনে মাজা- আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.)।

২. ইবনে মাজা- জাবের (রা.)।

৩. আবু দাউদ- হাকাম ইবনে হুজন (রা.)।

৪. আবু দাউদ- ইবনে উমর (রা.)।

৫. আবু দাউদ।

৬. বুখারী,, মুসলিম- জাবের (রা.)।

৭. বুখারী- আম্মার (রাঃ)।

৮. তিরমিযী- ইবনে উমর (রা.)।

৯. বুখারী- ইবনে উমর (রা.)।

জ্ঞাতব্য : গোট মেরে বসা ঐ অবস্থাকে বলা হয় যা উরুকে পেটের সাথে মিলিয়ে বা উরুর উপর হাত রেখে বসা।

জুমার দিন যখন ইমাম খুতবা দিতে শুরু করবেন তখন মুক্তাদীরা তার সামনে বসবে।[১] ইমাম খুতবা দেয়া অবস্থায় যে ব্যক্তি কংকর নাড়াচাড়া করলো সে বেহুদা বা বাজে কাজ করলো। অর্থাৎ কংকর এদিক সেদিক নাড়াচাড়া করলো, কোন কুটা ভাঙ্গলো কিম্বা মাটি ঠোকরালো কিম্বা তা নিয়ে দূরে ফেললো কিম্বা এ ধরনের কিছু কাজ করলো সে নিরর্থক কাজ করলো।[২]

ইমামের খুতবা দেবার সময় যে ব্যক্তি কথা বলে সে ঐ গাধার মত যার উপর কিতাবের বোঝা চাপানো হয়েছে। আর যে ব্যক্তি তাকে বলবে চুপ থাকো তার নামায (সম্পূর্ণ) হয় না।[৩]

যে ব্যক্তি নিজে গোসল করবে এবং নিজ স্ত্রীকে গোসল করাবে অর্থাৎ তার সাথে সহবাস করবে, সকাল সকাল গিয়ে প্রথম খুতবা পাবে এবং ইমামের নিকটে বসবে এবং খুতবা শুনবে, নিরর্থক কথাবার্তা বলবে না, তাহলে সে প্রতি পদক্ষেপের জন্য এক বছর দিনে রোজা রাখা এবং রাতে সারারাত নফল নামায পড়ার সমান নেকী পাবে যা তার আমল নামায় লিখা হবে।[৪]

জুমার নামাযের পর দুই রাকাত, চার রাকাত কিম্বা ছয় রাকাত নামায পড়বে। ছয় রাকাত এভাবে পড়বে প্রথমে দুই রাকাত পড়বে, অতপর চার রাকাত পড়বে[৫] যেখানে ফরজ পড়বে সেখানে সুন্নাত পড়বে না। আগে পরে অথবা এদিক ওদিক সরে গিয়ে পড়বে কিম্বা ফরজ এবং সুন্নাতের মাঝখানে কথা বলে নিবে।[৬]

কুরবানীর ঈদ শুক্রবারে হলে জুমার নামায পড়া ওয়াজিব নয়।[৭]

---

১. বুখারী- আবু সাঈদ খুদরী (রা.)।

২. মুসলিম।

৭. মিশকাত।

৪. আহমাদ, তারগীব ওয়াত্তারহীব।

৫. আবু দাউদ।

৬. মুসলিম।

৭. বুখারী।

ঈদের নামাযের বিবরণ

দুই ঈদের নামায সুন্নাত[১] এবং ঈদের দিন গোসল করা মুস্তাহাব।[২]

যে ব্যক্তির ঈদের নামায ছুটে যাবে সে দুই রাকাত নামায পড়ে নিবে এবং যে মহিলার ঈদের নামায ছুটে যাবে সেও দুই রাকাত নামায পড়ে নিবে।[৩] ঈদের নামায পড়ার জন্য প্রাপ্ত বয়স্ক মহিলাদের ঈদগাহে নিয়ে যাবে। (মুসলমানদের দুয়াতে শরীক হবে) এবং লোকদের সাথে তাকবীর পড়বে এবং পর্দা করে জামায়াতের পিছনে দাঁড়াবে।[৪]

ঈদগাহে নামায পড়ার জন্য যে রাস্তা দিয়ে যাবে সেই রাস্তা দিয়ে আসবে না।[৫] ঈদের দিন যদি বৃষ্টি হয় তাহলে ঈদের নামায মসজিদে পড়বে।[৬]

ঈদুল আযাহার দিন তাড়াতাড়ি নামায পড়বে এবং ঈদুল ফিতরের দিন দেরী করে নামায পড়বে : ঈদুল ফিতরের দিন বেজোড় খেজুর খেয়ে নামায পড়তে যাবে এবং ঈদুল আযহার দিন নামাযের পর খাবে।[৭] দুই ঈদের দিন লাল চাদর পরা সুন্নাত।[৮]

ঈদগাহে ইমাম নিজের সামনে সুতরা খাড়া রাখবে এবং সে দিকে নামায পড়বে। দুই ঈদের নামাযই খুতবার পূর্বে পড়বে[৯] এবং ঈদের নামাযের পর ইমাম লাটির উপর ঠেস দিয়ে খুতবা দিবে।[১০]

ঈদের নামাযের পূর্বে বা পরে (কোন) নফল নামায পড়বে না[১১] এবং ঈদের নামায আযান এবং তাকবীর ছাড়াই পড়তে হবে।[১২]

---

১. প্রাগুক্ত
২. মুয়াত্তা মালেক।
৩. বুখারী।
৪. মুসলিম।
৫. বুখারী।
৬. মিশকাত- আবু হুরায়রা (রা.)।
৭. আহমাদ, মিশকাত।
৮. ইবনে খুজায়মা।
৯. বুখারী।
১০. আবু দাউদ।
১১. বুখারী, মুসলিম- ইবনে আব্বাস (রা.)।
১২. মুসলিম- জাবের (রা.)।

দুই ঈদের নামাযেই প্রথম রাকাতে কেরাতের পূর্বে সাত তাকবীর (তাকবীরে তাহরিমা ছাড়া) দিতে হবে এবং দ্বিতীয় রাকাতে কেরাতের পূর্বে পাঁচ তাকবীর (উঠার জন্য যে তাকবীর দেয়া হয় তা ছাড়া) দিতে হবে।[১]

ইমাম ঈদগাহে মহিলাদেরকে নসিহত শোনাবেন এবং তাদেরকে ফকীর-মিসকিনকে দান-সাদকা করার করার জন্য উৎসাহিত করবেন।[২]

ইস্তিসকা নামাযের বিবরণ

যখন দুর্ভিক্ষ শুরু হয়ে যাবে এবং বৃষ্টি নামবে না, তখন কোন একদিন নির্দিষ্ট করবে[৩] এবং সেদিন ময়লা কাপড় পরে বিনয়ভাবে এবং কাকুতি মিনতি করতে করতে মাঠে যাবে।[৪] যখন সূর্য কেবল দেখা দিবে তখন ইমাম মিম্বরের উপর চড়বে, তাকবীর বলবে এবং আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করবে। অতপর বলবে ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ يَفْعَلُ مَايُرِيْدُ - اَللّٰهُمَّ اَنْتَ اللّٰهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ الْغَنِىُّ وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ اَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ وَاجْعَلْ مَا اَنْزَلْتَ لَنَا قُوَّةً وَّبَلاَغًا اِلٰى حِيْنٍ -

অর্থাৎ- সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্ জন্য, যিনি সারা জাহানের প্রতিপালক। যিনি অতীব দয়ালু ও দাতা। বিচার দিনের মালিক। আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই। তিনি যা ইচ্ছা তাই করেন। হে আমার প্রভু! আপনিই আল্লাহ। আপনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই। আপনি ধনী এবং আমরা দরিদ্র। আপনি আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করুন। আপনি যা নাজিল করবেন তাতে আমাদের জন্য শক্তি দিন এবং এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত (তাতে) আমাদেরকে ফায়দা দিন।

অতপর দুই হাত এতদূর পর্যন্ত উঠাবে যাতে বগল দেখা যায় অর্থাৎ হাত লম্বা করবে কিন্তু হাত মাথার চেয়ে উঁচু করবে না, মুখের সামনে রাখবে,[৩] হাত সম্প্রসারণ করবে এবং এর পিঠের দিক উপরে করবে এবং তালুর দিক মাটির দিকে করবে। অতপর লোকদের দিকে পিঠ করে কেবলার দিকে মুখ করবে এবং চাদর উল্টিয়ে নিবে। এভাবে চাদর উল্টাবে- ডান হাত দিয়ে চাদরের বাম দিকের

---

১. আবু দাউদ- আমর ইবনে শোয়াইব (রা.)।

২. বুখারী, মুসলিম- আবু সাঈদ খুদরী (রা.)।

৩. আবু দাউদ।

নীচের কোনা ধরবে এবং বাম হাত দিয়ে চাদরের ডান দিকের নীচের কোনা ধরবে এবং দুই হাতকেই পিছন দিয়ে ঘুরাবে এভাবেই যে কোনা ডান হাত দিয়ে ধরেছিল তা ডান কাধে চলে আসবে এবং যে কোনা বাম হাত দিয়ে ধরেছিল তা বাম কাধে চলে আসবে। যে ব্যক্তির এভাবে চাদর উল্টানো কঠিন মনে হবে সে ঘাড়ের উপরে তা উল্টিয়ে নিবে।[১] অতপর এই দোয়া পড়বে ঃ

প্রথম দোয়া ঃ

اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا ، اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا ، اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا ـ

অর্থাৎ- হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে পানি পান করান। হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরক পানি পান করান। হে আল্লাহ! আমাদেরকে পানি পান করান।[২]

দ্বিতীয় দোয়া ঃ

اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيْثًا مَرِيْئًا مَرِيْعًا نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ عَاجِلاً غَيْرَ اٰجِلٍ ـ

অর্থাৎ- হে আল্লাহ! আমাদের পানি পান করান, এমন পানি যা উত্তম। পানির উপকারিতাও খুব ভাল হয়। এমন পানি যা উপকারী, তা যেন ক্ষতিকারক না হয় এবং পানি যেন তাড়াতাড়ী দেয়া হয় বিলম্বে না দেয়া হয়।[৩]

তৃতীয় দোয়া ঃ

اَللّٰهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ وَبَهَائِمَكَ وَانْشُرْ رَحْمَتَكَ وَاَحْيِ بَلَدَكَ الْمَيِّتَ ـ

অর্থাৎ- হে আল্লাহ! আপনি পানি পান করান আপনার বান্দাদের এবং জীবজন্তুদের। এবং আপনি আপনার রহমতকে ছড়িয়ে দিন এবং আপনার মৃত শহরকে জীবিত করুন।[৪]

---

১. আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ।

২. আবু দাউদ।

৩. মিসকুল খিতাম।

৪. আবু দাউদ- মুহাম্মদ বিন সালমা (রা.)।

চতুর্থ দোয়া ঃ

اَللّٰهُمَّ جَلِّلْنَاسَحَابًا كَثِيْفًا كَسِيْفًا نَضِيْفًا ذُلُوْقًا ضُحُوْكًا

تُمْطِرُنَا مِنْهُ رِذَاذًا قَطْقَطًا سِجْلاً يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالاِكْرَامِ -

অর্থাৎ- হে আল্লাহ! আমাদেরকে গাঢ় মেঘমালা দিয়ে ঢেকে দিন, এমন মেঘমালা যা বৃষ্টিতে ভরপুর এবং যা বিজলী চমকায়। আমাদের উপর বৃষ্টি মুষলধারে নাজিল করুন যা বড় ফোটা, ছোট ফোটা সম্বলিত, হে সম্মানিত মহান প্রভু![১]

ইমাম যখন এসব দোয়াপড়া শেষ করবেন তখনও দুই হাত উঠিয়ে রাখবেন এবং লোকদের দিকে মুখ করবেন এবং মিম্বর হতে নেমে লোকদের দুই রাকাত নামায পড়াবেন এবং এতে কেরাত জোরে করে পড়বেন।[২]

সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণের নামাযের বিবরণ

যখন সূর্য বা চন্দ্রে গ্রহণ লাগবে, তখন কোন ব্যক্তিকে লোকজনকে ডাকার জন্য পাঠাতে হবে, যেন সকলে মসজিদে আসে।[৩] অতপর জামাতের সাথে দুই রাকাত নামায পড়বে এবং ইমাম কেরাত উচ্চ কণ্ঠে পড়বে। প্রথম রাকাতে সূরা আনকাবুত এবং দ্বিতীয় রাকাতে সূরা রুম পড়বে। প্রত্যেক রাকাতে দুই রুকু কিম্বা তিন রুকু বা চার রুকু কিম্বা পাঁচ রুকু করবে এবং দুই রুকুর মাঝে কেরাত পড়বে প্রত্যেক রাকাতে এক রুকু দেয়ার কথাও বর্ণিত হয়েছে। নামায শেষ করার পর লোকজনকে খুতবা শুনাবে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণ না ছুটবে ততক্ষণ পর্যন্ত নামায এবং খুতবায় মশগুল থাকবে।[৪]

রোগীর দেখাশুনা-সেবা শুশ্রূষা করা

এক মুসলমানের উপর অপর মুসলমানের ছয়টি হক (অধিকার) রয়েছে। (১) যখন দেখা হবে তখন السلام عليكم। বলে সালাম দিবে, (২) যখন দাওয়াতে দিবে তখন তা গ্রহণ করবে এবং (৩) যদি উপদেশ চায় তাহলে সৎ উপদেশ দিবে। (৪) হাঁচি দিয়ে الحمد لله। বলবে তার জবাব দিবে يرحمك الله। বলে। (৫) যখন অসুস্থ হবে তখন তার অবস্থার খোঁজ-খবর নিবে (দেখা-শুনা

১. আবু দাউদ- আমর বিন শুয়াইব (রা.)।

২. বুলুগুল মারাম।

৩. বুখারী, মুসলিম- আয়েশা (রা.)।

৪. বুখারী, মুসলিম।

করবে) এবং (৬) মারা গেলে জানাযা নামায ও দাফন করার জন্য সঙ্গে যাবে।[১]

অমুসলিম এর খোজ খবর নেয়া (অসুস্থ হলে) জায়েয।[২] যখন কোন মুসলমান কোন মুসলমানের অসুস্থতার খোঁজ খবর নেয় তখন সত্তর হাজার ফেরেশতা তার জন্য রহমত এবং মাগফেরাতের দোয়া করে।[৩]

প্রথম দোয়া ঃ

اَللّٰهُمَّ رَبَّ النَّاسِ اَذْهِبِ الْبَأْسَ اشْفِ اَنْتَ الشَّافِىْ

لَاشِفَاءَ اِلاَّ شِفَاؤُكَ شِفَاءً لاَيُغَادِرُ سَقْمًا-

অর্থাৎ- অসুখ দূর করুন হে মানুষের রব! সুস্থতা দিন, আপনিই প্রকৃত শেফাদানকারী। আপনার দেয়া সুস্থতা ছাড়া কোন সুস্থতা নাই (হতে পারে না।) এমন সুস্থতা দান করুন, যাতে কোন অসুখ থাকতে না পারে।[৪]

দ্বিতীয় দোয়া ঃ لَابَأْسَ طُهُوْرٌ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ-

অর্থাৎ- কোন ভয় নেই (অর্থাৎ এ অসুখের জন্য কোন চিন্তা করবে না।) কেননা আল্লাহ্ তা'আলাই ভাল করবেন (সুস্থতা দিবেন)।[৫]

তৃতীয় দোয়া ঃ

اَسْاَلُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اَنْ يَّشْفِيَكَ ـ

অর্থাৎ- আমি প্রার্থনা করছি মহান আল্লাহর নিকট, যিনি বিরাট আরশের রব, তিনি যেন আপনাকে সুস্থতা দান করুন।[৬]

চতুর্থ দোয়াঃ যখন কোন ব্যক্তি নিজেই অসুস্থ হয়, তাহলে মুয়াওঅজাতাইন অর্থাৎ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَق এবং قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاس পড়ে নিজের উপর ফুঁ দিবে। এবং যদি বাড়ীর অন্য কেউ অসুস্থ হয় তার উপর উক্ত সূরাদ্বয় পড়ে ফুঁ দিবে এবং এই সূরার সাথে যদি قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ সূরা মিলিয়ে নেয় তবে তা উত্তম।[৭]

১. বুখারী, মুসলিম- মুগীরা (রা.)।
২. মুসলিম।
৩. বায়হাকী, মিশকাত- আবু রুজাইন (রা.)।
৪. বুখারী, মুসলিম- আয়েশা (রা.)।
৫. বুখারী- ইবনে আব্বাস (রা.)।
৬. আবু দাউদ, তিরমিযী- ইবনে আব্বাস (রা.)।
৭. মিশকাত- আয়েশা (রা.)।

পঞ্চম দোয়া ঃ

যে ব্যক্তি নিজেই অসুস্থ হবে, সে প্রথমে তিনবার বিসমিল্লাহ পড়বে। অতপর এ দোয়া পড়বে ঃ

اَعُوْذُ بِعِزَّةِ اللّٰهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّمَا اَجِدُ وَاُحَاذِرُ

অর্থঃ আমি আশ্রয় চাচ্ছি আল্লাহর ইজ্জত এবং কুদরতের সাথে ঐ অমঙ্গলতা হতে যা আমি অনুভব করছি এবং যাকে ভয় করছি (অর্থাৎ আরো বৃদ্ধি হবার ব্যাপারে)।[১]

ষষ্ঠ দোয়া ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ اُرْقِيْكَ مِن كُلِّ دَاءٍ يُؤْذِيْكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ اَوْ عَيْنٍ حَاسِدٍ اَللّٰهُ يَشْفِيْكَ بِسْمِ اللّٰهِ اُرْقِيْكَ -

অর্থাৎ- আল্লাহর নামে তোমাকে ঝাড়ফুঁক করছি সমস্ত রোগ হতে, যা তোমাকে কষ্ট- যন্ত্রণা দেয়। প্রত্যেক বদ লোকের অকল্যাণ এবং হিংসুক চোখের অকল্যাণ হতে। আল্লাহ তোমাকে শিফা দান করুন। আল্লাহর নামে তোমাকে মন্ত্র পড়ছি, ঝাড় ফুঁক করছি।[২]

কোন মুসলমান যদি অসুস্থ হয় তাহলে তার অসুখের কষ্টের দরুন তার গুনাহ এভাবে ঝরে পড়ে, যেমন বাতাসে গাছের (মরা) পাতা ঝরে পড়ে। এমনকি কোন মুসলমান কাঁটা বিদ্ধ হলে আল্লাহ তায়ালা তার এ কষ্টের দরুন তার গুনাহ মাফ করেন।[৩]

মৃত্যুর দুয়ারে উপনিত ব্যক্তিকে তালকীন দেয়া এবং তার নিকট সূরা ইয়াসীন পড়ার বিবরণ

যদি কারো প্রাণ বের হয়ে যাবার সময় হয়ে যায়, তাহলে তাকে শাহাদাতাইনের (দুই কালেমার) তালকীন দিবে।[৪] অর্থাৎ-

اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ -

তার নিকট পাঠ করবে, যেন সে তা শুনে নিজে পাঠ করতে পারে। মরনাপন্ন ব্যক্তির নিকট এ দোয়া পাঠ করার কথাও বর্ণিত হয়েছে ঃ

১. মুসলিম, মুয়াত্তা মালেক।

২. মুসলিম, তিরমিযী- আবু সাঈদ খুদরী (রা.)।

৩. বুখারী, মুসলিম- আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)।

৪. মুসলিম, সুনানে আরবা।

لَاۤ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ الْحَكِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ -

অর্থাৎ- আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই, যিনি বিজ্ঞানময় এবং সম্মানীত। পবিত্রতা আল্লাহর জন্য। যিনি মহান আরশের রব। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি সারা জাহানের রব।[১] যে ব্যক্তি মুমূর্ষ অবস্থায় পৌঁছে তার নিকট সূরা ইয়াসিন পড়া উচিত।[২]

মৃতের উপর চুমা দেয়া ও অশ্রুফেলে কাঁদা

যে ব্যক্তির কেউ মারা যাবে, সে উক্ত মৃত ব্যক্তিকে চুমা দিলে তা জায়েয।[৩]

যদি মৃত ব্যক্তিকে দেখে এমনিই কান্না এসে যায় এবং অশ্রু বের হয় তাহলে নিষেধ নাই।[৪]

মৃতের জন্য মাতম করা হারাম

কেউ মারা যাবার কারণে কোন পুরুষ বা মহিলা যদি গাল চাপড়ায় কিম্বা কাপড় ফেড়ে ফেলে বা কাফিরদের মত মৃতের জন্য উচ্চ কণ্ঠে চিৎকার করে তাহলে সে (প্রকৃতপক্ষে) মুসলমান নয়।[৫]

রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, আমি ঐ ব্যক্তির উপর অসন্তুষ্ট যে কারো মারা যাবার কারণে মাথার চুল ন্যাড়া করে এবং চিৎকার করে কাঁদে, কাপড় ছিড়ে।[৬]

যে মহিলা মৃত ব্যক্তির জন্য চিৎকার করে কাঁদে, সে যদি তার একাজ হতে তওবা না করে মারা যায়, তাহলে কিয়ামতের দিন তাকে এমন অবস্থায় উঠানো হবে যে তার গায়ে (গরম) তামা এবং খোস পাঁচড়া জীবানুযুক্ত জামা থাকবে।[৭]

যে মহিলা মৃতের জন্য চিৎকার করে কাঁদে বা যে তা শুনে তার উপর রাসূলুল্লাহ (সা.) লা'নত করেছেন।[৮]

---

১. ইবনে মাজা- আব্দুল্লাহ বিন জাফর (রা.)।

২. আবু দাউদ, নাসাঈ- মা'কাল বিন ইয়াসার (রা.)।

৩. বুখারী- আয়েশা (রা.)।

৪. বুখারী, মুসলিম- আব্বাস (রা.)।

৫. বুখারী,মুসলিম- আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)।

৬. বুখারী, মুসলিম- আবু দারদা (রাঃ)।

৭. মুসলিম।

৮. আবু দাউদ।

যে জানাযার সাথে বিলাপকারী মহিলা থাকবে, সে জানাযার সাথে যাওয়া নিষেধ।[১]

দুনিয়াতে যার জন্য চিৎকার করে বিলাপ করা হয়, কিয়ামতের দিন তার উপর বিলাপ করতে নিষেধ না করার কারণে শাস্তি দেয়া হবে।[২] যদি কোন ব্যক্তি মারা যায় অতপর কেউ তার গুণগান করে কেঁদে বলে হে পাহাড়, হে সরদার দলপতি বা এ ধরনের কথাবার্তা বলে তার গুণকীর্তন করে, তা হলে সে ব্যক্তিকে দু'জন ফেরেশতা ঘুষি মারে এবং বলে তুমি কি এ ধরনের ছিলে?[৩]

দুনিয়ায় কারো সন্তান মারা যাবার ফলে সে প্রতিদান হিসেবে জান্নাত পাবে তার বিবরণ

যার তিনটি সন্তান মারা যাবে এবং তার মা এদের মৃত্যুতে সবর করবে (অর্থাৎ কাঁদবে তবে আর্তনাদ-চিৎকার করে নয়) এবং এদের মৃত্যুকে পরকালের পাথেয় সম্বল মনে করবে তাহলে আল্লাহ তা'য়ালা আপন অনুগ্রহে এবং রহমতে তাদের পিতামাতাকে এর প্রতিদানে জান্নাত দিবেন। যার দুই সন্তান অথবা একটি মাত্র সন্তানও মারা যাবে, তাকেও আল্লাহ তা'আলা জান্নাত দান করাবেন। এমনকি যে বাচ্চা গর্ভপাত হবে (যদি তাতে প্রাণের স্পন্দন আসে) সেও তার পিতা-মাতাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে।[৪]

যে বাচ্চা গর্ভপাত হবে (যদি তাতে প্রাণের স্পন্দন এসে থাকে) তার পিতামাতাকে গুনাহের কারণে আল্লাহ তা'আলা দোজখের হুকুম করবেন তাহলে সে বাচ্চা আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করবে। অতপর আল্লাহ তায়ালার নির্দেশে সে তাদেরকে বেহেশতে নিয়ে যাবে।[৫]

মুসলমানদের যে সন্তানেরা ছোট বয়সে মারা যাবে তারা বেহেশতে এমনভাবে চরাফেরা করবে যেমন সমুদ্রে (সামুদ্রিক) প্রাণী চলাচলা করে। সে সব সন্তানেরা প্রত্যেকে কিয়ামতের দিন নিজের পিতামাতার সাথে এসে মিলবে এবং তার কাপড়ের এক কোনা ধরে রাখবে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের সাথে তার পিতামাতাকে বেহেশতে না নিয়ে যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত তার নিকট হতে পৃথক হবে না।[৬]

---

১. ইবনে মাজা।

২. বুখারী, মুসলিম।

৩. তিরমিযী- আবু মুসা আল-আশয়ারী (রা.)।

৪. আহমাদ, ইবনে মাজা।

৫. ইবনে মাজা।

৬. মুসলিম, আহমাদ- আবু হুরায়রা (রা.)।

মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয়ার বিবরণ

মৃতকে গোসল দেয়া জীবিতদের উপর ওয়াজিব।[১] যখন মৃতকে গোসল দেয়ার ইচ্ছা করবে তখন প্রথমে একটি তক্তা ধুয়ে নিবে। অতপর মৃতকে তার উপর শুইয়ে দিবে এবং তার কাপড় খুলে নিবে তবে একখানা কাপড় দিয়ে তার সতর ঢেকে দিবে। সে কাপড়খানা কমপক্ষে দেড় হাত লম্বা এবং দুই হাত প্রস্ত হবে এবং মৃতকে অজু করাবে (কানে ও নাকে পানি দেয়া ব্যতীত) এবং কুল বা বরই পাতা দিয়ে ফুটানো পানি দ্বারা গোসল করাবে। মাথা এবং দাড়ি খাতমী দ্বারা (এক প্রকার সাবান জাতীয় ঘাস) ধোয়াবে (যদি খাতমী না পাওয়া যায় তাহলে সাবান দ্বারা ধোয়াবে)।[২]

প্রথমে বাম পাশে শুয়াবে এবং পানি ঢালবে যেন তক্তার দিকের পাশ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে। অতপর ডানপাশে শুয়ায়ে গোসল করাবে এমনভাবে যাতে বাম পাশ পর্যন্ত পানি পৌঁছে।

মৃতের উপর পানি ঢালবে তিন বা পাঁচবার কিম্বা এর চেয়েও বেশী এবং শেষে শরীরের উপর কর্পূর লাগাবে।[৩]

যদি মহিলা মারা যায় হাতলে তার স্বামী তাকে গোসল দিবে[৪] এবং যদি পুরুষ মারা যায় তাহলে তার স্ত্রী তাকে গোসল দিবে।[৫]

শহীদকে গোসল দেয়া উচিত নয়।[৬]

মৃতকে কাফন দেয়ার বিবরণ

মৃত যদি পুরুষ হয় তাহলে তাকে একখানা ইজার (লুঙ্গী) একখানা চাদর এবং একখানা লেফাফা (বড় চাদর) এই তিন কাপড়ে কাফন দেয়ার বিধান রয়েছে। এর চেয়ে কম বা বেশী দেয়া উচিৎ নয়।[৭] যদি তা সম্ভব না হয় এবং নিরুপায় হলে একখানা কাপড়ই যথেষ্ট।[৮]

---

১. বুখারী, মুসলিম।

২. আবু দাউদ।

৩. বুখারী, মুসলিম- উম্মে আতিয়া (রা.)।

৪. আহমাদ, ইবনে মাজা।

৫. মুয়াত্তা মালেক।

৬. বুখারী- ইবনে আব্বাস (রা.)।

৭. বুখারী, মুসলিম- আয়েশা (রা.)।

৮. বুখারী।

মহিলাকে এক লুঙ্গি, জামা, ওড়না, একটি কাপড় দিয়ে উরু এবং নিম্নদেশ বাধতে হবে যা চাদরের নীচে দিয়ে থাকবে এবং চুল বাঁধার জন্য একটি কাপড়, এই পাঁচ কাপড় দিয়ে দাফন দেয়া উচিৎ।[১]

মৃতকে সাদা, পাক-পবিত্র ও পরিষ্কার কাপড়ে কাফন দিতে হবে।[২] কিন্তু খুব মূল্যবান কাপড়ের কাফন দিবে না।[৩]

যদি মুহরেম (হজ্জ বা উমরা করতে গিয়ে এহরাম অবস্থায় থাকা) মারা যায় তাহলে তাকে সে যে দুই কাপড় পরেছিল সেটাকেই কাফন হিসেবে দিবে। তাকে কোন খুশবু লাগাবে না এবং তার মাথা ঢাকবে না। কেননা কিয়ামতের দিন তাকে লাব্বাইকা বলা এবং এহরাম অবস্থায় উঠানো হবে।[৪]

জানাযা নিয়ে যাবার বিবরণ

জানাযা তাড়াতাড়ি নিয়ে যাবে। কেননা সে যদি নেককার হয় তাহলে তাড়াতাড়ি তার মনজিলে মাকসুদে পৌছে যাবে। আর যদি বদকার হয় তাহলে তাড়াতাড়ি তাকে ঘাড় থেকে নামায়ে তার হতে অব্যাহতি পাওয়া যাবে।[৫]

ভাল লোকের যানাজা উঠানো হলে তাদের বলে, তোমরা আমাকে তাড়াতাড়ি আমার গন্তব্যের দিকে নিয়ে চলো এবং মন্দলোকের জানাযা উঠানো হলে বলে, হায় মসিবত! আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছো? এদের কথা মানুষ ও জিন ব্যতীত সব কিছুই শুনে থাকে। যদি মানুষ তার আওয়াজ শুনতো তাহলে মারা যেতো।[৬]

মৃতকে দাফন করে ফিরে আসার সময় যান-বাহনে চড়ে আসা জায়েয।[৭] কিন্তু জানাযা নিয়ে যাবার সময় কোন কিছুতে সোয়ার হয়ে যাওয়া উচিত নয়। কেননা তার সাথে ফেরেশতাও যায় এবং তারা পায়ে হেঁটে যায়। মানুষ যদি সোয়ার হয়ে আর ফেরেশতা হেঁটে যায় তাহলে সেটা বেআদবী হয়।[৮] কিন্তু অসুবিধার কারণে কারো প্রয়োজন হয় তাহলে কোন কিছুতে সোয়ার হয়ে যেতে পারবে। সে জানাযার পিছনে তার বাহন নিয়ে চলবে। যে ব্যক্তি পায়ে হেঁটে

---

১. আহমাদ, আবু দাউদ।

২. আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজা।

৩. আবু দাউদ- আয়েশা (রা.)।

৪. বুখারী, মুসলিম- ইবনে আব্বাস (রা.)।

৫. বুখারী, মুসলিম- আবু হুরায়রা (রা.)।

৬. বুখারী।

৭. মুসলিম।

৮. আবু দাউদ- সাওবান (রা.)।

যাবে সে যানাজার আগে বা পরে কিম্বা ডানে অথবা বামে তার ইচ্ছামত চলতে পারবে।[১]

যে ব্যক্তি জানাযার সাথে যাবে এবং তিনবার জানাযা কাঁধে নিবে, সে জানাযার হক আদায় করলো।[২]

মহিলাদের জানাযার পিছনে পিছনে যাওয়া ঠিক নয়।[৩] জানাযার সাথে আগুন নিয়ে যাওয়া নিষেধ।[৪]

জানাযার নামায পড়ার বিবরণ

জানাযার নামায পড়ার জন্য খাটলী এমনভাবে রাখবে যেন মৃতের মাথা উত্তর দিকে এবং পা দক্ষিণ দিকে হয়।[৫] অতপর অযু করে কিবলামুখী হয়ে দাঁড়াবে এবং তিন সফ (কাতার) বাঁধবে।[৬] মৃত যদি পুরুষ হয় তাহলে ইমাম তার সামনে দাঁড়াবে। আর যদি মহিলা হয় তাহলে ইমাম তার মাঝামাঝি দাঁড়াবে।[৭] অতপর মনে মনে নিয়্যত করবে[৮] এবং দুই হাত মাথা পর্যন্ত কিম্বা কান পর্যন্ত উঠাবে[৯] এবং প্রথম তাকবীর অর্থাৎ আল্লাহু আকবার বলবে। প্রথম তাকবীরের পর যে দোয়ায়ে ইসতেফতা অর্থাৎ সুবহানাকা আল্লাহুম্মা سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ পড়া হয় তা সহীহ হাদীস হতে সাব্যস্ত নাই।[১০] প্রথম তাকবীরের পর ইমাম সূরা ফাতিহা এবং অন্য কোন সূরা উচ্চ কণ্ঠে পড়বে। তবে সূরা ফাতিহা ও অন্য সূরা মনে মনে পড়াও জায়েয।[১১] অতপর দুই হাত উঠাবে এবং দ্বিতীয় তাকবীর বলবে।[১২] অতপর এই দরুদ পড়বে ঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى

---

১. আবু দাউদ- মুগীরা ইবনে শো'বা (রা.)।
২. তিরমিযী- ইবনে উমর (রা.)।
৩.বুখারী, মুসলিম।
৪. বুখারী।
৫. প্রাগুক্ত।
৬. আবু দাউদ।
৭. তিরমিযী, ইবনে মাজা।
৮. বুখারী।
৯. বায়হাকী।
১০. শরহে হিদায়া।
১১. নাসাঈ।
১২. বায়হাকী।

اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ - اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ-

অর্থাৎ হে আল্লাহ! রহমত নাজিল করুন মুহাম্মদ (সা.) এর উপর এবং মুহাম্মদের বংশধরের উপর, যেমন আপনি রহমত নাজিল করেছেন ইব্রাহীমের (আ.) প্রতি এবং ইব্রাহীমের বংশধরের উপর। নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত এবং সম্মানিত। হে আল্লাহ! আপনি বরকত নাজিল করুন মুহাম্মদের উপর এবং মুহাম্মদের বংশধরের প্রতি, যেমন আপনি রহমত নাজিল করেছেন ইব্রাহীমের উপর এবং ইব্রাহীমের বংশধরের উপর। নিশ্চয় আপনি প্রশংসিত এবং সম্মানিত।[১]

অতপর দুইহাত উঠাবে এবং তৃতীয় তকবীর বলবে,[২] তারপরএই দোয়া পাঠ করবেঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَاُنْثَانَا - اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَاَحْيِهِ عَلَى الاِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الاِيْمَانِ - اَللّٰهُمَّ لَاتَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ -

অর্থাৎ- হে আল্লাহ! ক্ষমা করুন আমাদের জীবিতদের, আমাদের মৃতদের, আমাদের উপস্থিতদের, আমাদের অনুপস্থিতদের, আমাদের ছোটদের, আমাদের বড়দের, আমাদের পুরুষদের এবং আমাদের মহিলাদের। হে প্রভু! আপনি আমাদের মাঝে যাকে জীবিত রাখবেন তাকে ইসলামের উপর জীবিত রাখুন এবং আমাদের মাঝে যাকে মৃত্যুদান করবেন তাকে ঈমানের উপর মরণ দিবেন। হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে মাহরুম করবেন না এর সোয়াব হতে (অর্থাৎ এর কারণে যে মসিবত আমরা পেয়েছি এর ফলে যে সোয়াব পাওয়া যাবে তা থেকে আমাদের বঞ্চিত করবেন না।) এবং তার পরে আমাদেকে ফিতনায় ফেলবেন না।[৩]

---

১. বুখারী, মুসলিম।

২. বায়হাকী।

৩. মুসলিম, সুনানে আরবা।

জ্ঞাতব্য ঃ মৃত পুরুষ হোক বা মহিলা, ছেলে হোক কিংবা মেয়ে সবার জানাযার জন্যই এ দোয়া যথেষ্ট।

অতপর দুইহাত উত্তোলন করবে এবং চতুর্থ তাকবীর বলবে।[১] তাকবীর দিয়ে ডানদিকে ঘাড় ঘুরিয়ে বলবে ঃ

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰه

অতঃপর বাম দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে বলবে ঃ

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰه [২]

জ্ঞাতব্য ঃ জানাযার নামায পাঁচ তাকবীরে পড়াও সুন্নত।[৩] যে ব্যক্তি পাঁচ তাকবীরে পড়তে চায় সে চতুর্থ তাকবীর বলার পর মৃত যদি পুরুষ হয় তাহলে এ দোয়া পড়বে ঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَاكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ وَابْدِلْهُ دَارًا خَيْرًامِنْ دَارِهِ وَاَهْلاً خَيْرًا مِنْ اَهْلِه وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَادْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَقِهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ -

অর্থাৎ- হে আল্লাহ! একে ক্ষমা করে দিন এবং এর প্রতি রহম করুন এবং তাকে কষ্ট হতে মুক্তিদান করুন এবং তাকে (তার দুর্বলতার জন্য) মাফ করে দিন। তার উত্তম মেহমানদারী করুন (অর্থাৎ বেহেশতে) এবং তার কবরকে প্রশস্ত করুন এবং তাকে পাক করুন (ধৌত করুন) পানি, বরফ, শিশিরের পানি দিয়ে এবং তাকে পরিচ্ছন্ন করুন গুনাহ্ হতে, যেমন সাদা কাপড় পরিচ্ছন্ন করা হয় ময়লা হতে। তার (এ দুনিয়ার) ঘর হতে উত্তম ঘর দান করুন। তার পরিবার হতে উত্তম পরিবার বদলিয়ে দিন (দান করুন) এবং তার স্ত্রী হতে উত্তম স্ত্রী দান করুন। তাকে জান্নাতে প্রবেশ করান এবং তাকে কবরের আযাব এবং জাহান্নামের শাস্তি হতে বাঁচান।[৪]

---

১. বায়হাকী।

২. নাসাঈ।

৩. মুসলিম।

৪. মুসলিম- আউফ বিন মালেক (রা.)।

জ্ঞাতব্য ঃ এ হাদীসের বর্ণনাকারী আউফ (রা.) বলেন যে, যখন আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) হতে এ দোয়া শুনলাম, তখন আমার মনে খুব ঈর্ষা হচ্ছিল এবং আমি মনে মনে একথাই বললাম যে, যদি আমি এ মৃত ব্যক্তি হতাম (যার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা.) দোয়া করছিলেন) তাহলে রাসূল (সা.) আমার জানাযায় এ দোয়া পড়তেন তাহলে কতইনা ভাল হতো। এতে এটাই বুঝা যায় যে, জানাযার নামাযে জোরে দোয়া পড়া জায়েয।

মৃত যদি কোন ছোট ছেলে হয় তাহলে চতুর্থ তাকবীরের পর এ দোয়া পড়বেঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرْطًا وَسَلَفًا وَاَجْرًا ـ

অর্থ- হে আল্লাহ! তাকে আমাদের জন্য অগ্রগামী এবং অগ্রবর্তী (যাকে আমরা অনুসরণ করতে পারবো) এবং সোয়াবের কারণ করে দিন।

যদি মৃত মহিলা কিম্বা মেয়ে হয় তাহলে তৃতীয় তাকবীরের পর যে اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا। দোয়া পড়েছিল সে দোয়াই চতুর্থ তাকবীরের পর পড়বে। অতঃপর পঞ্চম তাকবীর বলে ডানদিকে ঘাড় ঘুরিয়ে ঃ

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰه বলে সালাম ফিরবে।

জ্ঞাতব্য ঃ আস্‌সালামু আলাইকুম বাক্যটি ইমাম উচ্চস্বরে বলবেন এবং মুক্তাদীরা নিম্নস্বরে বলবে।

মৃত ব্যক্তির (যদি সে মুশরিক না হয়ে থাকে) জানাযায় যদি এমন চল্লিশ জন লোক অংশগ্রহণ করেন যারা কোন ধরনের শিরক করেননি, তাহলে আল্লাহ তায়ালা এর ব্যাপারে তাদের শাফায়ত কবুল করেন।[১]

যে ব্যক্তিকে জিনার বিচারে সঙ্গেসার (পাথর ছুঁড়ে হত্যা) করা হবে তার নামাযে জানাযা পড়তে হবে।[২]

যে ব্যক্তি আত্মহত্যা করবে তার নামাযে জানাযা (পেশ ইমাম) পড়বে না।*[৩]

যে মহিলা নেফাস (সন্তান প্রসরের পর রক্তক্ষরণ এর সর্বোচ্চ সময় ৪০ দিন) এর অবস্থায় মারা যাবে তার নামাযে জানাযা পড়তে হবে।[৪]

---

১. মুসলিম।

২. মুসলিম- বুরায়দা (রা.)।

৩. বুখারী, মুসলিম- জাবের বিন সামুরা (রা.)।

৪. মুসলিম- আবু সালামা (রা.)।

* আত্মহত্যাকারীর জানাযা পেশ ইমাম পড়াবেন না, যেন লোকজন এ ব্যাপারে সাবধান হয়। সাধারণ লোকজন তার জানাযা পড়বে। কেননা রাসূল (সা.) এ ধরনের লোকের জানাযা নিজে না পড়ে সাহাবীদের পড়তে বলেছেন। (নায়লুল আওতার)

মসজিদে যানাজার নামায পড়া জায়েয, সেথায় যদি মহিলারা পুরুষদের কাতারের পিছনে জানাযায় দাঁড়ায় এবং নামায পড়ে তাহলে তা জায়েয।[১]

যে ব্যক্তি সোয়াবের নিয়্যতে জানাযার সাথে যাবে এবং জানাযার নামায পড়ে চলে আসবে, সে ওহুদ পাহাড়ের সামন সোয়াব পাবে।[২]

কারো জানাযার নামায তার কবরের উপর পড়াও জায়েয।[৩]

জানাযার নামাযে যদি কোন ব্যক্তি ভুল করে চার তাকবীরের স্থলে তিন তাকবীর বলে সালাম ফিরে দেয় এবং তাকে এ ব্যাপারে বললে (বা তার খেয়াল হলে) সে ফিরে এক তাকবীর বলে নিবে অতপর সালাম ফিরবে।[৪]

শহীদের নামাযে জানাযা পড়বে না।[৫]

যে ব্যক্তি কারো জানাযার নামায পড়বে, সে যেন তার জন্য নিষ্ঠার সাথে দোয়া করে। কোন মুসলমান ব্যক্তিকে জানাযা নামায না পড়ে দাফন করা নিষেধ।[৬]

মৃতকে দাফন করার বিবরণ

কবরকে গভীর করে খুড়তে হবে এবং সমান করে ভালভাবে পরিষ্কার করে সাফ করতে হবে।[৭] কবরের মাঝে লাহাদ বানাবে[৮] এবং মাইয়্যেতকে দু'পায়ের দিক হতে কবরে নামাবে।[৯]

মৃতকে কবরে নামালে এ দোয়া পাঠ করবে ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

অর্থাৎ- আল্লাহ তায়ালার নামে এবং রাসূলুল্লাহ (সা.) এর শরিয়তের উপর (লাশ দাফন করছি)।[১০]

---

১. বুখারী, মুসলিম।

২. বুখারী, মুসলিম।

৩. প্রাগুক্ত।

৪. বুখারী।

৫. আবু দাউদ- আবু হুরায়রা (রা.)।

৬. ইবনে মাজা- যাবের (রা.)।

৭. আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযী।

৮. মুসলিম।

৯. আবু দাউদ- ই॰ ,॰ (রা.)।

১০. আহমাদ, আবু দ ৈদ, নাসাঈ- ইবনে উমর (রা.)।

মাইয়্যেতকে কবরে রেখে তার উপর কাঁচা ইট দিয়ে (বা বাঁশ বা অন্য কিছু দিয়ে) ঢেকে দিবে। অতপর আস্তে আস্তে অল্প অল্প করে মাটি দিয়ে কবর পূর্ণ করবে[১] এবং লোকেরা তিন খাবল (মুষ্ঠি) করে মাটি দিবে[২] এবং কবরকে মাটি হতে আধহাত মত উঁচু করবে[৩] এবং কবরকে উটের পিঠের কুঁজের মত বানাবে[৪] এবং কবরের উপর (সম্পূর্ণ হবার পর) পানির ছিটা দিবে।[৫] অতপর সবলোকজন মাইয়্যেতের মাগফেরাত ও সাবেত কদম থাকার জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করবে।[৬]

যখন মুমিন লোকের জান কবজ করা হয় তখন খুব সুন্দর উজ্জ্বল চেহারার ফেরেশতা যার মুখ সূর্য্যের মত উজ্জ্বল- বেহেশতের খশবু নিয়ে আসমান হতে নেমে আসে এবং তার সামনে এস সম্মানের সাথে বসে পড়ে এবং তার রূহ বের হবার অপেক্ষায় থাকে। অতপর মালাকুল মওত (জান কবজকারী ফেরেশতা) আসেন এবং তার মাথার দিকে বসেন। অতপর বলেন, হে পবিত্র আত্মা! তোমার প্রভূর পুরষ্কার এবং সন্তুষ্টির জন্য বের হও। অতপর পানির মশক হতে যেমন পানি ফোটা (পানি) সহজেই গড়িয়ে পড়ে সেভাবেই তার জীবন বের হয়ে আসবে। অতপর সে রূহকে মালাকুল মাওত নিয়ে নেন। অতপর অপেক্ষমান ফেরেশতা খুব মহব্বতের সাথে মুহুর্তের মাঝে মালাকুল মাওতের নিকট হতে নিয়ে নেয় এবং তাকে বেহেশতের কাফন এবং সুগন্ধীর মাঝে রেখে দেয়। সে আত্মা হতে খুব উত্তম সুগন্ধী বের হতে থাকে এবং গোটা দুনিয়ায় তা ছড়িয়ে পড়ে। অতপর সে রূহকে ফেরেশতা আসমানের দিকে নিয়ে যায় এবং আসমান ও যমিনের মাঝে যেসব ফেরেশতার দলের পাশ দিয়ে অতিক্রম করে যায় তারা বলে এই পবিত্র আত্মা কার? নিয়ে যাওয়া ফেরেশতারা তার খুব প্রশংসা এবং গুণাবলী বর্ণনা করে এবং যে সব উত্তম নামে সে দুনিয়াতে প্রসিদ্ধ ছিল সে সব নাম নিয়ে বলবে, এ হচ্ছে উমুকের সন্তান (অর্থাৎ উমুকের আত্মা) এভাবে প্রশ্নোত্তর করতে করতে প্রথম আসমান পর্যন্ত তাকে নিয়ে পৌঁছবে এবং আসমানের দরজা খোলা হবে। প্রথম আসমানের আল্লাহর নিকটতম ফেরশতারা

১. মুসলিম।
২. দারকুতনী।
৩. বায়হাকী।
৪. বুখারী।
৫. ইবনে মাজা।
৬. আবু দাউদ।

তার সাথে দ্বিতীয় আসমান পর্যন্ত নিয়ে গিয়ে পৌঁছাবে। এভাবে সাত আসমান পর্যন্ত তাকে নিয়ে পৌঁছবে। অতপর আল্লাহ তায়ালা বলেন, আমার এ বান্দার আমলনামা ইল্লিনে (সর্বোচ্চ স্থানে) লিখে দাও এবং যমিনে যেখানে তাকে দাফন করা হয়েছে সেখানে তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাও। আর তার শরীরে ফিরিয়ে দাও। অতঃপর যখন মানুষ তাকে কবরে মাটি দিয়ে দাফন শেষ করে, তখন ফেরেশতা তার শরীরে আত্মা ফিরিয়ে দেয়। অতপর দুই ফেরেশতা (মুনকীর ও নাকীর) তাকে কবরের মাঝে উঠিয়ে বসায় এবং বলে, তোমার রব কে ? সে বলবে আমার রব আল্লাহ্। অতপর প্রশ্ন করবে তোমার দ্বীন (জীবন ব্যবস্থা) কি? সে উত্তরে বলবে, আমার দ্বীন ইসলাম। অতঃপর তাকে প্রশ্ন করবে, এই যে ব্যক্তিটি প্রেরিত হয়েছিল তোমাদের মাঝে (অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ (সা.) তিনি কে'? সে উত্তর করবে, তিনি হলেন আল্লাহর রাসূল। তখন তাকে আবার প্রশ্ন করবে, তুমি কিভাবে জানলে যে, সে আল্লাহর রাসূল? সে বলবে আমি আল্লাহর কিতাব পড়েছি, তার উপর ঈমান এনেছি এবং তাকে সত্য বলে মেনেছি, এর মাধ্যমে তার রাসূল হওয়া সম্পর্কে জেনেছি। অতপর আল্লাহর পক্ষ থেকে আসমানের দিক হতে আওয়াজ আসবে আমার এ বান্দা সত্যবাদী। তার জন্য জান্নাতের বিছানা বিছিয়ে দাও এবং তাকে জান্নাতের পোষক পরিয়ে দাও এবং তার কবরের মাঝে বেহেশতের দিকের একটি জানালা খুলে দাও। অতপর তার নিকট বেহেশতের বাতাস এবং সুগন্ধী আসতে থাকবে এবং যতদূর পর্যন্ত তার দৃষ্টি যায় ততদূর পর্যন্ত তার কবর প্রশস্ত হয়ে যাবে।

যখন কাফেরের জীবন বের হতে লাগে তখন কালো রং এর ফেরেশতা নোংরা কাপড় সাথে নিয়ে আসমান হতে নেমে আসে এবং তার সামনে এসে বসে পড়ে। অতপর মালাকুল মওত আসেন এবং তার সামনে বসেন এবং বলেন হে খবিশ আত্মা! আল্লাহ্ তায়ালার আযাবের দিকে বের হয়ে এসো। এরপর তার আত্মা শরীরের মাঝে লুকিয়ে বেড়ায় এবং আযাবের আলামত দেখে অসন্তুষ্ট হয়। অতপর মালাকুল মওত তার রূহকে অত্যন্ত কঠিন ভাবে পাকড়াও করে বের করে নিয়ে আসেন। অতপর অপেক্ষারত ফেরেশতারা চোখের পলকে তা মালাকুল মাওতের হাত হতে নিয়ে নেয় এবং সেই নোংরা কাপড়ের জড়িয়ে রেখে দেয়। এরপর তা থেকে মরা লাশের মত দুর্গন্ধ আসতে থাকে এবং গোটা পৃথিবীতে তার দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে। অতপর ফেরেস্তারা তার আত্মাকে আসমানের দিকে

নিয়ে যেতে থাকে। জমিন ও আসমানের মাঝে যে সব ফেরেশতার দলের নিকট দিয়ে যায় তারা বলে, এ অপবিত্র আত্মা কার? ফেরেশতারা জবাবে দুনিয়াতে সে যে সব খারাপ নামে কুখ্যাত ছিল তা উল্লেখ করে বলে, ঐ উমুকের সন্তান উমুক (অর্থাৎ উমুকের আত্মা) এভাবে প্রথম আসমান পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছবে এবং আসমানের দরজা খোলার জন্য বলবে। কিন্তু কেউ দরজা খুলবে না। অতপর আল্লাহ্ তায়ালা বলবেন, এর আমলনামা সিজ্জীনে লিখো (সিজ্জীন সাত জমিনের নীচে একটি স্থানের নাম) অতপর ফেরেশতারা তার রূহকে আসমান হতে জমিনের দকি ছুড়ে মারবে। অতপর যখন মানুষ তার কবরে মাটি দিয়ে শেষ করে তখন তার শরীরে রূহ দেয়া হয় এবং তার নিকট দুইজন ফেরেশতা (মুনকির ও নাকীর) আসে এবং তাকে কবরের মাঝে উঠিয়ে বসায়। অতপর তাকে বলে, তোমার রব কে? সে বলবে, হায় হায়? আমি জানি না। অতঃপর তাকে প্রশ্ন করবে তোমাদের মাঝে যে ব্যক্তিকে প্রেরণ করা হয়েছিল সে কে? সে বলবে হায় হায় আমি জানি না। অতপর আসমানের দিক হতে আওয়াজ আসবে যে, ঐ ব্যক্তি মিথ্যাবাদী, এর জন্য আগুনের বিছানা বিছিয়ে দাও এবং দোখজের দিক হতে এর কবরের মাঝে একটি জানালা খুলে দাও। অতঃপর দোজখের তাপ সে পেতে থাকবে এবং তার নিকট গরম বাতাস আসতে থাকবে এবং তার কবর এত সংকীর্ণ হয়ে যাবে যে, তার এক দিকের বুকের হাড় অন্য দিকের হাড়ের মাধ্যে ঢুকে (চুর্ণ হয়ে) যাবে।[১]

যে ব্যক্তি মারা যাবে তার পরিবার পরিজনের জন্য তার আত্মীয় বা প্রতিবেশীরা খাবার তৈরী করে (সে দিন) তার বাড়ীতে পাঠাবে।[২]

কবরের মাথার দিক চিহ্নিত করার জন্য পাথর রাখা জায়েয[৩] এবং কবরের উপর কঙ্কর দেয়া জায়েয।[৪] কবরে চুনকাম করা এবং তার উপর ইমারত (পাকা বিল্ডিং বা বালাখানা) তৈরী করা এবং কবরের উপর বসা নিষেধ।[৫]

কবরের উপর বসার শাস্তি কিয়ামতের দিন এমন হবে যে, কাউকে যদি

---

১. আহমাদ, মিশকাত।

২. আহমাদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজা- আবদুল্লাহ বিন জাফর (রা.)।

৩. আবু দাউদ, মিশকাত।

৪. আবু দাউদ- কাসেম ইবনে মুহাম্মদ (রা.)।

৫. মুসলিম- জাবের (রা.)।

আগুনের উপর বসিয়ে দেয়া হয় এবং আগুন তার কাপড় জ্বালিয়ে চামড়া পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে তবুও তা কবরের উপর বসার চেয়ে উত্তম কিন্তু কবরের উপর বসা তার জন্য কঠিন।[১]

কবরের উপর কিছু লিখা এবং কবর পা দিয়ে মাড়ান নিষেধ।[২] কবরের সাথে ঠেস দিয়ে বসবে না এজন্য যে, তাতে কবরে শায়িত ব্যক্তি কষ্ট পায়।[৩]

কবরের দিকে নামায পড়া জায়েয নয়।[৪] যে শহরে বা গ্রামে কোন ব্যক্তি মারা যাবে তাকে সেখানেই দাফন করা উচিৎ।[৫]

জীবিত ব্যক্তির হাড় ভাঙ্গলে যে পরিমাণ গুনাহ, মৃত ব্যক্তির হাড় ভাঙ্গলেও সেরূপ গুনাহ।[৬]

যে ব্যক্তি মারা গেছে তাকে মন্দ বলা নিষেধ।[৭]

কবর যিয়ারতের বিবরণ

পরুষদের জন্য কবর জিয়ারত করা সুন্নাত। কেননা এতে আখেরাতের কথা স্মরণ আসে এবং দুনিয়ার প্রতি আকর্ষণ কমে যায়।[৮]

যে ব্যক্তি কবর যিয়ারতে যাবে সে নিম্নোক্ত দোয়া গুলির মধ্যে যে কোন দোয়া পড়বে।

প্রথম দোয়া ঃ

اَلسَّلَامُ عَلٰى اَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَيَرْحَمُ اللّٰهُ الْمُسْتَقْدِمِيْنَ وَالْمُسْتَأْخِرِيْنَ وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ -

---

১. মুসলিম- আবু হুরায়রা (রা.)।

২. তিরমিযী- জাবের (রা.)।

৩. আহমাদ, মিশকাত।

৪. মুসলিম।

৫. তিরমিযী।

৬. মুয়াত্তা, আবু দাউদ, ইবনে মাজা।

৭. মিশকাত।

৮. মুসলিম, তিরমিযী।

অর্থাৎ- শান্তি বর্ষিত হোক ঘরওয়ালাদের উপর যারা এর মাঝে মুমিন এবং মুসলমান রয়েছে এবং আল্লাহ তা'আলা অনুগ্রহ করুন যারা আমাদের মধ্যে হতে পুর্ব এসেছে এবং পিছনে রয়েছে (পরে আসবে) এবং নিশ্চয় আমরা আল্লাহ চান তো আপনাদের সাথে মিলিত হবো।[১]

দ্বিতীয় দোয়া ঃ

اَلسَّلَامُ عَلٰى اَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ اِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ لَاحِقُوْنَ ـ نَسْأَلُ اللّٰهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ ـ

অর্থাৎ- শান্তি বর্ষিত হোক ঘরওয়ালাদের উপর, যারা এর মাঝে মুমিন এবং মুসলবান রয়েছে। নিশ্চয় আমরা আল্লাহ চাহেতো আপনাদের সাথে এসে মিলিত হবো। আমরা আল্লাহর নিকট আমাদের এবং আপনাদের জন্য নিরাপত্তা ও কল্যাণ প্রার্থনা করছি।[২]

তৃতীয় দোয়া ঃ

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا اَهْلَ الْقُبُوْرِ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ ، اَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالْاَثَرِ ـ

অর্থাৎ- আপনাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক হে কবরবাসী! আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের এবং আপনাদের ক্ষমা করুন। আপনারা আমাদের পূর্ববর্তী (আগে গিয়েছেন) এবং আমরা আপনাদের পিছনে আসছি।[৩]

---

১. মুসলিম- আয়েশা (রা.)।

২. মুসলিম- সুলায়মান ইবনে বুরায়দা (রা.)।

৩. তিরমিযী- ইবনে আব্বাস (রা.)।

ফিকহ্ মুহাম্মদী

২য় খণ্ড

কোরবানীর বিবরণ

কোরবানী করা সুন্নাত। যে ব্যক্তি ঈদের নামাজের পূর্বে কোরবানী করে সে কোরবানীর সওয়াব পায় না, সে শুধু নিজের মনোবাসনার জন্য এ জন্তুটি জবেহ করে থাকে এবং যে ব্যক্তি ঈদের নামাজ পরে কোরবানী করে সে তার সওয়াব পায়।[১] যে ব্যক্তি ঈদের নামাজের পূর্বে কোরবানী করেছে সে এর পরিবর্তে আরেকটি কোরবানী করবে।[২] কেননা ঈদের দিন মানুষের যত আমল আছে আল্লাহর নিকট কোরবানীর সওয়াবের মত আর কোন আমল নাই এবং কোরবানীর রক্ত মাটিতে পড়ার পূর্বেই তা আল্লাহর নিকট কবুল হয়ে যায়।[৩] কুরবানীর জন্য ছাগ ছাগী এবং গরু জবেহ করা জায়েয।[৪]

তৃতীয় বছর বয়সে পদার্পনকারী গরু, ষষ্ঠ বছরে পদার্পনকারী উটের কোরবানী চলবে। ছাগ-ছাগী, ভেড়া ও দুম্বা এক বছরের কম বয়সী হলে কুরবানী জায়েয হবে না। কোরবানী নিজ হাতে করবে এবং জবেহ করার সময় বিসমিল্লাহে আল্লাহু আকবার বলবে।[৫] কানা, রোগা, লেংড়া, খুবই দুর্বল, কান কাটা, কান ফাটা, বা কোন ক্রটি যুক্ত প্রাণীর কোরবানী জায়েয নয়।[৬] কিন্তু এসব জন্তুর মধ্যে যার অর্ধেক বা বেশী কান কাটা এবং অন্য কোন পশুও পাওয়া যাচ্ছে না, তাহলে এসব পশুর কোনবানী করা জায়েয।[৭] খাসী কোরবানী করা দোষণীয় নয় বরং খাসী কোরবানী সুন্নাত।[৮] কেরবানী করার উদ্দেশ্যে যে জন্তু গ্রহণ করবে তার চোখ কান ইত্যাদি ভালভাবে দেখে নিবে।[৯] কসাইকে তার কাজের মজুরী হিসেবে কোরবানীর গোশত বা চামড়া ইত্যাদির কোন কিছু দেয়া জায়েয নয়। যথা সম্ভব গোশত ও চামড়া গরীব-দুঃখীদেরকে দিবে।[১০]

১। বুখারী, মুসলিম- বারা (রা.)।

২। বুখারী, মুসলিম- জুনদুব ইবনে সুফিয়ান (রা.)।

৩। তিরমিযী, ইবনে মাজা- আয়েশা (রা.)।

৪। মুসলিম- জাবের (রা.)।

৫। বুখারী, মুসলিম- আনাস (রা.)

৬। আহমাদ, সুনানে আরবা।

৭। তিরমিযী- আবু কাতাদা (রা.)।

৮। আহমাদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজা, দারেমী- জাবের (রা.)।

৯। আহমাদ, দারেমী, সুনানে আরবা- আলী (রা.)।

১০। বুখারী, মুসলিম- আলী (রা.)।

যে ব্যক্তি কোন প্রাণী জবেহ করবে, সে ছুরিকে ভালভাবে ধার দিয়ে নিবে, যাতে প্রাণীর বেশী কষ্ট না হয়।[১] ঈদগাহে কোরবানী করা সুন্নাত।[১] একটি পশুর সামনে অন্য পশু কোরবানী করবে না এবং জবেহ করার সময় তাড়াতাড়ি করবে।[৩] প্রতি বছর কোরবানী করা সুন্নাত[৪] এবং তিনদিন পর্যন্ত কোরবানী করা জায়েয।[৫] নিজের ও পরিবারবর্গের পক্ষ হতে একটি ছাগল কোরবানীই যথেষ্ট। এর গোশত নিজেও খাবে এবং গরীব মিসকীনকেও দিবে।[৬] যদি সাত জন মিলে একটি (গরু বা উট) কোরবানী করে তাহলে সেটাই যথেষ্ট।[৭] যে ব্যক্তি কোরবানী করবে, সে কোরবানীর ঈদের চাঁদ দেখলেই চুল, নখ ইত্যাদি কাটা বন্ধ রাখবে। ঈদের নামাজের পর চুল, নখ কাটবে তাহলে এসব কাজে কোরবানীর মত নেকী পাবে।[৮]

যাকাত না দেয়ার শাস্তি

যে ব্যক্তির নিকট স্বর্ণ বা রৌপ্য রয়েছে এবং সে তার যাকাত না দেয়, তাহলে কিয়ামতের দিন তা গরম করে তার মাথায়, পিঠে এবং পার্শ্বদেশে দাগ (ছ্যাকা) দেয়া হবে। সে দিন (কিয়ামতের দিন) ৫০ হাজার বছরের সমান একদিন হবে। এরপর আল্লাহর নিকট বেহেশতের উপযুক্ত হলে বেহেশতে যাবে। আর যদি জাহান্নামের উপযোগী হয় তাহলে জাহান্নামে স্থান দেয়া হবে।[৯]

যে ব্যক্তি নিজ মালের যাকাত আদায় করবে না, কিয়ামতের দিন তার মালকে বিষধর সাপে রূপান্তরিত করা হবে যার চোখে কাল দুটি দাগ থাকবে। উক্ত সাপকে তার গলায় জড়িয়ে দেয়া হবে। সে সাপ তখন তার ঠোটের কোন দুটি কামড়ে ধরে বলতে থাকবে আমি তোমার মাল, তোমার গচ্ছিত সম্পদ।[১০]

---

১. মুসলিম- শাদ্দাদ ইবনে আউস (রা.)।

২. বুখারী- ইবনে উমর (রা)।

৩. ইবনে মাজা- ইবনে উমর (রা.)।

৪. তিরমিযী- ইবনে উমর (রা.)।

৫. মুয়াত্তা- না'ফে (রা.)।

৬. মুয়াত্তা- আম্মার ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.)।

৭. মুসলিম, মুয়াত্তা- জাবের (রা)।

৮. মুসলিম।

৯. মুসলিম- আবু হুরায়রা (রা.)

১০ বুখারী- আবু হুরায়রা (রা.)।

যে ব্যক্তির উট, গরু বা ছাগল যাকাতের নেসাব পরিমাণ হবে এবং সে তার জাকাত দিবে না, কিয়ামতের দিন এগুলিকে মোটাতাজা করে তার নিকটে নিয়ে আসা হবে। সে পশুগুলি তাকে পদদলিত করবে এবং শিং দিয়ে গুতা দিবে। একবার মারার পর আবার দ্বিতীয় বার নিয়ে আসা হবে। এভাবে তার উপর ক্রমাগতভাবে শাস্তি চলতে থাকবে, আল্লাহ্ তায়ালা তার (অন্য) বান্দাদের মাঝে বিচার ফায়সালা শেষ করা পর্যন্ত।[১]

উটের যাকাতের বিবরণ

পাঁচটি উটের কম থাকলে তাতে যাকাত ওয়াজিব হয় না। যাকাত দিতে হবে এভাবে ঃ

পাঁচটি উট থাকলে একটি ছাগল যাকাত দিতে হবে।

৫ হতে ২৪টি পর্যন্ত প্রতি ৫টি উটে একটি করে ছাগল দিতে হবে।

২৫টি হতে ৩৫টি পর্যন্ত পূর্ণ এক বছর বয়স্কা একটি উটনী যাকাত দিতে হবে।

৩৬টি হতে ৪৫ টি পর্যন্ত পূর্ণ দু'বছর বয়স্কা ১টি উটনী যাকাত দিতে হবে।

৪৬টি হতে ৬০টি পর্যন্ত পূর্ণ তিন বছর বয়স্কা ১টি উটনী দিতে হবে।

৬১টি হতে ৭৫টি পর্যন্ত পূর্ণ চার বছর বয়স্কা ১টি উটনী দিতে হবে।

৭৬টি হতে ৯০টি পর্যন্ত পূর্ণ দু'বছর বয়স্কা দুটি উটনী দিতে হবে।

৯১টি হতে ১২০টি পর্যন্ত পূর্ণ তিন বছর বয়স্কা দুটি উটনী দিতে হবে।

তদূর্ধে হলে প্রতি ৪০টিতে পূর্ণ তিন বছর বয়স্কা একটি করে উটনী যাকাত দিতে হবে।[২]

অর্থাৎ- উটের যাকাত ২৪ সংখ্যা পর্যন্ত তিন বছর হবে ছাগল দিয়ে এবং ২৪ এর বেশী হলে তখন বের করতে হবে উট দিয়ে।

ছাগলের যাকাতের বিবরণ

ছাগল ৪০টির কম হলে তাতে যাকাত ফরজ হয় না। ছাগল ৪০ টি হতে ১২০টি পর্যন্ত সংখ্যার জন্য একটি ছাগল যাকাত দিতে হবে। ১২০ হতে ২০০ পর্যন্ত ছাগলে ২টি ছাগল যাকাত দিতে হবে। ২০১টি হতে ৩০০ পর্যন্ত ৩টি ছাগল যাকাত দিতে হবে। তদূর্ধে প্রতি ১০০ টিতে একটি করে ছাগল বৃদ্ধি করবে এবং এভাবে যাকাত দিতে হবে।[৩]

---

১. বুখারী, মুসলিম।

২. বুখারী. মুসলিম- আবু হুরায়রা (রা.)।

৩. বুখারী।

গরুর যাকাতের বিবরণ

গরু-বলদ ৩০টির কম হলে যাকাত ফরজ হবে না। ৩০ হতে ৩৯ টি পর্যন্ত গরুর জন্য এক বছরের একটি বকনা বা এঁড়ে বাছুর যাকাত হিসেবে বের করবে। ৪০টি গরু হলে দু'বছরের একটি বাছুর যাকাত হিসেবে বের করবে।[১]

যে ব্যক্তির নিকট গরু, ছাগল, উট উক্ত নেসাবের চেয়ে কম হবে তার উপর যাকাত ফরজ হবে না। যদি কেউ এর যাকাত দেয়, তা হলে সওয়াবের অধিকারী হবে।[২]

সোনা চান্দির যাকাতের বিবরণ

চান্দি দুইশত দিরহাম পরিমাণ না হলে যাকাত ফরজ হয় না।[৩]

দুইশত দিরহাম পরিমাণ চান্দি এক বছর পর্যন্ত কারো নিকট থাকে তাহলে পাঁচ দিরহাম পরিমাণ যাকাত দেয়া ফরজ।[৪]

বর্তমান ২০০ দিরহামে ৫২ তোলা (ভরি) ওজন হয়। তাই কারো নিকট ৫২ তোলা রূপা এক বছর মওজুত থাকলে তাকে শতকরা ২.৫ হিসাবে যাকাত দিতে হবে।

যদি কারও নিকট ২০ দিনার স্বর্ণ ১ বছর পর্যন্ত মওজুত থাকে তা হলে তার উপর অর্ধদিনার যাকাত দেয়া ফরজ।[৫] ২০ দিনারের ওজন ৭.৫ তোলা বা ভরি। ৭.৫ ভরি স্বর্ণের জাকাত বের হবে সোয়া দুই মাসা স্বর্ণ। বর্তমানে গ্রামের ওজনে ২০ দিনার স্বর্ণের ওজন হচ্ছে ৮৫ গ্রাম। মোট কথা সোনা বা চান্দি এক বছর পর্যন্ত নিসাব পরিমাণ (২০০ দিরহাম বা ২০ দিনার) কারো নিকট জমা থাকলে ৪০ ভাগের ১ ভাগ যাকাত দেয়ার বিধান। যদি নিসাবের চেয়ে কম থাকে তাহলে যাকাত ফারজ হবে না।

গহনা বা অলংকারের যাকাতের বিবরণ

অলংকারের যাকাত দেয়া সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণের মাঝে মত পার্থক্য রয়েছে। এ অধ্যায়ে যতগুলি হাদীস এসেছে তা কারো নিকট সহীহ্ এবং করো নিকট সহীহ্ নয়। তবে উত্তম হচ্ছে যাকাত আদায় করা।

---

১. আহমাদ, সুনানে আরবা- মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা.)।

২. বুখারী, মুসলিম- আবু সাঈদ (রা.)।

৩. আবু দাউদ- আলী (রা.)।

৪. বুখারী- আবু বকর (রা.)।

৫. বুখারী।

ওশর এর বিবরণ

যে ফসল বৃষ্টির বা ঝর্ণার পানিতে উৎপন্ন হয় তার দশ ভাগের এক ভাগ যাকাত দিতে হবে। তদ্রুপ যে জমি লবনাক্ত ও তাতে পানি সিঞ্চন না করলেও তার ফসল পেকে যায়। আর যে ফসলে পানি সিঞ্চন দেয়া লাগে তাতে ২০ ভাগের এক ভাগ যাকাত আদায় করতে হবে।[১]

খেজুর, যব, গম, মনাক্কা (প্রভৃতি ফসলের) পাঁচ অসাকের কম হলে যাকাত দিতে হয় না।[২]

পাঁচ অসাক হলে দশ ভাগের এক ভাগ ওশর দিতে হবে। (ষাট সা'তে এক অসাক হয়। এক সা, পৌনে তিন সের ওজন তাহলে পাঁচ অসাকে প্রায় ২০ মন ওজন হয়। ২০ মন কোন ফসল হলে তাতে যাকাত বের করতে হবে।)

মধুর যাকাতের বিবরণ

মধুর চাষাবাাদ করলে মধুর যকাাাত দিতে হবে। মধুর দশভাগের একভাগ যাকাত দিতে হবে।[৩]

যে সব বস্তুতে যাকাত ফরজ নয় তার বিবরণ

ঘোড়া, খচ্চর এবং ক্রীতদাসে যাকাত ফরজ হয় না।[৪] তদ্রুপ যে গরুর দ্বারা কাজ করান হয় তাতে যাকাত ফরজ হয় না। তেমনি শাক-সজী, গহনা এবং ভাড়া ঘরে যাকাত ফরজ হওয়া সাব্যস্ত নাই।

জ্ঞাতব্য ঃ ব্যবসার মালের উপর যাকাত ওয়াজিব হওয়ার কথা প্রমাণিত রয়েছে আবু দাউদ শরীফে। হযরত উমর ফারুক উরুজুত তিজারা বা ব্যবসার মালের উপর যাকাত নির্ধারণ করেছেন। (দেখুন ফিকহুয যাকাত ১ম খণ্ড)

গুপ্তধনের উপর যাকাত

যে ব্যক্তি মাটির নীচে (কোন কষ্ট ক্লেশ ছাড়াই) কোন গুপ্তধন পেয়ে যাবে, সে এর পাঁচ ভাগের এক ভাগ যাকাত আদায় করবে।[৫]

---

১. বুখারী, মুসলিম- ইবনে উমর (রা.)।

২. মুসলিম।

৩. আহমাদ, ইবনে মাজা।

৪. দারকুতনী-হযরত আলী (রা.)।

৫. বুখারী, মুসলিম- আবু হুরায়রা (রা.)।

ভিন্ন মালিকানার পশুর বিবরণ

দুই (বা তার অধিক) অংশীদারের একত্রিত পশুকে আলাদা করবে না, তেমনি আলাদা আলাদা পশুকে একত্রিত করবে না যাকাতের ভয়ে।[১]

দুজন শরীক আছে এমন পশুর যাকাত দুজনে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে যাকাত বের করবে।

যে সব পশু যাকাত হিসেবে দেয়া ঠিক নয়

বৃদ্ধ পশু, দোষযুক্ত এবং যে পশুকে প্রজননের জন্য রাখা হয়েছে তা যাকাত হিসেবে নেয়া হবে না। এমনিভাবে, গর্ভবতী পশু, বন্ধ্যা ছাগী এবং যে ছাগী (বা গাভী) দুধের জন্য প্রতিপালন করা হয় তাকেও যাকাত হিসেবে দেয়া যাবে না।[২]

যাকাতের খাত এর বিবরণ

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন যে, যাকাত আট প্রকার লোকের মাঝে বন্টন করবে - (এক) ফকির অর্থাৎ যার নিকট এক বেলারও খাবার নাই।

(দুই) মিসকিন অর্থাৎ যার নিকট এক বা দু বেলার খাবার রয়েছে।

(তিন) যাকাত কর্মচারী অর্থাৎ রাষ্ট্র প্রধান যাকে যাকাত আদায় করার জন্য প্রেরণ করেন। (যাকাত-অফিসার)

(চার) মুয়াল্লাফাতুল কুলুব অর্থাৎ ঐ বিধর্মী যাকে ইসলাম গ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধ করা হবে।

(পাঁচ) ক্রীতদাসকে গোলামী হতে মুক্ত করতে।

(ছয়) ঋণগ্রস্থ ব্যক্তিকে।

(সাত) যারা আল্লাহর পথে লড়াই (সংগ্রাম) করছে।

(আট) মুসাফির।[৩]

যাকাত সংক্রান্ত বিভিন্ন মাসআ'লার বিবরণ

যাকাত অগ্রিম আদায় করা জায়েয।[৪] যে সম্পদের যাকাত দেয়া হয় তা কানয বা গচ্ছিত সম্পদ নয় যার ব্যাপারে পরকালীন শাস্তির ঘোষণা রয়েছে।[৫]

---

১. বুখারী- আনাস (রা.)।

২. মুয়াত্তা, মুসনাদে শাফেয়ী-হযরত উমর (রা.)।

৩. সূরা তওবা : ৬০ নং আয়াত।

৪. তিরমিযী, হাকেম।

৫. আবু দাউদ, দারকুতনী- উম্মে সালামা (রা.)।

যদি কেউ কোন ধনী লোককে গরীব মনে করে তাকে যাকাত দেয় তাহলে তার যাকাত আদায় হয়ে যাবে।[১]

রাষ্ট্র প্রধানের উপর অবশ্য করণীয় হচ্ছে যে, তিনি ধনীদের নিকট হতে যাকাত নিয়ে গরীব এবং অভাবী লোকদের মাঝে ব্যয় ও বিতরণ করবেন।[২]

যে সব লোককে যাকাত দেয়া ঠিক নয়

অভাব অভিযোগহীন, স্বাস্থ্যবান কর্মক্ষম ব্যক্তি এবং হাশেমী অর্থাৎ হযরত আলী (রা.), হযরত আকীল, হযরত জাফর, আব্বাস এবং হযরত হারেস এর বংশাবলী এবং এদের গোলামদের যাকাত দেয়া হারাম।[৩]

ভিক্ষাবৃত্তির বিবরণ

রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন যে, তিন ব্যক্তি ব্যতীত কারো ভিক্ষা করা জায়েয নয়-

(ক) যে ব্যক্তি কোন সৎকাজ করতে গিয়ে ঋণগ্রস্থ হয়ে পড়ে।

(খ) যে ব্যক্তির ধনসম্পদ হঠাৎ কোন বিপদে পড়ে ধ্বংস হয়ে যায়।

(গ) যে ব্যক্তির দারিদ্রতার কথা তিনজন নিষ্ঠাবান ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয়।[৪]

যে ব্যক্তি তার ধনসম্পদ বাড়াবার জন্য ভিক্ষা করে সে আগুন ভিক্ষা করছে। অতপর সে বেশী ভিক্ষা করুক বা কম ভিক্ষা করুক।[৫]

কিয়ামতের দিন ভিক্ষাকারীর মুখ মণ্ডলে গোশত থাকবে না। যদি কোন ব্যক্তির না চেয়েও কিছু মিলে বা কেহ দেয় তাহলে তা নেয়া জায়েয, যদিও তার সে জিনিসের প্রয়োজন না থাকে।[৬]

সাদকাহ্ কারীর মর্যাদা ও তার প্রকারভেদ

প্রতিদিন সকালে আকাশ হতে দু'জন ফেরেশতা অবতীর্ণ হন। তাদের একজন বলতে থাকেন "হে রব্বুল আলামীন! তুমি দানকারীকে আরও দাও।" দ্বিতীয় জন বলতে থাকেন "হে আল্লাহ্ ! কৃপণের মালকে ধ্বংস কর।"[৭]

---

১. বুখারী, মুসলিম- আবু হুরায়রা (রা.)।

২. আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজা- আবু হুজায়ফা (রা.)।

৩. আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ- আবু রা'ফে (রা.)।

৪. মুসলিম - কাবিসা ইবনে মাখারেক (রা.)।

৫. মুসলিম - আবু হুরায়রা (রা.)।

৬. বুখারী, মুসলিম।

৭. বুখারী, মুসলিম- আবু হুরায়রা (রা.)।

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন- "হে আদম সন্তান! তুমি খরচ কর (দান কর) আমি তোমার উপর খরচ করবো। আল্লাহ্ তায়ালার নিকট জাহেল দানশীল ব্যক্তি কৃপণ আবেদ এর চেয়ে উত্তম।[১]

যে ব্যক্তি সুস্থ অবস্থায় এক দিরহাম দান করে তা আল্লাহর নিকট সেই শত দিরহাম হতে উত্তম যা মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার সময় দান করা হয়।[২]

যে ব্যক্তি মৃত্যুর সময় সদকা করে বা গোলাম আযাদ করে সে ঐ ব্যক্তির মত যে সন্তুষ্ট চিত্তে কারও নিকট উপঢৌকন পাঠায়।[৩]

মুমিন কামেল বা পূর্ণ মুমিন কৃপণ এবং দুশ্চরিত্র হতে পারে না।[৪]

রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন "যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে মাল খরচ করে, তার মাল কমে না। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় বিনয় ও নম্রতা পোষণ করে, আল্লাহ্ তার সম্মান বৃদ্ধি করেন। আর যে ব্যক্তি (প্রতিশোধ নেয়ার ক্ষমতা থেকেও) ক্ষমা করে, আল্লাহ্ তার ইজ্জত বাড়িয়ে দেন।[৫]

হযরত রাসূলে করীম (সা.) বলেছেন "মানুষের অংগ প্রত্যঙ্গের উপর প্রতিদিনই সাদকা আছে। দুই জন লোকের মাঝে সুবিচার করা সদকা। তদ্রুপ কাউকে তার ঘোড়ায় চড়িয়ে দেয়া সাদকা। ভালভাবে কথাবার্তা বলা, মসজিদ পানে চলা, রাস্তা হতে কাঁটা ইত্যাদি দূর করা, এসবই সাদকার মধ্যে গণ্য।[৬]

যে ব্যক্তি ফসল ফলায় এবং সেটা হতে কোন মানুষ বা পশু-পাখী ভক্ষণ করে তাহলে তা সাদকা বলে গণ্য হবে। কারও সাথে হাসিখুশী মুখে সাক্ষাত করা, সৎ কাজের নির্দেশ দেয়া এবং অসৎ কাজে বাধা দেয়া, পথহারা লোককে পথের ঠিকানা দেয়া, অন্ধকে সাহায্য করা, পথঘাট হতে কাঁটা, হাড়, পাথর ইত্যাদি সরানো, কোনো ভাইকে পানি উঠিয়ে দেয়া, এ সমস্ত কাজগুলি সবই সাদকার মধ্যে গণ্য।[৭]

---

১. বুখারী, মুসলিম - আবু হুরায়রা (রা.)।

২. তিরমিজী, আবু দাউদ।

৩. আবু দাউদ - আবু সাঈদ (রা.)।

৪. আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাই।

৫. তিরমিযী।

৬. মুসলিম- আবু হুরায়রা (রা.)।

৭. বুখারী, মুসলিম- আবু হুরায়রা (রা.)।

যে মুসলমান কোন মুসলমানকে কাপড় পরার ব্যবস্থা করবে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাকে বেহেশতের সবুজ কাপড় পরাবেন।[১]

কোন মুসলমান যদি অন্য কোন ক্ষুধার্ত মুসলামানকে খাবার দেয় তাহলে আল্লাহ তাকে জান্নাতে খাওয়াবেন এবং যদি কোন পিপাসিত ব্যক্তিকে পানি পান করায় তাহলে তাকে রাহিকে মাখতুম (নিকটতম বান্দাদের জন্য এক উত্তম শরাব) পান করাবেন।[২]

সওয়াবের নিয়্যতে নিজ পরিবার বর্গের উপর খরচ করাও সাদকার মধ্যে পরিগণিত।[৩]

উত্তম সাদকার বিবরণ

সবচেয়ে উত্তম দান হচ্ছে যে, দানকারী সাদকা করার পর খালি হাত না হয়ে পড়ে এবং ঐসব লোকদের দান করা উচিৎ যাদের উপর খরচ করার (দানকারীর) জিম্মাদারী রয়েছে।[৪]

কেহ যদি এক দিরহাম খোদার পথে, এক দিরহাম গোলাম আযাদ করতে, এক দিরহাম মিসকীনের জন্য এবং এক দিরহাম পরিবারের জন্য খরচ করে তাহলে সওয়াবের দিক হতে ঐ দিরহাম উত্তম যা তার পরিবার বর্গের জন্য খরচ করেছে।[৫]

একজন সাধারণ মিসকীনকে দান করলে যে নেকী হয়, সে দান একজন আত্মীয় মিসকীনকে করলে নেকী ডবল হয়। এক হচ্ছে দান করার জন্য এবং দ্বিতীয় হচ্ছে আত্মীয়তা রক্ষার জন্য।[৬]

প্রথমে নিজের জন্য খরচ করতে হবে, এরপর সন্তান-সন্ততির জন্য, এরপর নিজ পরিবারের উপর, এরপর নিজ চাকর-বাকরদের উপর, এরপর যাদের হকদার মনে করবে তাদের জন্য দান খয়রাত করবে।[৭]

১. বুখারী, মুসলিম- আনাস (রা.)।
২. তিরমিযী- আবু যার (রা.)।
৩. আবু দাউদ, তিরমিযী- আবু সাঈদ (রা.)।
৪. বুখারী, মুসলিম- আবু মাসউদ (রা.)।
৫ মুসলিম- মুসলিম (রা.)।
৬. আহমাদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজা, দারেমী-সোলায়মান ইবনে আমের (রা.)।
৭. আবু দাউদ, নাসাঈ- আবু হুরায়রা (রা.)।

স্বামীর মাল হতে স্ত্রীর খরচ করার বিবরণ

যে মহিলা তার স্বামীর মাল অপব্যয় না করে এবং তার অনুমতি নিয়ে খরচ (দান) করে, সে ও তার স্বামী উভয়েই সমান নেকীর অধিকারী হয়। স্ত্রী দান করার কারণে এবং স্বামী উপার্জন করার কারণে নেকী পাবে এবং একজনের নেকী অন্যজনের নেকী হতে কম হবে। না।[১]

তদ্রুপ যদি চাকর তার মনিবের অনুমতি মোতাবেক সন্তুষ্টি সহকারে কোন রকমের ব্যতিক্রম ছাড়াই খরচ (সাদকা) করে তাহলে উভয়েই সমান নেকীর অধিকারী হবে।[২]

স্ত্রী স্বামীর অনুমতি (সরাসরি অনুমতি বা প্রথাগত অনুমতি) ব্যতীত দান খয়রাত করা ঠিক নয়।[৩]

সাদকা করে তা পুনঃ ক্রয় করার বিবরণ

কাউকে কোন দান করে তা পুনরায় ক্রয় করা হচ্ছে বমি করে তা আবার চেটে খাওয়ার মত।[৪]

যদি কেউ তার কোন আত্মীয়কে কিছু দান করে এবং তা তার কোন অংশীদার হতে পুনরায় পেয়ে যায় তাহলে সেটা নেয়া তার জন্য জায়েয।[৫]

সাদকাতুল ফিত্‌র বা ফিতরার বিবরণ

রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন যে, ছোট বড়, নরনারী স্বাধীন ও গোলাম প্রত্যেকের উপর ঈদুল ফিতরের ফিতরা দেয়া ওয়াজিব।[৬]

খেজুর, যব, পনির, মনাক্কা, প্রভৃতির এক সা' পরিমাণ (প্রায় আড়াই কেজি) প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষ হতে ঈদের নামাযের পুর্বেই আদায় করতে হবে।[৭]

গম অর্ধ সাই যথেষ্ট, কিন্তু পূর্ণ সা' দেয়াই উত্তম।[৮]

---

১. বুখারী- আয়েশা (রা.)।

২. বুখারী, মুসলিম- মুসা (রা.)।

৩. তিরমিযী- আবু উমামা (রা.)।

৪. বুখারী, মুসলিম- উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)।

৫. মুসলিম।

৬. বুখারী, মুসলিম - ইবনে উমর (রা.)।

৭. আবু দাউদ, তিরমিজী, নাসাঈ - আমর ইবনে শুয়াইব (রা.)।

৮. ইবনে খুজায়মা, সুবুলুস সালাম- ইবনে উমর (রা.)।

রোযা অবস্থায় যে অনর্থক ও বেহুদা কথা-বার্তা বলে তার কাফ্ফারা হচ্ছে ঈদুল ফিতরের ফিতরা।[১]

ফিতরা দেয়ায় ধনীর অন্তর পবিত্র হয় এবং ফকিরকে আল্লাহ্ হায়ালা তার অনুগ্রহে অধিক দিয়ে থাকেন।[২]

রমজানের রোযা ফরজ হবার বিবরণ

আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন -

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ - (البقرة : ١٨٢)

অর্থাৎ- হে ঈমনদারগণ! তোমাদের উপর রোযা ফরজ করা হয়েছে, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর ফরজ করা হয়েছিল। (সূরা বাকারা ঃ ১৮৩)

রোযা হচ্ছে ইসলামের তৃতীয় রুকন বা স্তম্ভ।[৩]

পবিত্র রমজান মাসের মর্যাদার বিবরণ

আল্লাহ্ তায়ালা ইরশাদ করেছেন -

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ - (البقرة : ١٨٥)

অর্থাৎ- রমজান মাসেই কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে। আর তা (কুরআন) হচ্ছে মানুষের জন্য হেদায়াত এবং হেদায়াতের সুস্পষ্ট দলিল, হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্যকারী। (সূরা বাকারা ঃ ১৮৫)

যখন রমজান মাস আসে তখন আসমান এবং বেহেশতের দরজা খুলে দেয়া হয়, জাহান্নামের দরজা বন্ধ করে দেয়া হয় এবং শয়তানকে বন্দী করা হয় যেন সে রোজাদারদের অন্তকরণে কুমন্ত্রণা দিতে না পারে।[৪]

---

১. আবু দাউদ - ইবনে আব্বাস (রা.)।

২ আবু দাউদ - আব্দুল্লাহ ইবনে সা'লাবা (রা.)।

৩. বুখারী, মুসলিম- ইবনে উমর (রা.)।

৪. বুখারী, মুসলিম - আবু হুরায়রা (রা.)।

পবিত্র রমজানের রোযার সওয়াব

জান্নাতের আটটি দরজা রয়েছে, তার মাঝে একটির নাম হচ্ছে রাইয়ান। এ দরজা দিয়ে রোযাদার ছাড়া অন্য কেউ প্রবেশ করতে পারবে না।[১]

প্রত্যেক ভাল কাজের প্রতিদান দশ হতে সাত শ' পর্যন্ত দেয়া হয়ে থাকে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা বলেন, রোযা একমাত্র আমারই উদ্দেশ্যে এবং আমি এর প্রতিদান দিব। (কেননা আমার বান্দা আমাকে সন্তুষ্ট করার জন্য এবং সওয়াবের আশায় আপন বাসনাকে দমন করে এবং খানাপিনা পরিহার করে।)[২]

যে ব্যক্তি রমজানের রোযা রাখে ঈমানের সাথে (শরিয়তকে সঠিক জেনে এবং রোযার ফরজিয়াতকে বিশ্বাস করে) এবং সওয়াবের আশায়, তার পূর্বের গুনাহসমূহ মাফ করে দেয়া হয়।[৩]

রোজাদারের জন্য দু'টি খুশী। একটি ইফতার করার সময় (এটা এ কারণে যে, সে আল্লাহর হুকুম পালন করে নিয়েছে) এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে তার প্রভুর সাথে মোলাকাতের সময় (যেহেতু সওয়াবের প্রত্যাশী)।[৪]

রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকট কস্তুরীর (মৃগনাভীর) সুগন্ধির চেয়েও সুগন্ধিযুক্ত।[৫]

রোযা দুনিয়াতে গুনাহ থেকে বাঁচার জন্য এবং পরকালে জাহান্নামের শাস্তি হতে বাঁচার জন্য ঢাল স্বরূপ।[৬]

রমজান মাসে আল্লাহর পক্ষ হতে এক ঘোষণাকারী বলতে থাকেন "হে কল্যাণ ও পূণ্যের অনুসন্ধানকারী! তুমি (আল্লাহর দিকে) আকৃষ্ট হও। হে অপকর্মের ইচ্ছা পোষণকারী! তুমি অপকর্ম হতে বিরত হও। কেননা আল্লাহ্ তায়ালা রমজানের বরকতের কারণে তার অনেক বান্দাকে দোজখ হতে নিষ্কৃতি দিয়ে থাকেন, তুমিও এদের দলের একজন হও।"[৭]

রমজান মাস বরকতের মাস। এমাসে একটি রাত (লাইলাতুল কাদর) আছে

---

১. বুখারী, মুসলিম - সাহল ইবনে সা'দ (রা.)।

২. বুখারী, মুসলিম- আবু হুরায়রা (রা.)।

৩. বুখারী, মুসলিম - আবু হুরায়রা (রা.)।

৪. বুখারী, মুসলিম।

৫. বুখারী, মুসলিম - আবু হুরায়রা (রা.)।

৬. বুখারী, মুসলিম - আবু হুরায়রা (রা.)।

৭. আহমাদ তিরমিযী, ইবনে মাজা - আবু হুরায়রা (রা.)।

যার ইবাদত এক হাজার রাতের ইবাদতের চেয়েও উত্তম।[১]

রমজান মাসে একটি নফল ইবাদতের সওয়াব অন্য মাসের ফরজ আদায় করার সমান এবং রমজান মাসে একটি ফরজ আদায় করার সওয়াব অন্য মাসে সত্তরটি ফরজ আদায় করার সমান।[২]

বিনা ওজরে রোযা ত্যাগ করার বিবরণ

বিনা ওজরে রোযা ছাড়া তেমনি কুফরী যেমন বিনা ওজরে নামাজ ত্যাগ করা কুফরী।[৩]

সুবহে সাদেক হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত খাওয়া, পান করা, স্ত্রী সঙ্গম ও (বেহুদা কথাবার্তা) হতে বিরত থাকার নামই রোযা।[৪]

রোযাদারকে ইফতার করানোর সওয়াব

যে ব্যক্তি কোন রোযাদারকে ইফতার করাবে এটা তার জন্য গুনাহ্ মাফ এবং দোজখ হতে নাজাত পাবার কারণ হবে।[৫]

ইফতার প্রদানকারী রোযাদারের সমান সওয়াবের অধিকারী হবে। এক ঢোক দুধ বা একটি খেজুর দিয়ে ইফতার করালেও এ সওয়াব মিলবে।[৬]

রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) ইরশাদ করেছেন ঃ যে ব্যক্তি রোযাদারকে পেট ভরে খাওয়াবে আল্লাহ্ তা'য়ালা (কিয়াতমের দিন) তাকে আমার হাউজে কাওসার হতে পান করাবেন। সে বেহেশতে পবেশ করা পর্যন্ত আর তৃষ্ণার্ত হবে না।[৭]

রোযা রোযাদারের জন্য সুপারিশ করবে

রোযা রোযাদারের জন্য সুপারিশ করবে। বলবে, হে প্রভূ! আমি একে খাওয়া, পান করা, আকাংখিত জিনিস (স্ত্রী সংগম ইত্যাদি) হতে বিরত রেখেছিলাম, তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবুল কর। আল্লাহ্ তা'য়ালা উক্ত সুপারিশ কবুল করবেন।[৮]

---

১. শোয়াবুল ঈমান - সালমান ফারেসী (রা.)।

২. প্রাগুক্ত।

৩. মিশকাত।

৪. বুখারী, মুসলিম - আবু হুরায়রা (রা)।

৫. শোয়াবুল ঈমান, মিশকাত- সালমান ফারেসী (রা.)।

৬. প্রাগুক্ত।

৭. প্রাগুক্ত।

৮. শোয়াবুল ঈমান, মিশকাত- আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.)।

রমজানে চাকর চাকরাণীদের কাজ হালকা করার বিবরণ

রমজান মাসে চাকর চাকরাণীদের কাজ হালকা (সহজ) করে দিলে গুনাহ মাফ হয় এবং আল্লাহ তা'য়ালা তাকে জাহান্নামের আগুন হতে নাজাত দান করেন।[১]

রমজানে কয়েদীদের মুক্তি দেয়া ও ভিক্ষুককে সাহায্য দেয়ার বর্ণনা

রাসূলুল্লাহ (সা.) রমজান মাসে প্রত্যেক কয়েদীকে মুক্তি প্রদান করতেন এবং প্রত্যেক প্রার্থনাকারীকে (যে কোন যাঞ্চাকারীকে) তা দান করতেন।[২]

প্রতি রমজানে বেহেশত সুসজ্জিত করার বর্ণনা

রমজানের আগমন উপলক্ষে বেহেশতকে শাওয়াল মাসের প্রথম হতে শাবান মাসের শেষ পর্যন্ত (অর্থাৎ সারা বছর) সুসজ্জিত করা হয়ে থাকে। রমজানের প্রথম তারিখে আরশের তলদেশে বেহেশতের পত্ররাজীর মধ্যে হুরদের মাথার উপর দিয়ে বায়ু প্রবাহিত হতে থাকে। তখন হুরেরা বলেন, হে আমাদের প্রভু ! তোমার বান্দাদের মধ্য হতে আমাদের স্বামী বানিয়ে দাও। যেন তাদের দেখে আমাদের চক্ষু জুড়ায় এবং আমাদের দেখে তাদের চক্ষু শীতল হয়।[৩]

রমজানের রাতে কিয়াম করার সওয়াব

যে ব্যক্তি রমজানের কিয়াম করে (অর্থাৎ রাতে তারাবীর নামায পড়বে) ঈমানের সাথে এবং সওয়াবের আশায়, আল্লাহ তা'য়ালা তার পূর্বের গুনাহসমূহকে ক্ষমা করেদেন।[৪]

চাঁদ দেখে রোযা রাখা ও চাঁদ দেখে ঈদ করা

চাঁদ দেখে রোযা রাখবে এবং চাঁদ দেখে ঈদ করবে। যদি উনত্রিশে রমজানের দিবাগত সন্ধ্যায় (রাতে) মেঘ বা ধুলাবালির কারণে চাঁদ দেখতে না পাওয়া যায় তাহলে রোজা পুরা ত্রিশ দিন করে ঈদ করবে।[৫]

সন্দেহযুক্ত দিনে রোযা রাখা নিষেধ

সন্দেহযুক্ত দিনে রোযা রাখা নিষেধ। যে ব্যক্তি সন্দেহজনক দিনে রোযা রাখল, সে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর নাফরমানী করল।[৬]

---

১. শোয়াবুল ঈমান, মিশকাত - আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)।

২. শোয়াবুল ঈমান, মিশকাত - ইবনে উমর (রা.)।

৩. প্রাগুক্ত।

৪. বুখারী, মুসলিম - আবু হুরায়রা (রা.)।

৫. বুখারী, মুসলিম - ইবনে উমর (রা.)।

৬. সুনানে আরবা, দারেমী- আম্মার ইবনে ইয়াসের (রা.)।

রমজানের সম্মানার্থে রোযা রাখা নিষেধ

রমজানের (সম্মানার্থে) ২/১ দিন পূর্বে রোযা রাখবে না। কিন্তু যদি উক্ত দিনে রোযা রাখা কারো অভ্যাস হয়ে থাকে (অর্থাৎ প্রতি মাসে রোযা রাখে) তাহলে অসুবিধা নাই।[১]

রোযা রাখা ও ঈদ করার জন্য সাক্ষ্য

রমজানের রোযা রাখার জন্য একজন আ'দেল মুসলমানের সাক্ষ্যই যথেষ্ট[২] এবং দু'জন আ'দেল মুসলমান ঈদের চাঁদ দেখার সাক্ষ্য দিলে ঈদ করতে হবে।[৩]

ফরজ রোযার নিয়্যেতর সময়

যে ব্যক্তি সুবহে সাদেকের পূর্বে ফরজ রোযার নিয়্যত করেনি তার রোযা সঠিক হবে না।[৪]

সেহরীর সময় এর বিবরণ

সেহরীর সময় সুবহে সাদেক প্রকাশ হবার পূর্ব পর্যন্ত।[৫]

সেহরী খাবার বিবরণ

সেহরী খাওয়া সুন্নাত। সেহরী খেলে সারা দিন শরীরে শক্তি থাকে।[৬]

সওমে বেসাল বা মিলান রোযা রাখা নিষেধের বিবরণ

একদিনের সাথে অন্য দিন মিলিয়ে (মধ্যে কোন ইফতার না করে) রোযা রাখা সুন্নাত নয়।[৭] (বরং তা নিষিদ্ধ।)

তাড়াতাড়ি ইফতার করার ফজিলত

তাড়াতাড়ি ইফতার করা উত্তম। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, মানুষ সর্বদা কল্যাণের সাথে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাড়াতাড়ি ইফতার করবে।[৮]

---

১. বুখারী, মুসলিম - আবু হুরায়রা (রা.)।

২. আবু দাউদ, দারেমী - ইবনে উমর (রা.)।

৩. আবু দাউদ- ইবনে উমর (রা.)।

৪. আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, দারেমী - হাফসা (রা.)।

৫. সূরা বাকারা ঃ ১৮৭।

৬. মিশকাত - আনাস (রাঃ)।

৭. বুখারী, মুসলিম- আবু হুরায়রা (রা.)।

৮. তিরমিযী- আবু হুরায়রা (রা.)।

রোযা ভঙ্গের কারণ ও তার বর্ণনা

যে ব্যক্তি অনর্থক (বেহুদা) কথা ও মিথ্যা বলে তার রোযার প্রতি আল্লাহ তায়ালা কোন ভ্রুক্ষেপ করেন না।[১]

রোযা রেখে অনর্থক কথা বা মিথ্যা বলবে না। যদি কেউ গালি দেয় বা ঝগড়া বাধায় তাহলে ওজর পেশ করে বলবে 'আমি রোযা রেখেছি।'[২]

রোযাদার ব্যক্তির জন্য স্ত্রীকে চুম্বন দেয়া জায়েয এবং স্ত্রীর শরীরের সাথে নিজ শরীর লাগানো নিষেধ নয়। কিন্তু যে যুবক কামরিপুর উত্তেজনা সংযত করতে সক্ষম নয় তার জন্য নাজায়েয।[৩]

রোযাদার ব্যক্তি যদি রাতে অপবিত্র হয়ে যায়, তাহলে তার জন্য সুবেহ সাদেকের পর গোসল করা জায়েয।[৪]

সিঙ্গা (কুলিয়া) লাগালে রোযা ভঙ্গ হয় না।[৫]

যে ব্যক্তি রোযা অবস্থায় ভুল করে খেয়ে নেয় বা পানি পান করে তাহলে তার রোযা নষ্ট হবে না।[৬] কুলি করার পর মুখের ভিতর থুথু করলে রোযা নষ্ট হয় না।[৭]

রোযা অবস্থায় চোখে সুরমা লাগানো জায়েয। রোযা অবস্থায় মেসওয়াক করা জায়েয। হযরত রাসূলে করীম (সা.) রোযা অবস্থায় একাধিকবার মেসওয়াক করতেন।[৮]

বমি হলে রোযা নষ্ট হয় না। কিন্তু কেউ ইচ্ছাকৃত বমি করলে তার রোযা ভঙ্গ হবে এবং তাকে কাজা আদায় করতে হবে।[৯]

মাথায় পানি ঢাললে রোযা নষ্ট হয় না।[১০]

---

১. বুখারী - আবু হুরায়রা (রা.)।

২. বুখারী, মুসলিম - আবু হুরায়রা (রা.)।

৩. বুখারী, মুসলিম- আয়েশা (রা.)।

৪. বুখারী, মুসলিম- আয়েশা (রা.)।

৫. বুখারী, মুসলিম- ইবনে আব্বাস (রা.)।

৬. বুখারী, মুসলিম- আবু হুরায়রা (রা.)।

৭. বুখারী।

৮. আবু দাউদ, তিরমিযী - আমের ইবনে রাবিয়া (রা.)।

৯. প্রাগুক্ত।

১০. আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজা, দারেমী - আবু হুরায়রা (রা.)।

রমজানের একটি রোযার যে নেকী পাওয়া যায়, সারা জীবন রোযা রেখেও সে পরিমাণ নেকী পাওয়া যাবে না।[১]

রোযা অবস্থায় স্ত্রী সঙ্গম করলে বা গুপ্তাঙ্গের অগ্রভাগ প্রবেশ করালে রোযা নষ্ট হয়ে যায়।[২]

রোযা অবস্থায় সঙ্গম করার কাফ্ফারা

যে ব্যক্তি রোযা অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করবে সে একজন গোলাম আযাদ করবে। যদি গোলাম আযাদ করতে অক্ষম হয় তাহলে একাধারে দুইমাস রোযা রাখবে। যদি একাধারে দুই মাস রোযা রাখতে অক্ষম হয় তাহলে ষাট জন মিসকীনকে খানা খাওয়াবে।[৩]

ইফতারের সময় রোযাদারের দোয়া কবুল হয় তার বর্ণনা

ইফতারের সময় রোযাদার দোয়া করলে তা প্রত্যাখ্যাত হয় না (অর্থাৎ কবুল করা হয়।)[৪]

ইফতারের দোয়া

রোযা ইফতার করার সময় এ দোয়াগুলির মধ্যে যেটা ইচ্ছা পাঠ করবে ঃ

প্রথম দোয়া ঃ

اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ

অর্থাৎ- হে আল্লাহ ! আমি তোমার জন্যই রোযা রেখেছিলাম এবং তোমার দেয়া রিজিক দিয়ে ইফতার করছি।[৫]

দ্বিতীয় দোয়া ঃ

ذَهَبَ الظَّمَاءُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوْقُ وَثَبَتَ الاَجْرُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ -

অর্থাৎ- তৃষ্ণা দূর হয়েছে, শিরা-উপশিরাগুলি সঞ্জিবীত হয়েছে এবং আল্লাহ চাহেত প্রতিফল নির্ধারিত হয়েছে।[৬]

---

১. মুয়াত্তা, আবু দাউদ- আবু হুরায়রা (রা.)।

২. বুখারী - আবু হুরায়রা (রা.)।

৩. বুখারী, মুসলিম - আবু হুরায়রা (রা.)।

৪. আবু দাউদ - ইবনে উমর (রা.)।

৫. আবু দাউদ - মুয়াস ইবনে জুহরা (রা.)।

৬. আবু দাউদ - ইবনে উমর (রা.)।

তৃতীয় দোয়া ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِىْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ اَنْ تَغْفِرَ لِىْ ذُنُوْبِىْ -

অর্থাৎ- হে আল্লাহ ! আমি তোমার অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি। যার প্রশস্ততা সমস্ত জিনিসের উপর পরিব্যপ্ত। তুমি আমার সমস্ত গুনাহ্ ক্ষমা করে দাও।[১]

সফরে রোযা রাখার বিবরণ

মুসাফির হলে তাকে এ অধিকার দেয়া হয়েছে যে, সে ইচ্ছা করলে রোযা রাখতে পারে, ইচ্ছা করলে নাও রাখতে পারে। কিন্তু রোযা রাখতে কষ্ট হলে রোযা না রাখাই উত্তম।[২]

মা ও গর্ভবতী মহিলার রোযার বিবরণ

দুধ পানকারিনী মায়ের বাচ্চা যতদিন দুধ ছাড়া অন্য কোন খাবার না খায় ততদিন পর্যন্ত উক্ত মাতার উপর রোযা রাখা ওয়াজিব নয়। তদ্রূপ গর্ভবতী মহিলার সন্তান প্রসব না করা পর্যন্ত তার উপর রোযা ওয়াজিব নয়।[৩]

হায়েজ ও নেফাস অবস্থায় মহিলার রোযা রাখার বিবরণ

হায়েজ অবস্থায় এবং নেফাস অবস্থায় (সন্তান প্রসবের পর যে রক্তপাত হয়) রোযা রাখবে না। পরবর্তীতে এ রোযার কাজা আদায় করবে।[৪]

বৃদ্ধ লোকের রোযার বিবরণ

যে বৃদ্ধলোক রোযা রাখতে অসমর্থ সে প্রতিদিন একজন মিসকিনকে খানা খাওয়াবে এবং তার উপর রোযার কাজা ওয়াজিব নয়।[৫]

মৃতের পক্ষ হতে ওয়ারিসদের রোযা

যদি কেউ মারা যায় এবং তার উপর রোযা আদায় বাকী থাকে তাহলে তার পক্ষ হতে তার উত্তরাধিকারী রোযা রাখবে। অথবা প্রতি রোযার পরিবর্তে একজন মিসকীনকে খানা খাওয়াবে।[৬]

---

১. বুখারী, মুসলিম- আয়েশা (রা.)।

২. বুখারী, মুসলিম- আনাস (রা.)।

৩. আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ।

৪. বুখারী, মুসলিম- মুয়াজা আদাবিয়া (রা.)।

৫. দারাকুত্বানী, হাকেম - ইবনে আব্বাস (রা.)।

৬. তিরমিযী, মিশকাত - ইবনে উমর (রা.)।

রোযার কাজার বিবরণ

যে ব্যক্তি শরয়ী ওজরের (সফর বা অসুখ) কারণে রোযা রাখতে পারবে না, তার জন্য এ রোযার কাজা আদায় করা ওয়াজিব।[১]

নফল রোযার বিবরণ

যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্যে রোযা রাখে, আল্লাহ তায়ালা তার মাঝে এবং দোজখের মাঝে এমন দূরত্ব করে দেন যেমন আসমান এবং জমিনের মাঝে দূরত্ব রয়েছে।[২]

প্রত্যেক বস্তুর জাকাত রয়েছে, শরীরের জাকাত হল রোযা।[৩]

নফল রোযার মধ্যে আশুরার রোযাই উত্তম। যে ব্যক্তি আশুরার রোযা রাখবে সে মুহররমের ৯ (নয়) তারিখও রোযা রাখবে।[৪]

আশুরার রোযা দ্বারা গত বছরের গুনাহর কাফ্ফারা হয়ে যায়।[৫]

ঈদের দিন রোযা রাখা জায়েয নয়। তদ্রূপ আইয়্যামে তাশরীক বা জিলহজ্ব মাসের ১১, ১২ ও ১৩ তারিখেও রোযা রাখা জায়েয নয়।[৬] কিন্তু যে হাজী সাহেব কোরবানী করতে পারবে না, সে এ দিনগুলোতে রোযা রাখবে।[৭]

আরাফার দিনের রোযা গত বছর এবং সামনে বছরের গুনাহের কাফ্ফারা স্বরূপ।[৮] কিন্তু হাজী সাহেবদের জন্য আরাফার দিন রোযা রাখা জায়েয নয়।[৯]

প্রতিদিন (লাগাতার ভাবে) রোযা রাখা নিষেধ।[১০] উত্তম হচ্ছে প্রতি মাসে তিনটি করে রোযা রাখা। যে ব্যক্তি এর চেয়েও বেশী সমর্থ রাখে সে একদিন পর পর রোযা রাখবে। হযরত দাউদ (আ.) এভাবে রোযা রাখতেন।[১১]

স্ত্রীলোকের স্বামীর অনুমতি ছাড়া নফল রোযা রাখা জায়েয নয়।[১২]

---

১. সূরা বাকারা ঃ ১৮৫।
২. তিরমিযী, মিশকাত - আবু উমামা (রা.)।
৩. ইবনে মাজা - আবু হুরায়রা (রা.)।
৪. মুসলিম - আবু হুরায়রা (রা.)।
৫. মুসলিম- আবু হুরায়রা (রা.)।
৬. মুসলিম - আবু কাতাদা (রা.)।
৭. মুসলিম, আহমাদ- কাব ইবনে মালেক (রা.)।
৮. মুসলিম- আবু কাতাদা (রা.)।
৯. আবু দাউদ- আবু হুরায়রা (রা.)।
১০ বুখারী, মুসলিম- আবুদল্লাহ বিন উমর (রা.)।
১১.প্রাগুক্ত।
১২. বুখারী. মুসলিম।

শুধু জুমার দিন রোযা রাখা জায়েয নয়। জুমার সাথে এর আগে বা পরে একদিন মিলিয়ে রোজা রাখবে।[১] অদ্রুপ সপ্তাহে কোন দিন (একটি) রোযা রাখা জায়েয নয় যতক্ষণ না এর আগে বা পরে একদিন মিলিয়ে রোযা রাখবে।[২] রোযাদারের অস্থিসমূহ আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করে[৬৯]এবং ফেরেশতারা রোযাদারের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে।[৩]

বিনা কারণে নফল রোযা ভঙ্গ করা নিষেধ নয় এবং কেউ ভঙ্গ করলে তা কাজা ওয়াজিব নয়।[৪]

লাইলাতুল কদরের বিবরণ

লাইলাতুল কদর (বেশীরভাগ) রমজানের শেষ দশ দিনের বিজোড় রাতে (২১, ২৩, ২৫, ২৭ এবং ২৯) হয়ে থাকে।[৫]

যে রাতে লাইলাতুল কদর হয়, সে রাতে জিবরাইল (আঃ) একদল ফেরেশতাসহ দুনিয়াতে অবতরণ করেন এবং সে রাতে ইবাদতকারী বান্দাদের জন্য দোয়া করতে থাকেন।[৬]

রমজানের শেষ দশ দিনে বেশী বেশী ইবাদত করার প্রচেষ্টা করবে, এমনকি ইবাদতে নিজ পরিবারের লোকজনকে শামিল করবে।[৭]

যে ব্যক্তি রমজানের রোযা রাখবে এবং ঈদের নামায পড়বে, আল্লাহ তা'য়ালা তার গুনাহ মাফ করে দিবেন এবং তার গুনাহ গুলিকে নেকীতে রূপান্তরিত করবেন।[৮]

এতেকাফের বিবরণ

রমজানের শেষ দশ দিনে রাসূলুল্লাহ (সা.) সর্বদাই এতেকাফে বসতেন।[৯]

এতেকাফের জন্য মসজিদের মাঝে পৃথক স্থান নির্দিষ্ট করে নিবে এবং ফজরের নামায পড়ে এ'তেকাফের স্থানে প্রবেশ করবে।[১০]

---

১. মুসলিম - আবু হুরাইরা (রা.)।
২. আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযী।
৩. শোয়াবুল ইমান।
৪. তিরমিযী।
৫. বুখারী, মুসলিম।
৬. বুখারী, মুসলিম- আয়েশা (রা.)।
৭. বায়হাকী - আনাস (রা.)।
৮. বুখারী, মুসলিম- আয়েশা (রা.)।
৯. বায়হাকী - আনাস (রা.)।
১০. বুখারী, মুসলিম- আয়েশা (রা.)।

এতেকাফকারী মসজিদের বাহিরে যাবে না কিন্তু কোন প্রয়োজনীয় কাজের (যেমন পায়খানা ইত্যাদি) জন্য বাইরে যেতে পারে।[১]

এ'তেকাফকারী রোগীর দেখাশুনা করার জন্য যাওয়া জায়েয নয় কিন্তু পথে চলতে চলতে এ ব্যাপারে দেখাশুনা ও খোজ-খবর নেয়া জায়েয।[২]

তদ্রূপ জানাযার নামাজের জন্য মসজিদের বাহিরে যাওয়া জায়েয নয়।[৩]

এতে'কাফ অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করবে না।[৪] চুমু দেয়া এবং কোলাকুলি করাও জায়েয নয়।[৫]

এ'তেকাফকারী মসজিদ হতে মাথা বের করে তা (অন্য কারও দ্বারা) ধুয়ে নেয়া এবং চিরুনীর দ্বারা মাথা আঁচড়িয়ে নেয়া জায়েয।[৬]

এ'তেকাফকারী পাপ হতে বিরত থাকে এবং এ'তেকাফের কারণে যে সব নেকীর কাজ করতে সমর্থ হয় না সে সবের নেকীও সে পাবে।[৭]

এ'তেকাফ করার জন্য রোযা শর্ত নয়। (কিন্তু উত্তম হচ্ছে রোযা রাখা)[৮]

কেউ যদি এ'তেকাফ করার মানত মানে তাহলে তা পূরা করা তার জন্য ওয়াজিব।[৯]

মুস্তাহাযা (রক্তপ্রদরবতী) স্ত্রীলোকের মসজিদে এ'তেকাফে বসা জায়েয নয়।[১০]

---

১. মুসলিম- আয়েশা (রা.)।

২. আবু দাউদ, ইবনে মাজা - আয়েশা (রা.)।

৩. আবু দাউদ, মিশকাত - আয়েশা (রা.)।

৪. সুরা বাকারা ঃ ১৮৭

৫. আবু দাউদ, মিশকাত - আয়েশা (রা.)।

৬. আবু দাউদ - আয়েশা (রা.)।

৭. ইবনে মাজা - ইবনে আব্বাস (রা.)।

৮. দারকুতনী, হাকেম- ইবনে আব্বাস (রা.)।

৯. বুখারী, মুসলিম।

১০. বুখারী, মুসলিম- আয়েশা (রা.)।

হজ্বের বিবরণ

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلاً -

অর্থাৎ- মানুষের উপর আল্লাহ্র এ অধিকার রয়েছে যে, যার এই ঘর পর্যন্ত পৌছার সামর্থ্য আছে সে যেন হজ্ব সম্পন্ন করে।[১] হজ্ব জীবনে একবার ফরজ।[২] এর অস্বীকারকারী কাফির।[৩]

রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তির সামর্থ থাকার পরও হজ্ব করে না তার এবং ইহুদী ও খৃষ্টানদের মাঝে কোন পার্থক্য নেই।[৪]

হজ্বের শর্ত ঃ

প্রথম শর্ত ঃ মুসলমান হওয়া। কাফিরের উপর হজ্ব ফরজ নয়।[৫]

দ্বিতীয় শর্ত ঃ স্বাধীন হওয়া। দাসের উপর হজ্ব ফরজ নয়।[৬]

তৃতীয় শর্ত ঃ আ'কেল (বুদ্ধিমান) এর উপর হজ্ব ফরজ। পাগল এবং জ্ঞানহীন ব্যক্তির উপর হজ্ব ফরজ নয়।[৭]

চতুর্থ শর্ত ঃ বয়প্রাপ্তের উপর ফরজ, অপ্রাপ্ত বয়স্কের উপর নয়।[৮]

পঞ্চম শর্ত ঃ সুস্থ ব্যক্তির উপর ফরজ, পীড়িত ব্যক্তির উপর ফরজ নয়।[৯]

ষষ্ঠ শর্ত ঃ যে ব্যক্তি (মক্কা পর্যন্ত) যাতায়াত ও অন্যান্য খরচের সামর্থ রাখে এবং হজ্ব হতে প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত তার পরিবারবর্গের যাবতীয় খরচ মিটানোর সামর্থ রাখে।[১০]

সপ্তম শর্ত ঃ রাস্তায় বিপদাপদের ভয় থাকলে হজ্ব ফরজ নয়।[১১]

অষ্টম শর্ত, ঃ স্ত্রীলোকের সাথ তার স্বামী বা মুহরেম লোক না থাকলে হজ্ব করতে যাবে না।[১২]

---

১. সূরা আলে ইমরান ঃ ৯৭
২. আহমাদ, নাসাঈ, দারেমী - ইবনে আব্বাস (রা.)।
৩. আলে- ইমরান ঃ ৯৭
৪. দারেমী, মিশকাত- আবু উমামা (রা.)।
৫. মিশকাত।
৬. ইবনে আবী শাইবা, বায়হাকী- ইবনে আব্বাস (রা.)।
৭. বায়হাকী।
৮. তিরমিযী - হযরত আলী (রা.)।
৯. আহমাদ, সুনানে আরবা - ইকরামা (রা.)।
১০. আলে ইমরান ঃ ১০ রুকু।
১১. আহমাদ, সুনানে আরবা- ইকরামা (রা.)।
১২. বুখারী, মুসলিম - ইবনে আব্বাস (রা.)।

হজ্ব ও উমরার ফজিলত

হজ্ব হচ্ছে ইসলামের চতুর্থ রুকন বা স্তম্ভ।[১] ঈমানের পরে হজ্ব হচ্ছে উত্তম আমল। যে ব্যক্তি হজ্ব করে এবং বেহুদা কথাবার্তা না বলে তাহলে সে হজ্ব হতে এমন (বেগুনাহ) অবস্থায় ফিরে আসে যেমন অবস্থায় তাকে তার মা ভূমিষ্ট করেছে।[২]

এক উমরা হতে অপর উমরা তার মধ্যবর্তী গুনাহ্ সুমহের কাফ্ফারা স্বরূপ এবং মকবুল হজ্বের প্রতিদান হচ্ছে জান্নাত।[৩]

হজ্ব ও উমরা পর্যায়ক্রমে করলে দারিদ্রতা ও গুনাহ্ এমনভাবে দুর হয় যেমন আগুনে লোহা, সোনা ও চান্দির ময়লা দুর করে।[৪]

আল্লাহ্ আয়ালা হজ্ব এবং উমরাকারীর গুনাহ্ মাফ করেন এবং তাদের দোয়া কবুল করেন।[৫]

যে ব্যক্তি হজ্ব বা উমরার নিয়্যতে বাড়ী হতে বের হয়ে রাস্তায় মৃত্যু রবণ করবে তার জন্য হজ্বকারী এবং উমরাকারীর সমান সওয়াব লিখা হবে।[৬]

যে ব্যক্তি কোন হাজী সাহেবের সাতে সাক্ষাৎ করে সে হাজী সাহেব বাড়ীতে প্রবেশ করার পূর্বেই তার জন্য দোয়া করিয়ে নিবে।[৭]

রমজান মাসে উমরা করলে হজ্বের সমান নেকী পাওয়া যায়।[৮] হজ্বই হচ্ছে মহিলাদের জিহাদ।[৯]

উত্তম হজ্ব হচ্ছে সেটাই যাতে উচ্চস্বরে লাব্বাইকা বলা হবে এবং কোরবানীর রক্ত বহিয়ে দেয়া হবে।[১০]

---

১. বুখারী, মুসলিম - উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)।

২. বুখারী, মুসলিম - আবু হুরায়রা (রা.)।

৩. বুখারী, মুসলিম - আবু হুরায়রা (রা.)।

৪. বুখারী, মুসলিম - ইবনে আব্বাস (রা.)।

৫. ইবনে মাজা - আবু হুরায়রা (রা.)।

৬. ইবনে মাজা, শোয়াবুল ঈমান- আবু হুরায়রা (রা.)।

৭. আহ্মাদ, মিশকাত - ইবনে উমর (রা)।

৮. বুখারী, মুসলিম- ইবনে আব্বাস (রা.)।

৯. বুখারী, মুসলিম - আয়েশা (রা.)।

১০. শরহে সুন্না, মিশকাত- ইবনে উমর (রা.)।

হজ্ব কিভাবে করতে হবে তার বিবরণ

হজ্ব তিন প্রকার, হজ্বে মুফরাদ (ইফরাদ) হজ্বে তামাত্তু এবং হজ্বে কেরান।[১]

রাসূলুল্লাহ (সা.) হজ্বে কেরান করেছিলেন, কিন্তু নবী করীম (সা.) এর আকাংখা ছিল তামাত্তু করার।[২] (এ কারণেই শাফেয়ী (রহঃ. হজ্বে তামাত্তুকে আফজাল বলেছেন। এতে সহজতাও রয়েছে, দীর্ঘদিন পর্যন্ত ইহরাম পরে থাকা খুব কষ্টকর।)

হজ্বে তামাত্তু করার ইচ্ছা করলে ইয়ালামলাম নামক পর্বতের নিকটবর্তী হলেই গোসল এবং নিয়্যত করে ইহরাম বাঁধবে এবং পাজামা, জামা, কুর্তা, পাগড়ী এবং টুপি খুলে ফেলবে।[৩]

যদি কোন সুগন্ধি পাওয়া যায় তাহলে তা ইহরাম বাঁধার পুর্বেই লাগাবে। রঙ্গিন বা জাফরান দ্বারা রং করা কাপড় পরবে না এবং মোজা পরবে না।

যদি জুতা না পাওয়া যায় তাহলে (চামড়ার) মোজার উপরিভাগ টাকনু পর্যন্ত কেটে ফেলে পরিধান করবে।[৪]

ইহরাম অবস্থায় গোসল করা এবং মাথায় পানি ঢালা জায়েয। ইহরাম অবস্থায় কেউ মারা গেলে তাকে সুগন্ধি লাগানো নিষেধ।[৫]

ইমরাম অবস্থায় প্রয়োজন বশত সিঙ্গা (কুলিয়া) লাগানো জায়েয।[৬] ইহরাম অবস্থায় মাথা এবং শরীর চুলকানো জায়েয।[৭]

ইহরাম অবস্থায় যদি নখ ভেঙ্গে যায় তাহলে সেটা কাটা জায়েয।[৮] ইহরাম অবস্থায় শিকারকৃত পশু ছাড়া অন্য পশু জবেহ করা জায়েয।[৯] মুহরেম যদি

১. বুখারী, মুসলিম - আয়েশা (রা.)।

২. মুসলিম- জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রা.)।

৩. বুখারী, মুসলিম- আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.)।

৪. বুখারী, মুসলিম।

৫. বুখারী- ইবনে আব্বাস (রা.)।

৬. বুখারী, মুসলিম- ইবনে আব্বাস (রা.)।

৭. বুখারী।

৮. রেহলাতুস সিদ্দীক।

৯. বুখারী।

ভুলবশত জামা পরে ফেলে বা সুগন্ধি লাগায় তাহলে এজন্য কাফ্ফারা দিতে হবে না।[১] মুহরেম ব্যক্তির মাথা এবং মুখ ঢাকা জায়েয নয়। বরং ঐ ব্যক্তি যদি মারা যায় তাহলেও তার মাথা এবং মুখ ঢাকা নিষেধ।[২] ইহরাম অবস্থায় সূর্যের তাপের কারণে মাথার উপর ছায়া করা জায়েয।[৩]

যে ব্যক্তি শাওয়াল মাসে হজ্ব করতে যাবে, সে হজ্বের ইহরাম না বেঁধে উমরার জন্য ইহরাম বাঁধবে।[৪] ইহরাম অবস্থায় মাথার চুল গোন্দ দ্বারা (একপ্রকার আঠা) সেঁটে দেয়া জায়েয যেন তা এলোমেলো হতে না পারে।[৫]

ইহরাম অবস্থায় কাপড়ে যদি খুলক (এক প্রকার সুগন্ধি যা জাফরানের সাথে মিশানো থাকে) লেগে থাকে তাহলে সে কাপড়কে তিন বার ধুয়ে নিবে।[৬]

ইহরাম অবস্থায় জায়তুন এবং ঘি - দ্বারা ঔষধ প্রয়োগ করা জায়েয।[৭]

মুহরেমের পথিমধ্যে কোরবানী কিনা জায়েয এবং ইহরাম অবস্থায় আংটি পরা জায়েয।[৮] যে ব্যক্তি বাড়ী হতে কোরবানীর পশু সাথে নিয়ে যাবে, সে যখন ইহরাম বাঁধার জায়গায় পৌছিবে তখন কুরবানী উট হলে তাতে চিহ্ন দিয়ে নিবে অর্থাৎ উটের কুজের ডান পার্শে একটু ক্ষত করে দিবে এবং গলায় জুতার মালা পরিয়ে দিবে এরপর ইহরাম বাধঁবে।[৯] ইহরাম অবস্থায় কোরবানীর পশুর উপর সওয়াব হওয়া জায়েয।[১০] ইহরাম অবস্থায় কাউকে পশু শিকারে কোনরূপ সহযোগিতা করা জায়েয নয়।[১১] ইহরাম বাঁধা ব্যক্তির কোন শিকারের দিকে ইঙ্গিত করে বলে দেয়া জায়েয নয়।[১২] যদি ইহরাম বাঁধা ব্যক্তিকে কেউ জীবিত

---

১. বুখারী।

২. মুসলিম, আহমাদ, নাসাঈ, ইবনে মাজা-ইবনে আব্বাস (রা.)।

৩. মুসিলম, আহমাদ- উম্মুল হুসাইন (রা.)।

৪. নায়লুল আওতার।

৫. বুখারী - হাফসা (রা.)।

৬. বুখারী - সাফওয়ান বিন ইয়ালা (রা.)।

৭. বুখারী।

৮. প্রাগুক্ত।

৯. প্রাগুক্ত।

১০ প্রাগুক্ত।

১১. বুখারী, মুসলিম - আবু হুরায়রা (রা.)।

১২. বুখারী - আবু কাতাদা (রা.)।

কোন শিকার উপহার দেয় তাহলে তা গ্রহণ করবে না।[১] ইহরাম পরিধানকারী ব্যক্তির ঔষধ গ্রহণ করা জায়েয এবং মুহরেমের প্রয়োজন বোধে শরীরে দাগ দেয়া জায়েয।[২] মুহরেম প্রয়োজন বোধে গোসল খানায় প্রবেশ করতে পারবে।[৩]

যে ব্যক্তি উমরা বা হজ্ব করার জন্য ইহরাম বাঁধার পর তার পা ভেঙ্গে গেল বা কঠিন রোগে আক্রান্ত হবে, সে ইহরাম খুলে ফেলে হালাল হয়ে যাবে এবং আগামী বছর হজ্ব করবে।[৪] যে ব্যক্তির নিয়্যত হজ্ব বা উমরা করা নয় (ব্যবসা করা বা অন্য কিছু) সে বিনা ইহরামে মক্কায় প্রবেশ করতে পারবে।[৫] ইহরাম পরা ব্যক্তির সাপ মারা জায়েয।[৬]

উমরাহ্র ইহরাম মিকাত থেকে হতে হবে এবং যে ব্যক্তি মক্কায় থাকবে সে তানয়ীমে গিয়ে ইহরাম বাঁধবে যা হেরেম শরীফের বাহিরে (এক জায়গা) অতপর সেখান হতে এসে তাওয়াফ ও সায়ী করবে। যে ব্যক্তি মক্কায় না গিয়ে বাড়ী হতে কোরবানী পাঠিয়ে দিবে তার উপর ইহরাম ওয়ালাদের মত সবকিছুই হারাম হবে না।[৭] যদি ইহরাম বাঁধা ব্যক্তি এ শর্ত করে যে, আমি যেখানেই বাধা পাব (অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে) সেখানেই ইহরাম খুলে ফেলব, তা হলে (এ শর্ত) জায়েয।[৮]

ইহরাম পরিধান কারিনী মহিলার কুসুমী ও কাল রং এর কাপড় এবং অলংকার পরিধান করা জায়েয।[৯] ইহরাম পরিধানকারী পুরুষ তার স্ত্রীকে চুমা দেয়া, স্পর্শ করা, কামভাবের সাথে ধরা হারাম। বরং কামভাবের সাথে তার দিকে তাকানও উচিৎ নয়।[১০] ইহরাম পরিধানকারী যদি নিজ শরীর বা মাথা হতে উকুন তুলে মাটিতে ফেলে দেয় তাহলে সেটা জায়েয।[১১] ইহরাম পরিধানকারীর হেরেমের এলাকার কোন গাছ কাটা বা তার কাঁটা ভাঙ্গা জায়েয নয়।[১২]

---

১. বুখারী - আবু কাতাদা (রা.)।
২. বুখারী।
৩. আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজা।
৪. মুসলিম, আবু দাউদ - জাবের (রা.)।
৫. বুখারী- ইবনে মাসউদ (রা.)।
৬. বুখারী, মুসলিম - আয়েশা (রা.)।
৭. প্রাগুক্ত।
৮. বুখারী- আয়েশা (রাঃ)।
৯. প্রাগুক্ত।
১০. ইযাহুল হুজ্জাত।
১১. বুখারী।
১২. বুখারী, মুসলিম।

মীকাত বা ইহ্‌রাম বাঁধার স্থান

মদীনা শরীফের অধিবাসীদের ইহ্‌রাম বাঁধার স্থান হলো জুল হোলায়ফা নামক স্থান (বর্তমান নাম আবয়্যারে আলী) এবং শাম বা সিরিয়ার অধিবাসীদের মীকাত হলো জুহফা নামক স্থান। নজদবাসীদের মীকাত কারনুল মানাযেল। ইয়েমেন ও ভারতবাসীদের মিকাত ইয়ালামলাম।[১] ইরাকের অধিবাসীদের মীকাত জাতে-ইরক এবং পূর্ব দেশীয়দের মীকাত হলো আকীক নামক স্থান।[২] যে ব্যক্তি যে মীকাতের অধীন সে সেখান থেকেই ইহ্‌রাম বাঁধবে। এমন কি মক্কার অধিবাসীরা মক্কাতেই ইহ্‌রাম বাঁধবে।[৩] ভারতের (উপমহাদেশের) লোকেরা ইয়ালামলাম পাহাড়ের নিকটবর্তী হলে ইহ্‌রাম বাধবে (জাহাজে হাজীদের-কে এ ব্যাপারে বলে দেয়া হয়।) ফরজ নামাযের সময় কেউ ইহ্‌রাম বাঁধলে প্রথমে নামায পড়ে নিয়ে পরে ইহ্‌রাম বাঁধবে। অন্য সময় হলে ইহ্‌রামের জন্য দুই রাকাত নফল নামায পড়বে[৪] এবং উমরাহ্‌র নিয়্যত করে বলবে,

اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ -

অর্থাৎ- হে আল্লাহ্ আমি উমরাহ্‌র উদ্দেশ্যে তোমার নিকট উপস্থিত।

অতপর এ ভাবে তালবিয়া পড়তে থাকবে-

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ - لَبَّيْكَ لاَشَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ - اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ -

অর্থাৎ- আমি তোমার জন্যই হাজির। হে আল্লাহ্ আমি তোমার খিদমতেই হাজির। তোমার কোন শরীক নাই তোমার সমীপেই আমি উপস্থিত। নিশ্চয় সমস্ত প্রশংসা নিয়ামত এবং রাজত্ব একমাত্র তোমারই জন্য তোমার কোন অংশীদার নাই।[৫] এরূপভাবে তালবিয়া হেরেম শরীফে প্রবেশ না করা পর্যন্ত কিংবা হজরে আসওয়াদকে চুম্বন না দেয়া পর্যন্ত বলতে থাকবে। তালবিয়া এভাবেও বলার বিধান রয়েছে-

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ - لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِىْ يَدَيْكَ

---

১. বুখারী, মুসলিম- ইবনে আব্বাস (রা.)।

২. আবু দাউদ।

৩. বুখারী, মুসলিম- ইবনে আব্বাস (রা.)।

৪. বুখারী, মুসলিম- ইবনে উমর (রা.)।

৫. প্রাগুক্ত।

وَالرَّغْبَاءُ اِلَيْكَ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ -

অর্থাৎ- হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকটে হাজির। তোমার খিদমতে হাজির। তোমার হুকুমের বাধ্য। সমস্ত কল্যাণ তোমারই হাতে। হে আল্লাহ! আমি তোমার দরবারে হাজির। তোমার প্রতিই আমার সমস্ত আগ্রহ এবং সমস্ত কর্ম (তোমারই জন্য)[১] লাব্বাইকা (তালবিয়া) পড়া শেষ করে এ দোয়া পড়বে-

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ رِضَاكَ وَالْجَنَّةَ وَاَسْئَلُكَ الْعَفْوَ بِرَحْمَتِكَ مِنَ النَّارِ-

অর্থাৎ- হে আল্লাহ! আমি প্রার্থনা করছি তোমার সন্তুষ্টি ও জান্নাত এবং তোমার রহমতের দ্বারা জাহান্নামের আগুন হতে পরিত্রান চাচ্ছি।[২]

যখন উঁচু বা নিচু জায়গা অতিক্রম করবে কিম্বা যানবাহনের উপর থাকবে তখনও লাব্বাইকা বলবে।[৩]

যে ব্যক্তি ইয়ালামলাম পাহাড়ের সোজায় যাবার সুযোগ পাবে না, সে পূর্বেই ইহরাম বেঁধে নিবে। কেননা ইহরাম বাঁধার স্থান (মীকাত) এর পূর্বেও ইহরাম বাঁধা জায়েয।[৪] মহিলাদের ইহরাম হচ্ছে তারা মুখের উপর নিকাব বা পর্দা রাখবে না এবং হাত-মোজা পরবে না এবং জাফরানী রংয়ের জামা পরবে না।[৫] কিন্তু গায়ের মুহরেম সামনে আসলে মুখের উপর নিকাব বা ঘোমটা দেয়া জায়েয।[৬] ইহরাম অবস্থায় সুগন্ধি লাগাবে না।[৭] স্ত্রীর সংস্পর্শ এবং সমস্ত গুনাহ হতে বিরত থাকবে। নিজেদের মাঝে ঝগড়া বিবাদ করবে না এবং নখ কাটবে না।[৮]

যদি এসব নিষেধকৃত কাজের কোন একটি কেউ করে ফেলে তাহলে ইহরাম বাতিল হয়ে যাবে না, তবে কাফ্ফারা দিতে হবে। আর কাফ্ফারা হলো ছয়জন মিসকিনকে তিন সা' পরিমাণ (প্রায় সাড়ে সাত কেজি) ফল (বা খাবার)

---

১. বুখারী, মুসলিম- ইবনে উমর (রা.)।
২. মুসনাদে শাফেয়ী- উমারা বিন খুজায়মা (রা.)।
৩. বুখারী, মুসলিম- ইবনে উমর (রা.)।
৪. বুখারী, মুসলিম- ইবনে আব্বাস (রা.)।
৫. বুখারী- আব্দুল্লাহ বিন উমর (রা.)।
৬. আবু দাউদ, ইবনে মাজা- আয়েশা (রা.)।
৭. আবু দাউদ, ইবনে মাজা।
৮. তিরমিযী।

খাওয়াবে। অথবা তিনটি রোজা রাখবে অথবা কোরবানী করবে।[১] ইহরাম অবস্থায় নিজেও বিবাহ করবে না বা অন্য কাউকে বিয়ে করাবে না কিম্বা কাউকে বিয়ের প্রস্তাবও দিবে না।[২] ইহরামের অবস্থায় শিকার করবে না। কেহ যদি শিকার করে ফেলে তাহলে দুইজন আলেমের রায়ের ভিত্তিতে শিকার করা পশুর সমপরিমাণ (কাফ্ফারা হিসেবে) দিবে।[৩] অন্যের শিকার করা জন্তুও খাবে না।

কিন্তু যদি শিকারী ব্যক্তি মুহরেম না হয় এবং ইহরাম বাঁধা ব্যক্তির উদ্দেশ্যে শিকার না করে থাকে তাহলে তা খেতে পারবে।[৪] মুহরেম ব্যক্তির জন্য নদী বা সমুদ্রের শিকার জায়েয।[৫] মুহরেম ব্যক্তির ফুলের ঘ্রাণ নেয়া, আয়না দেখা, আংটি পরা, হিমানী ব্যবহার, কোমরে বেল্ট বাধা এবং কাপড় চোপড় (ইহরামের) পরিবর্তন করা জায়েয। যখন কাবার নিকটে পৌছবে তখন সম্ভব হলে মক্কায় প্রবেশের জন্য গোসল করবে।[৬] যখন কাবা শরীফের উপর দৃষ্টি পড়বে তখন এ দোয়া পড়বে-

اَللّٰهُمَّ زِدْ بَيْتَكَ هٰذَا تَشْرِيْفًا وَّتَعْظِيْمًا وَّتَكْرِيْمًا وَّمَهَابَةً ـ

অর্থাৎ- হে আল্লাহ! তুমি তোমার এ ঘরের সম্মান, মর্যাদা, সৌন্দর্য ও প্রভাব আরও বৃদ্ধি কর।[৭] এ দোয়া পড়ার বিধানও এসেছে-

اَللّٰهُمَّ زِدْ هٰذَا الْبَيْتَ تَشْرِيْفًا وَّتَعْظِيْمًا وَّمَهَابَةً وَّزِدْ مِنْ شَرَفِهٖ وَكَرَمِهٖ مِمَّنْ حَجَّهُ وَاعْتَمَرَهُ تَكْرِيْمًا وَّتَشْرِيْفًا وَبِرًّا

অর্থাৎ- হে আল্লাহ! তুমি তোমার এ ঘরের সম্মান, মর্যাদা, সৌন্দর্য এবং প্রভাব আরও বৃদ্ধি কর এবং যে ব্যক্তি তোমার এ ঘরের সম্মান ও মর্যাদা ও নেকীর সাথে হজ্ব এবং উমরা করে তার সম্মান, মর্যাদা বৃদ্ধি করে দাও।[৮]

যখন মক্কায় প্রবেশ করবে তখন মুয়াল্লার দিকে হতে প্রবেশ করবে।[৯]

---

১. সূরা বাকারা ঃ ২৪ রুকূ, বুখারী, মুসলিম।
২. মুসলিম- উসমান (রা.)।
৩. সূরা আল মায়েদা ঃ ১৩ নং রুকূ।
৪. বুখারী, মুসলিম- আবু কাতাদা (রা.)।
৫. সূরা আল মায়েদা ঃ ৯৬
৬. বুখারী, মুসলিম- না'ফে (রা.)।
৭. মুসনাদে শাফেয়ী- ইবনে জুরাইম (রা.)।
৮. প্রাগুক্ত।
৯. বুখারী, মুসলিম- আয়েশা (রা.)।

বায়তুল্লাহ্ শরীফে এসেই হজরে আসওয়াদকে চুমা দিবে এবং ডান দিক হতে তওয়াফ শুরু করবে।[১]

যখন রুকনুল ইয়ামানীতে পৌছবে (যা কাবার পশ্চিম দক্ষিণ দিকের কর্ণারের নাম) তখন তাতে হাত দিয়ে চুমা দিবে।[২] রুকনে ইয়ামানী ও হজরে আসওয়াদের মধ্যবর্তী স্থানে এই দোয়া পড়বে-

رَبَّنَا اٰتِنَا فِىْ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ-

অর্থাৎ- হে আমাদের রব! আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ ও আখেরাতে কল্যাণ দান কর এবং আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি হতে বাঁচাও।[৩]

এভাবে হজরে আসওয়াদ পর্যন্ত এক তওয়াফ পুরা হবে। (এভাবে সাত তওয়াফ পূর্ণ করবে)।

প্রথম তিন তওয়াফ বুক ফুলিয়ে দ্রুততার সাথে চলবে। কিন্তু রুকনে ইয়ামানী এবং হজরে আসওয়াদের মধ্যেবর্তী স্থানে নয়। বাকী চার তওয়াফে আস্তে আস্তে চলবে।[৪] তাওয়াফ করার সময় চাদর ডান হাতের বগলের নিচ দিয়ে নিয়ে বাম কাঁধের ওপর রাখবে (এটাকে ইজতিবা বলা হয়)।[৫] প্রত্যেক তওয়াফে হজরে আসওয়াদকে চুমা দিবে এবং রুকনে ইয়ামানীকে হাত দিয়ে স্পর্শ করবে।[৬]

যদি ভিড়ের কারণে চুমা দেয়া সম্ভব না হয়, তাহলে লাঠির দ্বারা বা কোন কিছুর দ্বারা স্পর্শ করিয়ে তাতে চুমা দিবে। (অথবা হাত দিয়ে ইশারা করবে)।[৭] যখন সাত তওয়াফ দেয়া সমাপ্ত করবে তখন মাকামে ইব্রাহীমে দাঁড়িয়ে এ আয়াত পাঠ করবে-

وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى - (البقرة : ١٢٥)

অর্থাৎ- তোমরা মাকামে ইব্রাহীমকে নামাযের জায়গা হিসেবে গ্রহণ কর। (সূরা বাকারা ঃ ১২৫)

---

১. মুসলিম- জাবের (রা.)।

২. বুখারী, নায়লুল আওতার- ইবনে আব্বাস (রা.)।

৩. আবু দাউদ- আব্দুল্লাহ ইবনে সায়েম (রা.)।

৪. বুখারী, মুসলিম- ইবনে আব্বাস (রা.)।

৫. আহমাদ, আবু দাউদ- ইবনে আব্বাস (রা.)।

৬. বুখারী- ইবনে উমর (রা.)।

৭. বুখারী, আহমাদ।

এখানে দুই রাকাত নামায পড়বে। প্রথম রাকাতে (সূরা ফাতিহার পর) সূরা কাফিরুন পড়বে এবং দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ইখলাস পড়বে এবং কেরাত স-শব্দে পড়বে।[১]

অতপর সাফা পাহাড়ের পথ ধরে গিয়ে তার উপর উঠে দাড়িয়ে তিনবার এ দোয়া পাঠ করবে-

لَا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيرٌ- لَا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ صَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الاَحْزَابَ وَحْدَهُ-

অর্থাৎ- আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। তিনি একক। তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। তিনি একক। তিনি তার বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং শত্রুর দলসমূহকে তিনি একাই পরাজিত করেছেন।[২] অথবা এ দোয়াটি পড়বে কিম্বা দোয়া দুটিই পড়বে-

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ قُلْتَ اُدْعُوْنِىْ اَسْتَجِبْ لَكُم وَاِنَّكَ لَاتُخْلِفُ الْمِيْعَادَ وَاِنِّىْ اَسْئَلُكَ كَمَا هَدَيْتَنِىْ لِلاِسْلَامِ اَنْ لَا تَنْزِعَهُ مِنِّىْ حَتّٰى تَوَفَّنِىْ وَاَنَا مُسْلِمٌ-

অর্থাৎ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় তুমি বলেছ, তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব এবং নিশ্চয় তুমি ভঙ্গ কর না ওয়াদা এবং আমি প্রার্থনা করছি, যেমন তুমি আমাকে ইসলামের পথে হিদায়াত দান করেছ, তেমনি তা আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিওনা, আমাকে যখন মৃত্যু দিবে তখন যেন আমি মুসলমান থাকি (অর্থাৎ মুসলমান হিসেবে মৃত্যুবরণ করতে পারি)।[৩]

অতপর মারওয়া পাহাড়ের দিকে চলবে এবং মিলে-আখজার বা সবুজ চিহ্নিত স্থানের মাঝে দ্রুত চলবে।

অতপর যখন মারওয়া পাহাড়ের উপর উঠবে তখন সাফা পাহাড়ের উপর যে

১. মুসলিম, আহমাদ, নাসাঈ- জাবের (রা.)।

২. আহমাদ, নাসাঈ- জাবের (রা.)।

৩. মুনতাকাল আখবার- জাবের (রা.)।

দোয়া পড়া হয়েছিল তা পড়বে।[১] (এটা এক সা'য়ী বা দৌড় হল।) এইভাবে সাত সা'য়ী পূর্ণ করবে, যা শেষ হবে মারওয়া পাহাড়ের উপর।

সাফা এবং মারওয়া পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে এ দোয়া পড়বে-

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ اِنَّكَ اَنْتَ الاَعَزُّ الاَكْرَمُ -

অর্থাৎ- হে আমার রব! তুমি ক্ষমা কর এবং রহম কর। নিশ্চয় তুমিই সবচেয়ে সম্মানিত মহিমান্বিত।[২]

যখন সাত সায়ী বা দৌড় সম্পন্ন হবে তখন উমরা পূর্ণ হবে। তখন এহরাম খুলে ফেলবে মাথার চুল কাটবে এবং সাধারণ কাপড় পরবে এবং মক্কায় অবস্থান করবে।[৩] এ সময় দিনে বা রাতে যখন ইচ্ছা তওয়াফ করবে ও মুলতাজিম (হজরে আসওয়াদ ও কাবার দরজার মাঝে একটি দেওয়ালের নাম) এবং হাতিম (কাবার সংলগ্ন উত্তর দিকে এক স্থানের নাম যা সামান্য উচু দেয়াল দিয়ে ঘেরা রয়েছে) এর মাঝে গিয়ে দোয়া করবে। অতপর যে দিন (জিলহজ্ব মাসের) আট তারিখ হবে (যাকে ইয়াওমুততারবিয়া বলা হয়ে থাকে) সেদিন হজ্বের ইহরাম বাধবে এবং বলবে- لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ بِالْحَجِّ অর্থাৎ- 'হে আল্লাহ্! আমি তোমার দরবারে হজ্ব করার জন্য উপস্থিত।' লাব্বাইকা বলতে বলতে মিনার দিকে যাবে এবং সেথায় পৌঁছে যোহর, আসর, মাগরিব, এশা এবং ফজরের নামায পড়বে।[৩]

অতপর সূর্যোদয়ের পর সেখান থেকে লাব্বাইকা (তাকবীর) পড়তে পড়তে আরাফায় গিয়ে পৌঁছবে এবং তথায় অবস্থান করবে। সূর্য্য ঢলার পর (মসজিদে) খুতবা শুনবে এবং যোহর আসর নামায একত্রে (জমা করে) পড়বে। অতপর রাসূলের (সা.) খাস অবস্থান যা জাবালুর-রহমাত নামে পরিচিত সেখানে গিয়ে থাকবে।[৪] সেখানে যাওয়া সম্ভব না হলে আরাফার যে কোন স্থানে অবস্থান করবে[৫] এবং তথায় এসব দোয়া পড়বে-

প্রথম দোয়া ঃ

لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ -

১. আহমাদ, নাসাঈ- জাবের (রা.)।
২. মুনতাকাল আখবার- জাবের (রা.)।
৩. মুসলিম- জাবের (রা.)।
৪. মুসলিম, মুনতাকাল আখবার- আব্দুল্লাহ ইবনে রফী (রা.)।
৫. মুসলিম, আহমাদ. আবু দাউদ।

অর্থাৎ- আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই। তিনি একক। তার কোন শরীক নেই। তারই জন্য রাজত্ব ও প্রশংসা এবং তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।[১]

দ্বিতীয় দোয়া ঃ

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَالَّذِىْ تَقُوْلُ وَخَيْرًامِمَّا نَقُوْلُ -

অর্থাৎ- হে আল্লাহ্! সমস্ত প্রশংসা তোমারই জন্য যেমনটা তুমি ইরশাদ করেছ এবং আমরা যা বলি তার চেয়েও উত্তম।[২]

তৃতীয় দোয়া ঃ

اَللّٰهُمَّ لَكَ صَلٰوتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ وَاِلَيْكَ مَاٰبِىْ وَلَكَ رَبِّ تُرَاثِىْ -

অর্থাৎ- হে আল্লাহ্! আমার নামায, আমার কোরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ সবই তোমার জন্য এবং তোমার দিকেই আমার প্রত্যাবর্তন এবং হে আমার রব! তোমার জন্যই মিরাস।[৩]

চতুর্থ দোয়াঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ وَسْوَاسِ الصَّدْرِ وَشَتَّاتِ الاَمْرِ-

অর্থাৎ- হে আল্লাহ্! আমি আশ্রয় চাচ্ছি তোমার নিকট বক্ষের কুমন্ত্রণা হতে এবং কর্মের পেরেশানী হতে।[৪]

পঞ্চম দোয়া ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَاتَجِئُ بِهِ الرِّيْحُ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَجِىْءُ بِهِ الرِّيْحُ لاَ اِلٰهَ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ-

অর্থাৎ- হে আল্লাহ! আমি প্রার্থনা করছি সে সবের কল্যাণ যা বাতাস বয়ে

---

১. মুসলিম- জাবের (রা.)।

২. তিরমিযী, মুয়াত্তা- আমর ইবনে শোয়াইব (রা.)।

৩. তিরমিযী [illegible] ইব[illegible] [illegible]', বায়হাকী।

৪ হিজবুল মাকবুল

৮—

আনে এবং তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি সে সব হতে, যা বাতাস বয়ে আনে। আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। তিনি একক। তার কোন শরীক নাই। তাঁরই জন্য সমস্ত রাজত্ব, প্রশংসা। তিনিই জীবন দান করেন এবং তিনিই মরণ দেন এবং তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।[১]

ষষ্ঠ দোয়া ঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِىْ قَلْبِىْ نُوْرًا وَّفِىْ سَمْعِىْ نُوْرًا وَّفِىْ بَصَرِىْ نُوْرًا وَّ فِىْ وَجْهِىْ نُوْرًا -

অর্থাৎ- হে আল্লাহ। আমার অন্তরকে, আমার কানকে, আমার চক্ষুকে এবং আমার চেহারাকে আলোকিত কর।[২]

সপ্তম দোয়া ঃ

اَللّٰهُمَّ اشْرَحْ لِىْ صَدْرِىْ وَيَسِّرْلِىْ اَمْرِىْ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ وَسَاوِسِ الصَّدْرِ وَشَتَّاتِ الاَمْرِ وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ-

অর্থাৎ- হে আল্লাহ! আমার জন্য আমার বক্ষকে খুলে দাও এবং আমার কাজকে সহজ করে দাও। আমি আশ্রয় চাচ্ছি তোমার নিকট বক্ষের সবধরনের কুমন্ত্রণা হতে, কাজের পেরেশানী হতে এবং কবরের ফিতনা হতে।[৩]

অষ্টম দোয়া ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا يَلِجُ فِى اللَّيْلِ وَمِنْ شَرِّ مَايَلِجُ فِى النَّهَارِ وَمِنْ شَرِّمَا تَهُبُّ بِهِ الرِّيْحُ وَشَرِّ بَوَائِقِ الدَّهْرِ لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ اِنَّمَا الْخَيْرُ خَيْرُ الاٰخِرَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ -

---

১. ইবনে আবী শায়বা- হযরত আলী (রা.)।

২. হিজবুল মাকবুল।

৩. প্রাগুক্ত।

অর্থঃ হে আল্লহ! আমি আশ্রয় চাচ্ছি তোমার নিকট রাত এবং দিনের সর্ব প্রকার অনিষ্ট অপকর্ম হতে এবং ঐ অনিষ্ট হতে যা বায়ুমন্ডলে বয়ে আনে এবং যুগের বিপদাপদ হতে। আমি হাজির হে আল্লহ! আমি তোমার খিদমতে উপস্থিত। নিশ্চয়ই প্রকৃত কল্যাণ হচ্ছে পরকালের কল্যাণ। আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ এবং আল্লাহর জন্যই সমস্ত প্রশংসা। আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ এবং আল্লাহর জন্যই সমস্ত প্রশংসা । আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ এবং আল্লাহর জন্যই সমস্ত প্রশংসা। আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি একক। তার কোন শরীক নেই। তারই জন্য রাজত্ব ও সমস্ত প্রশংসা তারই।[১]

নবম দোয়া ঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَّبْرُوْرًا وَّذَنْبًا مَّغْفُوْرًا ـ

অর্থাৎ- হে আল্লাহ! এটাকে তুমি হজ্জে মাকবুল কর এবং গুনাহ মাফ কর।[২]

দশম দোয়া ঃ

اَللّٰهُمَّ اهْدِنَا بِالْهُدٰى وَزَيِّنَّا بِالتَّقْوٰى وَاغْفِرْ لَنَا فِى الاٰخِرَةِ وَالاُوْلٰى ـ

অর্থাৎ- হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে হিদায়াতের পথ দেখাও এবং আমাদের তাকওয়ার দ্বারা সুশোভিত কর এবং আমাদেরকে ইহকালে ও পরকালে ক্ষমা কর।[৩]

একাদশ দোয়া ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ رِزْقًا حَلاَلاً طَيِّبًا مُبَارَكًا ـ

অর্থাৎ- হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে হালাল, পূতপবিত্র, বরকতপূর্ণ রিজিক প্রার্থনা করছি।[৪]

দ্বাদশ দোয়া ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ اَمَرْتَنِىْ بِالدُّعَاءِ وَلَكَ الاِجَابَةُ وَاِنَّكَ لاَتُخْلِفُ الْمِيْعَادَ وَلاَ تَنْكِسُ عَهْدَكَ ـ

---

১. তবারানী।

২. ইবনে আবী শায়বা।

৩. হিজবুল মাকবুল।

৪. প্রাগুক্ত।

অর্থাৎ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় তুমি আমাকে দোয়া করার জন্য আদেশ করেছ এবং তোমার কাজ হচ্ছে দোয়া কবুল করা। নিশ্চয় তুমি খেলাফ কর না অঙ্গীকার এবং ভঙ্গ করা না তোমার ওয়াদা।[১]

ত্রয়োদশ দোয়া ঃ

اَللّٰهُمَّ مَا اَحْبَبْتَ مِنْ خَيْرٍ فَحَبِّبْهُ اِلَيْنَا وَيَسِّرْهُ لَنَا وَمَا كَرِهْتَ مِنْ شَرٍّ فَكَرِّهْهُ اِلَيْنَا وَلَا تَنْزِعْ مِنَّا الاِسْلَامَ بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا - رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ -

অর্থাৎ- হে আল্লাহ! কল্যাণকর যা কিছু তুমি পছন্দ কর তা আমাদের নিকট পছন্দনীয় করে দাও এবং ক্ষতিকর যা কিছু তুমি অপছন্দ কর তা আমাদের নিকট অছন্দনীয় করে দাও এবং আমাদেরকে তা হতে বিরত রাখ। আর হেদায়েত দেয়ার পর ইসলামকে আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিও না। হে আমাদের প্রভূ! আমাদেরকে দুনিয়াতে ও আখেরাতে কল্যাণ দান কর এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন হতে পরিত্রাণ দাও।[২]

চর্তুদশ দোয়া ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ بِهٖ نَبِيُّكَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ بِهٖ نَبِيُّكَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْلَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ رَبِّ اجْعَلْنِىْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِىْ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ - رَبَّنَا اغْفِرْ لِىْ وَلِوَالِدَىَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ -

رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِىْ صَغِيْرًا - رَبَّنَا اغْفِرَ لَنَا

১. হিজবুল মাকবুল।

২. তবারানী ইবনে উমর (রা.)।

وَلاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْ   بِالاِيْمَانِ وَلاَ تَجْعَلْ فِىْ قُلُوْبِنَا غِلاًّ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَ   رَؤُوْفٌ رَّحِيْمٌ - رَبَّنَا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ وَتُبْ   بَنَا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ - وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِ . الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ -

অর্থাৎ- হে আল্লাহ! তোমার নবী (সা.; তোমার নিকট যে কল্যাণ চেয়েছেন আমি সেই কল্যাণ প্রার্থনা করছি। আর তোমার নবী (সা.) তোমার নিকট যে অকল্যাণ-অমঙ্গল হতে আশ্রয় চেয়েছেন আমি তা হতে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। হে আমাদের প্রভূ! আমরা আমাদের জীবনের উপর জুলুম করেছি, এখন তুমি যদি আমাদের ক্ষমা এবং রহম না কর তাহলে আমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্গত হবো। হে রব! আমাকে ও আমার বংশধরকে নামায প্রতিষ্ঠাকারী হিসেবে গড়ে তুল। হে আমাদের রব! তুমি দোয়া কবুল কর। হে আমাদের প্রভু! আমাকে, আমার পিতামাতাকে ও মুমিনদেরকে হিসাবের দিন ক্ষমা করিও। হে রব! তুমি তাদের প্রতি (পিতামাতার প্রতি) করুনা কর যেমন তারা আমার প্রতি করুনা করেছিল ছোট অবস্থায় প্রতিপালন করার সময়। হে আমাদের রব! আমাদের ক্ষমা কর এবং যে সব ভাই আমাদের পূর্বে ঈমানের সাথে চলে গেছে তাদের ক্ষমা কর এবং যারা ঈমান এনেছে তাদের ব্যাপারে আমাদের অন্তরে কোন গ্লানি রেখ না, হে আমাদের প্রভূ! তুমি নিশ্চয় সহিষ্ণু দয়ালু। হে আমাদের রব! নিশ্চয় তুমি শ্রবনকারী ও সবকিছুর জ্ঞাতা এবং তুমি আমাদের তওবা কবুল কর। নিশ্চয় তুমি তাওবা কবুলকারী দয়ালু। (কারও) কোন সাধ্য ও শক্তি নাই (ভাল কাজ করার বা মন্দ কাজ হতে বিরত থাকার) মহান আল্লাহ পাকের মর্জি ব্যতীত।[১]

পঞ্চদশ দোয়া ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ تَعْلَمُ وَتَرٰى مَكَانِىْ وَتَسْمَعُ كَلاَمِىْ وَتَعْلَمُ سِرِّىْ وَعَلاَنِيَتِىْ وَلاَ يَخْفٰى عَلَيْكَ شَيْئٌ مِنْ اَمْرِىْ وَاَنَا الْبَائِسُ الْفَقِيْرُ الْمُسْتَغِيْثُ الْمُسْتَجِيْرُ الْوَجِلُ الْمُشْفِقُ

১. শরহে মানাসেক, হিজবুল মাকবুল- ইবনে জুবাইর (রা.)

الْمُقِرُّ الْمُعْتَرِفُ بِذَنْبِي اَسْأَلُكَ مَسْأَلَةَ الْمِسْكِيْنِ وَابْتَهِلُ اِلَيْكَ ابْتِهَالَ الْمُذْنِبِ الذَّلِيْلِ وَاَدْعُوْكَ دُعَاءَ الْخَائِفِ الضَّرِيْرِ مَنْ خَضَعَتْ لَكَ رَقْبَتُهُ وَفَاضَتْ لَكَ عَيْنَاهُ وَنَحِلَ لَكَ جَسَدُهُ وَرَغِمَ لَكَ اَنْفُهُ ـ

অর্থাৎ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় তুমি জান এবং দেখছ আমার অবস্থান এবং শুনছ আমার কথা এবং জান আমার গোপন ও প্রকাশ্য কাজকর্ম এবং আমার কোন কাজই তোমার নিকট গোপন নয়। আর আমি বিপদগ্রস্থ, ভিক্ষুক, আবেদনকারী, আশ্রয়কামী, ভীত, সন্ত্রস্ত আমার অপরাধ স্বীকার করছি, তোমার নিকট ভিখারীর মত প্রার্থনা করছি এবং লজ্জিত অপরাধীর মত কাকুতি মিনতি করছি এবং তোমার নিকট বিপদগ্রস্ত ভীত ব্যক্তির ন্যায়, যে তোমার দরবারে মাথা নত করেছে এবং তার চোখ দিয়ে পানি ঝরছে, তোমার জন্য শরীরকে কৃষ্ণকায় করেছে এবং তোমার জন্য তার নাককে ধুলায় ধুসরিত করেছে, তার মত দোয়া করছি।[১]

ষোড়শ দোয়া ঃ

اَللّٰهُمَّ لاَ تَجْعَلْنِي بِدُعَاءِكَ رَبِّ شَقِيًا وَّكُنْ بِيْ رَؤُوْفًا رَّحِيْمًا يَاخَيْرَ الْمَسْئُوْلِيْنَ يَا خَيْرَ الْمُعْطِيْنَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ اٰمِيْنَ ـ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ ـ (مائة مرة)

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ـ (السورة مائة مرة)

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ وَعَلَيْنَا

১. তবারানী- ইবনে আব্বাস (রা.)।

مَعَهُمْ - (مائة مرة)

অর্থাৎ- হে আল্লাহ! তুমি আমাকে এমন করো না যে, তোমাকে ডাকার পরও অভাগা থাকি এবং আমার প্রতি সহিষ্ণু এবং করুনাশীল হও, হে প্রার্থনাকারীদের কল্যাণদাতা, হে উত্তম দাতা, হে দয়ার সাগর! এবং সমস্ত প্রশংসা একমাত্র মহান রব্বুল আলামীনের জন্য। (হে আল্লাহ) তুমি আমার এ প্রার্থনা কবুল কর। আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। তিনি একক। তার কোন শরীক নেই। তারই জন্য সমস্ত রাজত্ব ও প্রশংসা এবং তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতা বান। (একশতবার)। সূরা ইখলাস (একশত বার)। হে আল্লাহ! মুহাম্মদ (সঃ) ও তার বংশধরদের উপর করুনা বর্ষণ কর, যেমন ইব্রাহীম ও তার বংশধরদের উপর করুনা বর্ষণ করেছ। নিশ্চয় তুমি খুবই প্রশংসনীয় এবং সম্মানিত এবং এদের সাথে আমাদের উপরও করুনা বর্ষণ কর (একশত বার)। সুর্যাস্ত পর্যন্ত এসব দোয়া পড়তে থাকবে।[১]

আরাফাতে দন্ডায়মান হওয়া (অবস্থান করা) হজ্বের একটি প্রধান রুকন। যে ব্যক্তির এ রুকন বাদ পড়বে তার হজ্ব হবে না।[২]

যে ব্যক্তি জিলহজ্ব মাসের দশ তারিখের ফজরের পূর্বেই আরাফাতের ময়দানে দন্ডায়মান হতে পারবে তার হজ্ব পুরো হয়ে যাবে।

আরাফার মাঠে যে কোন স্থানে অবস্থান হলেই ফরজ আদায় হয়ে যাবে।[৩]

রাসূলুল্লাহ (সা.) এর অবস্থানের নির্দিষ্ট জায়গায় (অর্থাৎ জাবালে রহমাতে) অবস্থান করা সুন্নাত।[৪] সূর্যাস্তের পর আরাফার মাঠ হতে 'লাব্বাইকা' বলতে বলতে মুজদালেফায় এসে পৌছাবে এবং মাগরিব ও এশার নামায এক আযান এবং দুই ইকামতে সুন্নাত ছাড়া জমা করে পড়বে এবং সেথায় উক্ত রাত্রি যাপন করবে।[৫] অতপর সুবহে সাদেক শুরু হতেই এক আযান ও এক একামতের সাথে ফজরের নামায পড়বে। অতপর সেখান হতে যানবাহনে আরোহন করে বা পায়ে হেঁটে মাশআ'রুল হারামে (মুজদালেফার একটি পাহাড়) এসে পৌঁছবে এবং কিবলামুখী হয়ে দোয়া, তাকবীর এবং তাহলীল পড়তে থাকবে। সেখানে

---

১. বায়হাকী শোয়াবুল ঈমান।

২. আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজা- ইমর ইবনে জুবাইর (রা.)।

৩. আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ।

৪. মুসলিম-জাবের (রা.)।

৫. প্রাগুক্ত।

পূর্বাকাশ খুব ফর্সা হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে এবং সূর্যোদয়ের পূর্বেই মিনার দিকে চলতে শুরু করবে।[১] আরোহী হলে সেটাকে দ্রুত চালাবে না বরং আস্তে আস্তে চালাবে। তবে যদি কোথাও ফাঁকা জায়গা পাওয়া যায় তাহলে সামান্য জোরে চালাবে এবং যখন বাতনে মাহশারে পৌছিবে (যা মিনার পার্শ্বে একটি প্রান্তর, তথায় আসহাবে ফীল বা হস্তীওয়ালা আব্রাহা ও তার সাথীরা ধ্বংস হয়েছিল) তখন সোয়ারীকে দ্রুত চালাবে।[২] যদি মহিলা এবং বাচ্চা কাচ্চাদেরকে সুবহে সাদেকেই মিনার পথে রওয়ানা করিয়ে দেয়া হয় তাহলে তা জায়েয। যেন মহিলারা মিনায় গিয়ে ভিড় এড়াবার ভয়ে সূর্যোদয়ের পূর্বেই কংকর (পাথর) মারার কাজ সমাধা করতে পারে। পথিমধ্যে সাতটি কংকর সংগ্রহ করে নিবে।[৩] (কেউ কেউ সব কয়দিনের জন্যই তথা হতে কংকর সংগ্রহ করে নেয়)।

এ পথ দিয়ে জামরায়ে আকাবাতে এসে (যা মক্কার দিকে অবস্থিত) সূর্যোদয়ের পর কংকর মারবে এভাবে যেন মিনা ডান দিকে এবং কা'বা শরীফ বাম দিকে থাকে এবং প্রত্যেক কংকর মারার সময় তাকবীর বলবে এবং এ দোয়া পড়বে।

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَّبْرُوْرًا وَّذَنْبًا مَّغْفُوْرًا ـ

অর্থাৎ- হে আল্লাহ! তুমি এ হজ্জ কবুল কর এবং যাবতীয় গুনাহ-রাশিকে মাফ কর।[৪] এখন হতে লাব্বাইকা বলা বন্ধ করবে।[৫] এর স্থলে মিনার দিনগুলিতে তকবীর (ঈদের তকবীর) বলতে থাকবে।[৬] এই দিন অন্যান্য জামরাতে (পাথর মারার স্থানে) পাথর মারবে না।[৭]

অতপর মসজিদে খাইফে এসে ঈদের খুতবা শুনবে এবং নামাযান্তে কুরবানী করবে।[৮] কুরবানীর পশু ছাগল হলে দুই বছরের নির্দোষ ছাগাল, দুম্বা এক বছর বয়সের এবং উট পাঁচ বছর বয়সের হতে হবে।[৯]

---

১. বুখারী, মুসলিম- হিশাম বিন উরওয়া (রা.)।

২. মুসলিম।

৩. প্রাগুক্ত।

৪. বুখারী, মুসলিম।

৫. বুখারী, মুসলিম- ইবনে মাসউদ (রা.)।

৬. আহমাদ- ইবনে মাসউদ (রা.)।

৭. বুখারী, মুসলিম- উসামা বিন জায়েদ (রা.)।

৮. আহমাদ, আবু দাউদ- হেরমাস বিন জিয়াদ (রা.)।

৯. মুসলিম।

উট ও গরুতে সাতজন পর্যন্ত লোক একত্রে শরীফ হয়ে কুরবানী দিতে পারে।[১] কুরবানীর চামড়া এবং ঝুল (পশুর গায়ে বা পিঠে যে সব জিনিস থাকে) কসাইকে মজুরী হিসেবে দিবে না। বরং তা সাদকা করবে।[২]

অতপর মাথার চুল নাড়া করবে বা তা খাটো করবে।[৩] কিন্তু মহিলারা শুধুমাত্র চুল (চুলের আগা) সামান্য কাটবে।[৪] এখন এর জন্য একমাত্র স্ত্রী সহবাস ছাড়া যা কিছু মুহরেমের উপর হারাম ছিল তা হালাল হয়ে গেল এবং স্ত্রী সহবাস করা তওয়াফে জিয়ারতের পর হালাল হবে।[৫] অতপর তওয়াফে জিয়ারতের জন্য কাবা শরীফ যাবে (তওয়াফে যিয়ারতকে তওয়াফে কাবা, তওয়াফে ফরজ বলা হয়ে থাকে। এটা হজ্বের একটি বড় ফরজ ও গুরুত্বপূর্ণ রুকন।) এবং রীতিমত তওয়াফ করবে এবং সাফা মারওয়ার মাঝে সা'য়ী করবে এবং জমজমের পানি পান করবে।[৬]

যদি কেহ কংকর নিক্ষেপের পুর্বে মাথা মুন্ডান করে বা কুরবানী করে কিম্বা কাবা শরীফে তওয়াফের জন্য যায় তাহলে কোন অসুবিধা নেই।[৭] কিন্তু উল্লেখিত তারতীব অনুযায়ী (ক্রমানুসারে) কাজগুলি সম্পন্ন করাই সুন্নাত।)

অতপর সেদিনই মিনায় প্রত্যাবর্তন করবে এবং তথায় তিনদিন থাকবে। প্রতিদিন সূর্য ঢলার পর তিন জামারাতে কংকর নিক্ষেপ করবে। প্রথম জামরাতে পাথর মেরে তার পার্শবর্তী স্থানে দাঁড়িয়ে হাত উঠিয়ে আল্লাহর দরবারে কাকুতি মিনতির সাথে দোয়া করবে। এভাবেই দ্বিতীয় জামরাতে কংকর নিক্ষেপ করবে। তৃতীয় জামরাতে কংকর মেরে আর দাঁড়াবে না।

অতপর ১৩ই জিলহজে মক্কা চলে আসবে এবং সেখানে যতদিন ইচ্ছা অবস্থান করবে।[৮] আবার যখন বাড়ী আসার বা মদিনা যাবার ইচ্ছা করবে তখন এক তওয়াফ করবে (এটাকে তওয়াফে বেদা বলা হয়।) হায়েযের অবস্থায় মহিলাদের জন্য এ তওয়াফ করা মাফ। এ তওয়াফে সাফা মারওয়াতে সায়ী করতে হবে না

---

১. বুখারী, মুসলিম- হযরত আলী (রা.)।
২. বুখারী, মুসলিম- আনাস (রা.)।
৩. আবু দাউদ, দারেমী।
৪. শরহিসসুন্নাহ- আয়েশা (রা.)।
৫. বুখারী, মুসলিম- ইবনে উমর (রা.)।
৬. মুসলিম- জাবের (রা.)।
৭. বুখারী- ইবনে উমর (রা)।
৮. মুসলিম- ইবনে উমর (রা.)।

এবং খুব দ্রুততার সাথে তওয়াফ করতে হবে না[১] (এটা হচ্ছে তামাত্তুর বিবরণ)।

হজ্জে মুফরাদ করলে ইহরাম বাঁধার জায়গা হতে নিয়মমত হজ্জের ইহরাম এবং উচ্চস্বরে لَبَّيْكَ بِالْحَجِّ বাঁধবে বলবে।[২]

মক্কা শরীফে এসে নিয়ম মত তওয়াফ করবে এবং সাফা ও মারওয়ার মাঝে সা'য়ী করবে এবং (এহরাম খুলে) হালাল হবে না। অতপর ৮ই জিলহজ্জে মিনায় যাবে এবং আরাফার কাজ সমাপ্ত করে ১০ই জিলহজ্জে মক্কায় তওয়াফে জিয়ারত করবে এবং সাফা ও মারওয়ার মাঝে সা'য়ী করবে। এর মাঝে ও হজ্জে তামাত্তুর মাঝে পার্থক্য হচ্ছে এতে হজ্ব হতে ফারেগ হয়ে উমরা করবে এবং হজ্জে তামাত্তুতে প্রথমে উমরা করে হালাল হয়ে যাবে অতপর ৮ই জিলহজ্জে নতুন করে ইহরাম বেঁধে হজ্ব করবে এবং এতে কুরবানী করা ওয়াজিব।[৩]

হজ্জে কেরানে হজ্ব ও উমরার এক সাথেই নিয়্যত করবে এবং দুইটার জন্যই এহরাম বেঁধে থাকবে হজ্ব সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত। হজ্ব সমাপ্ত করার পর ইহরাম খুলবে।[৪]

হজ্জের আরকানের বিবরণ

হজ্জের আরকান হচ্ছে তিনটি। প্রথমতঃ মিকাত হতে ইহরাম বাঁধা। দ্বিতীয়তঃ আরাফাতে দন্ডায়মান হওয়া ১০ই জিলহজ্জের সুবহে সাদেকের পুর্বেই, যদিও তা এক ঘন্টার জন্যও হয়। তৃতীয়তঃ তাওয়াফে জিয়ারত করা। জমহুরে উলামা সাফা ও মারওয়ার সা'য়ীকেও রুকন বলে পরিগণিত করেছেন। যদি এসব আরকানের মাঝে কোন রুকন বাদ পড়ে যায় তাহলে হজ্ব হবে না।[৫]

মদীনার হেরেমের ফজিলত

মক্কা শরীফ যেমন পবিত্র, মদীনাও তেমনি পবিত্র। মক্কা শরীফের মত মদীনাকেও সম্মান ও মর্যাদা দিতে হবে। মদীনাতেও একে অপরের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করা, রক্তপাত করা, শিকার করা এবং গাছপালা কাটা জায়েয নয়। তবে একমাত্র প্রাণীর খাদ্য স্বরূপ গাছপালার পাতা কাটা জায়েয।[৬]

---

১. বুখারী, মুসলিম।
২. বুখারী- জাবের (রা.)।
৩. বুখারী- ইবনে উমর (রা.)।
৪. আহমাদ, তিরমিযী- ইবনে আব্বাস (রা.)।
৫. শরহে সহীহ মুসলিম।
৬. মিশকাত।

মদীনার ফলমুলের ফজিলত

মদীনার ফলমুলে মক্কার ফলমুল হতে দ্বিগুণ বরকত।[১] মদীনার এক সের আনাজ-ফল যতজন লোকের জন্য যথেষ্ট হয় মক্কার একসের আনাজে ততজনের তৃপ্তি মিটে না।[২] মদিনার সা' এবং মুদে বরকত রয়েছে।[৩]

মক্কা শরীফের ফজিলত

মক্কা শরীফ সমস্ত দুনিয়ার মাঝে উত্তম স্থান।[৪] মক্কার হেরেমের কোন গাছপালা উৎপাটন বা কাটা জায়েয নয়। কিন্তু এজখার নামক (সুগন্ধি) গাছ কাটা জায়েয়।[৫] মক্কার হেরেমের মধ্যে পাঁচ প্রকার কষ্টদায়ক প্রাণী যথা- কাক, চিল, বিচ্ছু, কুকুর (যা কামড়ায়) এবং ইদুর মারা জায়েয।[৬] হেরেমের মধ্যে শিকার করা জায়েয নয় এবং হেরেম শরীফের মধ্যে কোন হারান বস্তু যে ব্যক্তি প্রকৃত মালিকের নিকট পৌঁছার জন্য সর্বদা ঘোষণা করে সে উঠাতে পারবে অন্য কেউ নয় এবং মক্কায় কিয়ামত পর্যন্ত যুদ্ধ-বিগ্রহ করা হারাম।[৭]

বায়তুল্লাহ্ শরীফে ইবাদত করার ফজিলত

যে ব্যক্তি কাবা ঘরে রমজান মাস পুরা রোযা রাখবে এবং সাধ্যমত রাতে কেয়াম করবে (তারাবীহ পড়বে) আল্লাহ্ তায়ালা তাকে এক লাখ মাস রোযা রাখার সওয়াব দান করবেন।[৮] বায়তুল্লাহ্ শরীফে এক রাকাত নামাযের সওয়াব ৫৫ বছর ৬ মাস ২০ রাত নামাযের সওয়াবের সমান এবং তথায় ৫ ওয়াক্ত নামাযের সওয়াব দুইশত সত্তর বছর নয় মাস দশ রাত নামাযের সওয়াবের সমান।[৯]

মসজিদে নববীতে ইবাদত করার ফজিলত

মসজিদে নববীতে এক ওয়াক্ত নামায পড়ার সওয়াব ২৭ বছর ৯ মাস ১০ দিন নামায পড়ার সওয়াবের সমান।[১০]

---

১. বুখারী, মুসলিম।
২. মুসলিম- আবু হুরায়রা (রা.)।
৩. বুখারী, মুসলিম- আনাস (রা.)।
৪. তিরমিযী, ইবনে মাজা।
৫. বুখারী, মুসলিম।
৬. বুখারী, মুসলিম- আয়েশা (রা.)।
৭. বুখারী, মুসলিম- ইবনে আব্বাস (রা.)।
৮. ইবনে মাজা, তারগীব তারহীব- ইবনে আব্বাস (রা.)
৯. আহমাদ বায়হাকী- ইবনে জুবাইর (রা.)।
১০. প্রাগুক্ত।

দজ এর ফজিলত

দজ (তায়েফের একটি জংগল) হেরেমের অন্তর্ভূক্ত এবং সেখানে শিকার করা এবং তার গাছ পালা কাটা নিষেধ।[১]

তওয়াফ করলে যে সওয়াব হয় তার বর্ণনা

যে ব্যক্তি সাতদিন পর্যন্ত কাবা ঘর তওয়াফ করে এবং এ সপ্তাহে কোন অনর্থক কথাবার্তা হতে বিরত থাকে, তাহলে আল্লাহ তায়ালা তাকে একজন গোলাম আযাদ করার সওয়াব দিবেন।[২]

মসজিদুল হারামে দিন রাতে ১২০টি রহমত নাজিল হয়। ৬০টি তওয়াফকারীদের জন্য, ৪০টি নামায আদায়কারীদের জন্য এবং ২০টি কাবাঘর দর্শণ কারীদের জন্য।[৩]

যে ব্যক্তি তওয়াফ করলো এবং দুই রাকাত নামায পড়লো সে যেন একটি গোলাম আযাদ করলো।

এক সপ্তাহ তওয়াফ করলে প্রত্যেক পদক্ষেপ উঠানো এবং নামানোতে একটি করে গুনাহ মাফ হয়, আমল নামায় একটি করে নেকী লিখা হয় এবং মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়।[৪]

৫০ বার কাবাঘর তওয়াফ কারী গুনাহ হতে এমনভাবে পবিত্র হয় যেন তার মা তাকে সদ্য প্রসব করেছে।[৫]

সাফা ও মারওয়ার মাঝে সায়ী করার সওয়াব

সাফা ও মারওয়ার মাঝে দৌড়ালে (সায়ী করলে) সত্তরটি গোলাম আযাদ করার সওয়াব পাওয়া যায়।[৬] যে ব্যক্তি সাফা ও মারওয়ার মাঝে দৌড়াবে, আল্লাহ তা'য়ালা তার পদদ্বয়কে পুলসেরাত পার হবার সময় পদস্খলন হতে রক্ষা করবেন।[৭]

---

১. আবু দাউদ- জুবাইর (রা.)।
২. তবারানী, হাকেম- ইবনে আব্বাস (রা.)।
৩. ইবনে খুজায়মা- ইবনে উমর (রা.)।
৪. তিরমিযী- উবাইদ বিন উমাইর (রা.)।
৫. তিরমিযী- ইবনে আব্বাস (রা.)।
৬. ইবনে হিব্বান- ইবনে আব্বাস (রা.)।
৭. তবারানী- ইবনে উমর (রা.)।

হজরে আসওয়াদকে চুম্বনের সওয়াব

যে ব্যক্তি হজরে আসওয়াদকে চুম্বন দিবে, কিয়ামতের দিন হজরে আসওয়াদ সে লোকের ঈমানের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেবে।[১]

হজরে আসওয়াদে ও রুকনে ইয়ামানীতে হাত লাগালে গুনাহ্ মাফ হয়।[২]

যে ব্যক্তি হজরে আসওয়াদকে চুম্মু দিবে, কিয়ামতের দিন হজরে আসওয়াদ তার ব্যাপারে সুপারিশ করবে এবং তার সুপারিশ কবুল হবে।[৩]

রুকনে ইয়ামানীতে দোয়া করার বিবরণ

রুকনে ইয়ামানীতে সত্তর জন ফেরেশতা নিযুক্ত আছেন। যে ব্যক্তি রুকনে ইয়ামানীর নিকট এ দোয়া পড়ে ফেরেশতারা তার দোয়ার সাথে 'আমীন' বলে থাকেন।

দোয়াঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِىْ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِىْ الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا

عَذَابَ النَّارِ۔

অর্থাৎ- হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট ইহকাল ও পরকালে ক্ষমা ও কল্যাণ কামনা করছি। হে আমাদের প্রভূ! আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ ও আখেরাতে কল্যাণ দাও এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব হতে রক্ষা কর।[৪]

মুলতাজিমের পার্শে দোয়া করলে আরোগ্যলাভ হয় তার বিবরণ

মুলতাজিমের পাশে কোন ব্যক্তি এমনকি রুগ্ন ব্যক্তি যদি দোয়া করে তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে রোগ হতে আরোগ্য দান করেন।[৫]

---

১. তিরমিযী, ইবনে মাজা, দারেমী- ইবনে আব্বাস (রা.)।

২. তিরমিযী- উবাইদ বিন উমাইর (রা.)।

৩. (...হলাতুস সিদ্দীক- ইবনে আব্বাস (রা.)।

৪. ইবনে মাজা- আবু হুরায়রা (রা.)।

৫. তবারানী- ইবনে আব্বাস (রা.)।

জমজমের পানির ফজিলতের বর্ণনা

দুনিয়ার সমস্ত পানি হতে জমজমের পানি উত্তম।[১] জমজমের পানি যে উদ্দেশ্যে পান করা হয় আল্লাহ তায়ালা সে উদ্দেশ্য পূরণ করে থাকেন। যদি রোগ মুক্তির উদ্দেশ্যে পান করে তাহলে আল্লাহ তাকে আরোগ্য দান করেন। যদি আল্লাহর আশ্রয় অনুগ্রহ লাভের উদ্দেশ্যে পান করে তাহলে আল্লাহ তাকে আশ্রয়-অনুগ্রহ দান করেন। কেহ যদি তৃষ্ণা নিবারণের উদ্দেশ্যে পান করে তাহলে আল্লাহ তায়ালা তার তৃষ্ণা দূর করেন।[২]

জমজমের পানি পান করার সময় এ দোয়া পড়বে-

اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَسْئَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا وَاسِعًا وَشِفَاءً مِّنْ كُلِّ دَاءٍ -

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে উপকারী জ্ঞান, প্রশস্ত রিজিক এবং সর্বপ্রকার রোগ হতে আরোগ্য প্রার্থনা করছি।[৩]

জমজমের পানিতে আল্লাহ তা'আলা এত বরকত রেখেছেন যে, কেহ যদি ক্ষুধা নিবারণের জন্য তা পান করে তাহলে তার ক্ষুধা দূর হয়ে যায়।[৪] রাসূলুল্লাহ (সা.) জমজমের পানি উপহার দিতেন।[৫] মুনাফিক ও মুমিনের মাঝে পার্থক্য এই যে, মুনাফিক জমজমের পানি পেট ভর্তি করে পান করে না এবং মুমিন ব্যক্তি ভালভাবে পেট পূর্ণ করে তা পান করে।[৬]

জমজমের পানি করার সময় দোয়া কবুল হয়।[৭]

যে ব্যক্তির উপর হজ্ব ফরজ হয় তাকে তাড়াতাড়ি হজ্বে যেতে হবে তার বিবরণ

যখন কারও উপর হজ্ব ফরজ হয় তখন তা আদায় করার জন্য তাড়াতাড়ি করবে। এজন্য যে, মানুষ কখনো রোগাক্রান্ত হয়ে যায় আবার কখনো অভাব অনটনে পড়তে পারে।

---

১. ইবনে হিব্বান- ইবনে আব্বাস (রা.)।
২. ইবনে হিব্বান- ইবনে আব্বাস (রা.)।
৩. হাকেম, দারকুতনী- ইবনে আব্বাস (রা.)।
৪. মুসলিম- আবু যর (রা.)।
৫. রেহলাতুস্ সিদ্দীক- ইবনে আব্বাস (রা.)।
৬. ইবনে মাজা- ইবনে আব্বাস (রা.)।
৭. হাকেম- ইবনে আব্বাস (রা.)।

হযরত উমর (রা.) বলেন, আমার ইচ্ছা হয় আমি কিছু লোক নিয়োগ করি যারা আমার রাজ্যে হজ্ব ফরজ হওয়ার পরও হজ্ব করে না তাদের উপর জিযিয়া কর নির্ধারণ করুক, কেননা এরা মুসলমান নয়।[১]

হজ্বের মানত করলে তা আদায় করার বিবরণ

কেহ যদি হজ্ব করার জন্য নযর মানে (মানত করে) এবং মানত আদায় করার পূর্বেই মারা যায়, তাহলে তার পক্ষ হতে তার ওয়ারিসের উপর হজ্ব করা জরুরী হয়ে দাঁড়ায়।[২]

আত্মীয় স্বজনের পক্ষ হতে হজ্ব করার বিবরণ

যে ব্যক্তির হজ্ব করার (শারীরিক) সামর্থ নাই, তার পক্ষ হতে যদি তার আত্মীয় স্বজনের কেউ হজ্ব করে তা'হলে তা জায়েয।[৩]

হজ্বে যাওয়ার সওয়াবের বিবরণ

হাজী সাহেবদের উটের প্রতি পদক্ষেপে আল্লাহ্ তা'আলা একটি করে নেকী দান করেন এবং একটি করে গুনাহ্ মাফ করেন এবং মর্যাদা বৃদ্ধি করে থাকেন।[৪] হজ্ব ও উমরাকারী আল্লাহ্ তায়ালার মেহমান। যদি আল্লাহ্ তায়ালার নিকট দোয়া করে তাহলে তা কবুল করেন। আর যদি গুনাহ্ মাফের দোয়া করে তাহলে আল্লাহ্ গুনাহ্ মাফ করে দেন।[৫]

যে ব্যক্তি হজ্ব করতে আপন মাল খরচ করে, আল্লাহ্ তায়ালা তার এক দিরহামে (বা টাকায়) সাতশ দিরহামের সওয়াব দিয়ে থাকেন।[৬]

হারাম মাল দ্বারা হজ্ব কবুল না হবার বিবরণ

যে ব্যক্তি হারাম মাল দ্বারা হজ্ব করে তার হজ্ব কবুল হয় না। হারাম মাল দ্বারা হজ্বকারী যখন লাব্বাইকা বলে অর্থাৎ বলে হে আল্লাহ্ আমি তোমার খিদমতে হাজির তখন জবাবে আল্লাহ্ বলেন, লা লাব্বাইকা অর্থাৎ তুমি আমার খিদমতে হাজির নও। তোমার সম্পদ অবৈধ পন্থায় অর্জিত। তোমার সোয়ারী, তোমার কাপড় চোপড় হারাম পন্থায় অর্জিত। তুমি তোমার গুনাহ্ সমেত ফিরে যাও। তোমার গুনাহ্ মাফ হবে না।[৭]

---

১. রেহলাতুস সিদ্দীক।
২. বুখারী, মুসলিম- ইবনে আব্বাস (রা.)।
৩. প্রাগুক্ত।
৪. বায়হাকী- ইবনে উমর (রা.)।
৫. ইবনে মাজা- আবু হুরায়রা (রা.)।
৬. রেহলাতুস্ সিদ্দীক।
৭. মুসনাদে দাইলামী- হযরত উমর (রা.)।

হজ্ব ও উমরার বিভিন্ন রকম মাসআলার বর্ণনা.

হজ্বের নিয়্যত ভঙ্গ করে উমরার নিয়্যত করা জায়েয। অর্থাৎ কেহ মুফরাদ হজ্বের নিয়্যত করেছিল, সে যদি সেটা ভঙ্গ করে তামাত্তুর নিয়্যত করে তাহলে জায়েয।[১]

হজ্বে যাবার সময় ভাললোকদের সঙ্গী হবার চেষ্টা করবে।[২]

উমরা বছরের যে কোন সময় করা যায়।[৩] যখন হজ্ব বা উমরা হতে ফিরবে তখন প্রত্যেক উঁচু জায়গায় তিনবার আল্লাহ আকবার বলবে এবং এ দোয়া পড়বে-

لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ - اٰئِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ سَاجِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ ، صَدَقَ اللّٰهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الاَحْزَابَ وَحْدَهُ -

অর্থঃ আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। তিনি একক। তার কোন শরীক নেই। তারই জন্য সমস্ত রাজত্ব ও প্রশংসা এবং তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। আমরা প্রত্যাবর্তনকারী, তওবাকারী, ইবাদতকারী, সিজদাকারী, আমাদের রবের প্রশংসাকারী। আল্লাহ তার ওয়াদা পূর্ণ করেছেন এবং তার বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং তিনি একাই কাফেরদের দলকে পরাজিত করেছেন।[৪]

বিবাহের ফজিলত

বিবাহ করা গুনাহ হতে বাঁচার একটি উত্তম মাধ্যম।[৫]

দুনিয়ার সর্বোত্তম ফায়েদা বা উপকারের সামগ্রী হচ্ছে সচ্চরিত্রবতী মহিলা।[৬]

যে ব্যক্তি জেনা (ব্যভিচার) হতে বাঁচার উদ্দেশ্যে বিবাহ করে আল্লাহ তাকে

---

১. মুসলিম- আতা (রা.)।

২. রেহলাতুস্ সিদ্দীক।

৩. মুসনাদে শাফেয়ী, নায়লুল আওতার- আলী (রা.)।

৪. বুখারী, মুসলিম- ইবনে উমর (রা.)।

৫. বুখারী, মুসলিম- ইবনে মাসউদ (রা.)।

৬. মুসলিম- ইবনে উমর (রা.)।

সাহায্য করেন।[১] বিবাহ না করার কারণে দুনিয়াতে ফিতনা ফাসাদ (অশ্লীলতা) বৃদ্ধি পায়।[২]

স্বামী স্ত্রীর মাঝে যেমন প্রগাঢ় ভালবাসা ও আন্তরিকতা হয় অন্য কারও মাঝে তা হয় না।[৩] বিবাহ করা দ্বীনের (ধর্মের) অর্ধেক অঙ্গ।[৪]

পুরুষদের জন্য মহিলাদের চেয়ে বড় ফিতনা আর কিছুই নাই।[৫]

কুমারী মহিলাকে বিবাহ করাই উত্তম।[৬]

মাল, সৌন্দর্য ও বংশের দিকে লক্ষ্য না করে দ্বীনদার মহিলাকে বিয়ে করবে।[৭]

অধিক সন্তান জন্মদানকারী মহিলাকে বিবাহ করা উত্তম।[৮]

মুসলমানের জন্য নেককার মহিলার চেয়ে উপকারী বস্তু আর কিছু নাই।[৯] যে বিবাহে অল্প ব্যয় হয় তাতেই বেশী বরকত।[১০]

সতরের বিবরণ

যে মহিলাকে বিবাহ করার ইচ্ছা করবে তাকে দেখে নিবে, কেননা এতে ভালবাসা সৃষ্টি হয়।[১১]

পুরুষ লোক পুরুষলোককের সতর দেখা এবং মেয়েলোক মেয়েলোকের সতর দেখা এবং কোন পুরুষ অপর পুরুষের সাথে (উলঙ্গ হয়ে) একই কাপড়ে শোয়া এবং কোন মহিলা অপর কোন মহিলার সাথে (উলঙ্গ হয়ে) একই কাপড়ে শোয়া নিষেধ।[১২]

কোন মহিলার সাথে কোন গায়ের মুহরেম ব্যক্তির (যার সাথে বিবাহ করা জায়েয) একাকী রাত্রী যাপন করা নিষেধ।[১৩]

---

১. তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজা- আবু হুরায়রা (রা.)।
২. তিরমিযী- আবু হুরায়রা (রা.)।
৩. ইবনে মাজা- ইবনে আব্বাস (রা.)।
৪. শোয়াবুল ঈমান- আনাস (রা.)।
৫. মুসলিম- আবু সাঈদ খুদরী (রা.)।
৬. বুখারী, মুসলিম- জাবের (রা.)।
৭. বুখারী, মুসলিম- আবু হুরায়রা (রা.)।
৮. আবু দাউদ, নাসাঈ- মা'কেল ইবনে ইয়াসার (রা.)।
৯. ইবনে মাজা- আনাস (রা.)।
১০. শোয়াবুল ঈমান- আয়েশা (রা.)।
১১. তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজা- মুগীরা (রা.)।
১২. শোয়াবুল ঈমান- হযরত আয়েশা (রা.)।
১৩. মুসলিম- জাবের (রা.)।

হঠাৎ কোন মহিলার উপর দৃষ্টি পড়ে গেলে কোন গুনাহ হবে না। কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে দ্বিতীয়বার দেখা নিষেধ।[১]

যদি কেউ কোন মহিলাকে দেখে আকৃষ্ট হয় তাহলে সে যেন তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করে নেয়।[২]

যদি কেউ তার ক্রীতদাসীর অন্যত্র বিবাহ দিয়ে দেয় তাহলে আর সে তার সতর দেখতে পারবে না।[৩] বিনা প্রয়োজনে উলঙ্গ হওয়া জায়েয নহে।[৪]

মেয়েলোক অন্ধ পুরুষলোক হতে এভাবে পর্দা করবে যেমন চোখ ওয়ালা লোক হতে করে থাকে।[৫] পর মহিলার সাথে একাকী হওয়া জায়েয নহে।[৬]

ক্রীতদাস হতে পর্দা করতে হবে না।[৭]

স্ত্রীলোকদের নপুংসক হতেও পর্দা করা উচিৎ।[৮]

ইচ্ছাকৃত ভাবে অন্যাকে যে নিজের সতর (গুপ্তাঙ্গ) দেখায় এবং যে দেখে তারা উভয়েই অভিশপ্ত।[৯]

বিবাহের সময় পাত্রীর অনুমতির বর্ণনা

বিবাহের সময় পাত্রী কুমারী হোক বা পূর্বে বিবাহ হয়ে থাকুক তার অনুমতি নেয়া জরুরী। কুমারী মহিলার অনুমতি হচ্ছে চুপ থাকা (অর্থাৎ চুপ থাকলে তার সম্মতি আছে বলে ধরে নিতে হবে)।[১০]

কোন মহিলার বিবাহ যদি তার আব্বা মেয়ের বিনা সম্মতিতে দিয়ে দেয় এবং সে এতে সম্মত না হয়, তাহলে সে বিবাহ তার ইচ্ছাধীন। সে ইচ্ছা করলে এ বিয়ে ঠিক রাখতে পারে কিম্বা ভেঙ্গে দিতে পারে।[১১]

---

১. আহমাদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, দারেমী- বুরাইদা (রা.)।

২. মুসলিম- জাবের (রা.)।

৩. আবু দাউদ- আমর ইবনে শোয়াইব (রা.)।

৪. তিরমিযী- ইবনে উমর (রা.)।

৫. আহমদ, তিরমিযী, আবু দাউদ- উম্মে সালমা (রা.)।

৬. তিরমিযী- হযরত উমর (রা.)।

৭. তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজা- রাহজ ইবনে হাকীম (রা.)।

৮. বুখারী, মুসলিম- উম্মে সালামা (রা.)।

৯. বায়হাকী, মিশকাত- হাসান (রা.)।

১০. বুখারী, মুসলিম- আবু হুরায়রা (রা.)।

১১. আবু দাউদ- ইবনে আব্বাস (রা.)।

ওলীর (অভিভাবকের) বিবরণ

স্ত্রীলোকের বিবাহ ওলী ব্যতীত সহীহ নহে এবং যে বিবাহ মহিলার ওলীর বিনা অনুমতিতে হয়ে গেছে এবং স্বামী তার সাথে মিলন করে ফেলেছে তাহলে তাকে মোহরে মেসাল দিতে হবে। আর যে মহিলার কোন ওলী নেই, মুসলমানদের শাসক (রাষ্ট্রপতি) তার ওলী হবেন।[১]

সাক্ষী ব্যতীত বিবাহ সহীহ হয় না।[২]

যদি কুমারী বালেগা মহিলা বিবাহে অসম্মত হয় তাহলে তার উপর জোর জবরদস্তী চলবে না।[৩]

যদি কোন স্ত্রীলোককে তার ওলী একজনের সাথে বিয়ে দেয় এরপর দ্বিতীয় বার কেহ অন্য কারও সাথে বিয়ে দিয়ে দেয় এ অবস্থায় উক্ত মহিলাকে প্রথম স্বামী পাবে।[৪]

ক্রীতদাস তার মালিকের বিনা অনুমতিতে বিবাহ করতে পারবে না।[৫]

কোন মহিলার পক্ষ হতে অন্য কোন মহিলার বিবাহ দেয়া জায়েয নহে।[৬]

যদি ওলী কোন মহিলাকে বিবাহ দেয়ার ক্ষেত্রে বাধা দেয় বা তার ওলী কাফের হয় তাহলে রাষ্ট্রপ্রধান তার ওলী হবেন।[৭]

পুরুষ ও মহিলার জন্য এটা জায়েয যে, সে তার বিবাহ করিয়ে দেয়ার জন্য কাউকে উকিল বানাতে পারে।[৮]

অপ্রাপ্ত বয়স্কা মেয়ের বিবাহ যদি তার ওলী তার বিনা সম্মতিতে দিয়ে দেয় তাহলে তা জায়েয।[৯]

---

১. আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজা- আয়েশা (রা.)।

২. তিরমিযী- ইবনে আব্বাস (রা.)।

৩. তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ- আবু হুরায়রা (রা.)।

৪. আহমাদ, সুনানে আরবা- সামরা (রা.)।

৫. আবু দাউদ, তিরমিযী, দারেমী- জাবের (রা.)।

৬. ইবনে মাজা, দারকুতনী- আবু হুরায়রা (রা.)।

৭. ইবনে মাজা- আবু হুরায়রা (রা.)।

৮. রওজাতুন নাদিয়া।

৯. প্রাগুক্ত।

বিবাহের প্রস্তাব দেয়ার বিবরণ

কারও বিয়ের প্রস্তাবের উপর দ্বিতীয় জনের প্রস্তাব দেয়া নিষেধ।[১]

সাইয়েবাকে (পূর্বে যার বিয়ে হয়েছিল) পাত্রের সরাসরি প্রস্তাব দেয়া জায়েয।[২]

নাবালিকা মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব তার ওলীর নিকট দিতে হবে।[৩]

কোন মহিলার ইদ্দত পালন কালীন সময়ে বিয়ের প্রস্তাব দেয়া হারাম।[৪] দ্বীনদার চরিত্রবান লোক বিয়ের প্রস্তাব দিলে তার সাথে বিবাহ দিবে।[৫]

যে সব স্ত্রীলোকের সাথে বিবাহ্ করা হারাম তার বিবরণ

আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন মজীদে যে সব মহিলাকে বিবাহ্ করা হারাম বলে ইরশাদ করেছেন তারা হলো ঃ ১. আপন মা, ২. সৎ মা, ৩. কন্যা, ৪. বোন, ৫. ফুফু, ৬. খালা, ৭. ভাতিজী, ৮. ভাগিনী, ৯. দুধ মা, ১০. শাশুড়ী, ১১. স্ত্রীর পুর্ব স্বামীর ঔরশসজাত কন্যা, ১২. আপন পুত্রের স্ত্রী (পুত্র বধু), ১৩. দুধ বোন, (এক সাথে দুধপান করা নসব এর মত), ১৪. একত্রে আপন দুই বোনকে বিবাহ্ করা।[৬]

একত্রে স্ত্রী ও তার ফুফুকে এবং স্ত্রী ও তার খালাকে বিবাহ্ বন্ধনে আবদ্ধ করা হারাম।[৭]

কেউ যদি বিবাহ্ করার পর জানতে পারে যে, তার স্ত্রীর কুষ্ঠ ব্যধি বা ধবল কুষ্ঠ বা মস্তিস্ক বিকার কিম্বা তার গুপ্তাঙ্গে ব্যাধি রয়েছে, তাহলে স্বামী উক্ত বিবাহ্ ভেঙ্গে দিলে কোন গুনাহ্ নেই।[৮]

স্বামী ও স্ত্রীর মাঝে কেউ যদি ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে তাদের বিবাহ্ সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। ইদ্দত পার হবার পর অন্য কোন পুরুষের সাথে উক্ত মহিলা বিয়ে করতে পারে।[৯]

---

১. বুখারী, মুসলিম- ইবনে উমর (রা.)।
২. মুসলিম, আহমাদ- উকবা বিন আমের (রা.)।
৩. মুসলিম- উম্মে সালামা (রা.)।
৪. বুখারী- হযরত উমর (রা.)।
৫. তিরমিযী- আবু হুরায়রা (রা.)।
৬. সূরা নিসা ৪র্থ রুকূ।
৭. বুখারী, মুসলিম- আবু হুরায়রা (রা.)।
৮. রওজাতুন নাদিয়াহ- কাব ইবনে জায়েদ (রা.)।
৯. বুখারী-ইবনে আব্বাস (রা.)।

যদি কোন মহিলা মুসলমান হয়ে যায় এবং তার বিবাহ করার পূর্বেই তার স্বামী মুসলমান হয়ে যায় তাহলে তাদের নতুন বিবাহ পড়াবার প্রয়োজন নেই।

যদি কোন মহিলা মুসলমান হয়ে যায় এবং তার স্বামীর ইসলাম গ্রহণ করার কথা জেনেও অন্য কারো সাথে বিয়ে করে ফেলে তাহলে কাজী সাহেব (ইসলামী রাষ্ট্রের বিচারক) বিবাহ ভেঙ্গে দিয়ে উক্ত মহিলাকে পূর্ব স্বামীর নিকট ফিরিয়ে দিতে পারেন।[১]

বিবাহের জন্য দ্বীনদার মহিলা তালাশ করবে।[২] মুসলমান পুরুষের মুশরিকা মহিলাকে এবং মুসলমান মহিলার মুশরিক পুরুষকে বিবাহ করা জায়েয নহে (হারাম)। ঈমানদার ক্রীতদাসীকে বিবাহ করা উত্তম মুশরিকা মহিলা হতে। তদ্রুপ ঈমানদার মহিলা (মুসলমান) ক্রীতদাসকে বিবাহ করবে কিন্তু মুশরিক পুরুষকে বিবাহ করবে না।[৩]

মুসলমানদের জন্য ইহুদী ও খৃষ্টানদের পুত পবিত্র মহিলাদের বিবাহ করা জায়েয।[৪]

রাসূলুল্লাহ (সা.) নিকাহে মুতআ' সম্পর্কে বলেছেন যে, তা কিয়ামত পর্যন্ত হারাম। নিকাহে মুতআ হলো "কোন মহিলাকে নির্দিষ্ট পারিশ্রমিকের (টাকা পয়সার) বিনিময়ে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিবাহ করা।" নিকাহুত তাহলিল বা হিলাবিয়া করা হারাম।[৫] তাহলো (তিন) তালাক প্রাপ্তা মহিলাকে অপর কোন ব্যক্তির সাথে এ উদ্দেশ্যে বিয়ে করানো, যেন সে তাকে তালাক দিয়ে আবার পুর্ব স্বামীর নিকট ফিরিয়ে দেয়।[৬]

নিকাহুশ্ শিগার হারাম। তাহলো "কারও মেয়ে বা বোনকে এ শর্তে বিয়ে করা যে, সে এর পরিবর্তে তার সাথে নিজ মেয়ে বা বোনের বিয়ে দিবে। (এবং এদের জন্য কোন মোহর নির্ধারণ করা হবে না।)[৭]

নেককার পুরুষের ব্যভিচারিনী মহিলাকে বিবাহ করা হারাম এবং নেককার মহিলার ব্যভিচারী পুরুষের সাথে বিবাহ করা হারাম।[৮]

---

১. আহমাদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজা- ইবনে আব্বাস (রা.)।
২. বুখারী, মুসলিম- আবু হুরায়রা (রা.)।
৩. সূরা বাকারা : ২২১
৪. সূরা মায়েদা : ৫
৫. মুসলিম আহমাদ- রাবি বিন সাবুরা (রা.)।
৬. আহমাদ, তিরমিযী, নাসাঈ- ইবনে মাসউদ (রা.)।
৭. বুখারী, মুসলিম- ইবনে উমর (রা.)।
৮. সূরা নূর : ৩ নং আয়াত।

মসজিদে বিবাহ পড়ানো সুন্নাত, খুতবা পড়া ও ইজাব কবুলের বিবরণ

মসজিদে বিবাহ পড়ানো সুন্নাত।[১] প্রথমে এ খোৎবা পাঠ করবে ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِىَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنْ لَّاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ اَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَنَذِيْرًا بَيْنَ يَدَىِ السَّاعَةِ مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَّعْصِهِمَا فَاِنَّهُ لَايَضُرُّ اِلَّا نَفْسَهُ وَلَا يَضُرُّ اللّٰهَ شَيْئًا ـ يٰاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاءً وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَاءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ـ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ـ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا يُّصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا ـ

অর্থৎ- সমস্ত প্রশংসাই একমাত্র আল্লাহর জন্য। আমরা তার প্রশংসা করছি এবং তারই কাছে সাহায্য চাচ্ছি এবং তার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং আমরা আল্লাহর নিকট আমাদের আত্মার কুমন্ত্রনা এবং আমাদের খারাপ আমল হতে আশ্রয় চাচ্ছি। আল্লাহ তায়ালা যাকে হেদায়াত দান করেন তাকে কেউ পথভ্রষ্ট

১. তিরমিযী- আয়েশা (রা.)।

করতে পারে না। আর তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন তাকে কেউ পথ দেখাতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। তিনি একক এবং তার কোন শরীক নেই এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ হচ্ছে তার বান্দা ও রাসূল। তিনি তাকে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন (সত্যানুসারীদের জন্য) সুসংবাদ দাতা এবং (ভ্রান্তদের জন্য) সতর্ককারী হিসেবে কিয়ামতের পুর্বে প্রেরণ করেছেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তার রাসূলের অনুসরণ করবে, সে সঠিক পথ পাবে এবং যে তাদের অবাধ্য হবে সে নিজের ক্ষতি করল, সে আল্লাহর কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না।

"হে মানুষ! ভয় কর তোমাদের সেই প্রভুকে, যিনি তোমাদেরকে একই আত্মা হতে সৃষ্টি করেছেন এবং তা হতে তার স্ত্রীকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের দুইজন হতে অনেক পুরুষ এবং মহিলার সৃষ্টি ও বিস্তার ঘটিয়েছেন। তোমরা ভয় কর সেই আল্লাহকে যার নামে তোমরা একে অপরের নিকট লেনদেন করে থাক এবং তোমরা আত্মীয়তার ব্যাপারে সাবধান হও (তা ছিন্ন করোনা)। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের সবকিছু পর্যবেক্ষণকারী।

হে ঈমানদারেরা! তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় কর, যেমন তাকে ভয় করা উচিৎ এবং তোমরা মুসলমান না হয়ে মরিও না।

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো এবং তোমরা সঠিক কথা বলো, তাহলে তিনি তোমাদের আমলকে সঠিক করে দিবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দিবেন এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুসরণ করবে নিশ্চয় সে বিরাট সফলতা লাভ করবে।"[১]

অতপর খুতবা পাঠকারী যদি ওলী হন তাহলে তিনি বরকে সামনে বসিয়ে বলবেন তোমার সাথে অমুকের মেয়ে যার নাম এই, এত টাকার মোহরের পরিবর্তে বিবাহ দিতেছি, তুমি তাকে স্ত্রীরূপে কবুল কর। বর বলবে আমি কবুল করিলাম (قَبِلْتُ)।[২]

অতপর বিয়ের মজলিসে যারা উপস্থিত থাকবে তারা বরের দিকে লক্ষ্য করে বলবেঃ

بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ وَفِيْكَ وَعَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِىْ خَيْرٍ۔

অর্থাৎ- আল্লাহ তোমার জন্য একাজে বরকত দান করুন এবং তোমার উপর

১. তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ, হাকেম- ইবনে মাসউদ (রা.)।

২. আবু দাউদ।

বরকত দান করুন এবং তোমাদের মাঝে কল্যাণের ভিত্তিতে ঐক্য রাখুন।[১]

বিবাহের পর বিয়ের মজলিসে শুকনা খেজুর (খুর্মা) বিতরণের যে বহুল প্রচারিত (সাধারণের মাঝে) হাদীসটি রয়েছে তা সঠিক নয়।

বিবাহের পর যখন স্ত্রীকে আপন গৃহে নিয়ে আসবে তখন তার কপালে হাত রেখে এ দোয়া পড়বে ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَا وَخَيْرِمَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّمَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ ـ

অর্থাৎ- হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট এর কল্যাণ ও এর মাঝে যা কিছু কল্যাণময় (গুণাবলী) সৃষ্টি করেছ তা প্রার্থনা করছি এবং এর অকল্যাণ ও এর মাঝে যা কিছু ক্ষতি কারক (গুণাবলী) সৃষ্টি করেছ তা হতে তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি।[২] যখন স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করবে তখন পর্দা করবে এবং এ দোয়া পড়বে ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا ـ

অর্থাৎ- আল্লাহর নামে শুরু করছি। হে আল্লাহ! আমাদের হতে শয়তানকে দূরে রাখ এবং আমাদের যে রিজিক দিচ্ছ (অর্থাৎ যে সন্তানাদি দিবে) তাহতে শয়তানকে দূরে রাখ।[৩]

মোহরের বিবরণ

বিবাহে মোহর বির্ধারণ করা এবং তা পরিশোধ করা ওয়াজিব।[৪]

বিবাহ পড়াবার সময় মোহর পরিশোধ করা সুন্নাত[৫] এবং বিবাহের পরে পরিশোধ করা জায়েয।[৬]

মোহর যত বেশী পরিমাণই নির্ধারণ করা হোক তা জায়েয।[৭] কিন্তু সামর্থের বাহিরে নির্ধারণ করা জায়েয নহে।[৮]

---

১. আহমাদ, নাসাঈ, ইবনে মাজা- আকীল বিন আবু তালেব (রা.)।
২. আবু দাউদ, ইবনে মাজা- আমর বিন শোয়াইব।
৩. বুখারী, মুসলিম- ইবনে আব্বাস (রা.)।
৪. সূরা নিসা ঃ ২৪
৫. আবু দাউদ- ইবনে আব্বাস (রা.)।
৬. আবু দাউদ- আয়েশা (রা.)।
৭. সূরা নিসা ঃ ২০
৮. মিশকাত।

মোহর হিসেবে (সর্ব নিম্ন) লোহার বালা বা আংটি নির্ধারণ করা জায়েয। যদি কারও নিকট সেটারও সামর্থ না থাকে তাহলে সে কোরআন মজীদের কয়েকটি সূরা (শিক্ষা দেয়াকে) মোহর হিসেবে নির্ধারণ করতে পারে।[১] দুই অঞ্জলী ছাতু বা খেজুরের দ্বারা মোহর নির্ধারণ করাও জায়েয।[২]

বিবাহের সময় যে মহিলার মোহর নির্ধারণ করা হয়নি এবং তার সাথে সহবাসের পূর্বেই যদি তার স্বামী মারা যায় এ অবস্থায় উক্ত মহিলা মোহরে মেসাল (অর্থাৎ তার বংশের মহিলাদের যেমন বোন, মা, ইত্যাদির মোহরের মত) পাবে।[৩]

যদি কোন অমুসলমান ব্যক্তি কোন মুসলিম মহিলাকে বিবাহ করতে চায় এবং উক্ত মহিলা তার ইসলাম গ্রহণ করাটাকেই মোহর হিসাবে নির্ধারণ করে তবে তা জায়েয।[৪]

কেউ যদি নিজ ক্রীতদাসীকে আযাদ করে বিবাহ করতে ইচ্ছুক হয় এবং তাকে আযাদ করাটা মোহর হিসেবে গণ্য করে তাহলে তা জায়েয।[৫]

অল্প মোহরে বিবাহ করায় বেশী বরকত রয়েছে।[৬] যে ব্যক্তি কোন মহিলাকে অল্প বা বেশী মোহরে বিবাহ করে এবং তার মোহর না দেয়ার নিয়্যত থাকে তাহলে সে ব্যভিচারী।[৭]

বিবাহের সময় যে মহিলার মোহর ধার্য করা না হবে এবং সহবাসের পূর্বেই তার স্বামী তাকে তালাক দেয় তাহলে স্বামীকে মোহর দিতে হবে না। কিন্তু যদি বিবাহের সময় মোহর ধার্য করা হয়ে থাকে এবং সহবাসের পূর্বে তালাক দেয় তাহলে অর্ধেক মোহর দিতে হবে।[৮]

যুবক-যুবতীদের তাড়াতাড়ি বিবাহ দেয়ার বিবরণ

যে ব্যক্তির মেয়ের বয়স ১২ বছর হবে এবং তার বিবাহ দিয়ে দিবে না, এমতাবস্থায় যদি মেয়ের দ্বারা জিনা (ব্যভিচার) হয়ে যায় তাহলে তার পিতাও এ পাপের ভাগী হবে।[৯]

---

১. বুখারী, মুসলিম- সাহ্যল বিন সা'দ আস্সায়েদী (রা.)।
২. মিশকাত- জাবের (রা.)।
৩. তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ, দারেমী- আলকামা (রা.)।
৪. নাসাঈ- আনাস (রা.)।
৫. আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ - আনাস (রা.)।
৬. আহমাদ- আনাস (রা.)।
৭. তবারানী।
৮.. সূরা বাকারা : ২৩৬-২৩৭।
৯. শোয়াবুল ঈমান- আনাস (রা.)।

যখন কারও ছেলে বালেগ (প্রাপ্ত বয়স্ক) হয়ে যাবে এবং তার পিতা তার বিবাহ দিয়ে দিবে না, সে যদি জিনা করে ফেলে তাহলে তার পিতাকেও এ ব্যাপারে গুনাহের ভাগী হতে হবে।[১]

কোন স্ত্রীলোকের বিবাহ তার মতের বিরুদ্ধে জোর পূর্বক করাবে না, যদিও বিবাহ দাতা সে তার পিতা বা ভাই হোক না কেন।[২]

বিবাহের ঘোষণার বিবরণ

বিবাহ শাদীতে দফ (একমুখা ঢোল) বাজানো এবং যে সব গানে বা কবিতায় অশ্লীলতা নেই তা মেয়েদের গাওয়া জায়েয।[৩]

স্বামী-স্ত্রীর মিলামিশার বিবরণ

স্ত্রীর সাথে যেভাবে ইচ্ছা সঙ্গম করা জায়েয।[৪] কিন্তু স্ত্রীর গুহ্যদ্বারে সঙ্গম করা হারাম।[৫]

স্ত্রী আযাদ হলে তার অনুমতি সাপেক্ষে আজল করা (অর্থাৎ বীর্যপাতের সময় নিজ অঙ্গ স্ত্রী অঙ্গ হতে বের করে বাহিরে বীর্যপাত করা) জায়েয।[৬] কিন্তু স্ত্রী ক্রীতদাসী হলে তার বিনা অনুমতিতেও আজল করা জায়েয।[৭]

গর্ভাবস্থায়, বাচ্চাকে দুধপান কালীন সময়েও (অর্থাৎ বাচ্চার বয়স আড়াই বা তিন বছর হওয়া পর্যন্ত) সহবাস করা জায়েয।[৮]

স্ত্রী সঙ্গমের ঘটনা অন্যের নিকট বলা নিষেধ। তদ্রূপ স্ত্রীর জন্যও সঙ্গমের ঘটনা অন্য কোন মহিলার নিকট প্রকাশ করা নিষেধ।[৯]

স্বামী-স্ত্রী (বাড়ীর আঙ্গিনায় বা নির্জন স্থানে) পরস্পর দৌড়াদৌড়ি করা জায়েয।[১০]

---

১. শোয়াবুল ঈমান- আবু সাঈদ খুদরী (রা.)।
২. আবু দাউদ, ইবনে মাজা- ইবনে আব্বাস (রা.)।
৩. তিরমিযী- আয়েশা (রা.)।
৪. সূরা বাকারা ঃ ২২৩।
৫. আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযী- আবু হুরায়রা (রা.)।
৬. বুখারী, মুসলিম- জাবের (রা.)।
৭. ইবনে মাজা- উমর (রা.)।
৮. মুসলিম- জুযামা বিনতে অহব (রা.)।
৯. মুসলিম- আবু সাঈদ (রা.)।
১০. আবু দাউদ- আয়েশা (রা.)।

স্ত্রীদের পালা নির্ধারণ করার বিবরণ

যে ব্যক্তির একাধিক স্ত্রী থাকবে, রাত্রি যাপনের জন্য এদের পালা নির্ধারণ করা তার উপর ওয়াজিব।[১]

যে ব্যক্তি তার পূর্বের স্ত্রীর উপর কুমারী বিবাহ করবে সে সাতদিন কুমারী স্ত্রীর সাথে থাকবে। তারপর পালা নির্ধারণ করবে। আর যদি বিবাহিতাকে বিয়ে করে তাহলে তার নিকট তিন রাত থেকে পালা নির্ধারণ করবে।[২]

কোন মহিলা তার নিজ পালা তার সতীনকে দিয়ে দেয়া জায়েয।[৩]

স্ত্রীদের মাঝে রাত্রি যাপন এবং তাদের ভরণ-পোষণের ক্ষেত্রে আদল ইনসাফ ও সমতা রক্ষা করা ওয়াজিব, কিন্তু আন্তরিক মহব্বত (কারো প্রতি বেশী হলে) এ ব্যাপারে ধরা হবে না।[৪]

যে ব্যক্তির এ ধারণা হবে যে, যদি আমি আমার স্ত্রীর উপর দ্বিতীয় বিয়ে করি তাহলে এদের মাঝে ইনসাফ করতে পারব না, তাহলে তার জন্য দ্বিতীয় বিয়ে করা নিষেধ।[৫] রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি তার স্ত্রীদের মাঝে ইনসাফ করবে না, সে কিয়ামতের দিন আল্লাহর সম্মুখে এমন অবস্থায় আসবে যে, তার অর্ধেক অঙ্গ নষ্ট (ভঙ্গ) হয়ে থাকবে।[৬]

যে ব্যক্তির কয়েকজন স্ত্রী থাকবে সে তার সফর সঙ্গী হিসেবে কাউকে নিতে চাইলে তাদের মাঝে লটারী (কোরা) করবে। এতে যার নাম উঠবে তাকে সাথে নিবে।[৭]

যে ব্যক্তির একাধিক স্ত্রী রয়েছে এবং সে যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং তার স্ত্রীরা একমত হয়ে কোন স্ত্রীর ঘরে থাকার অনুমতি দেয় তাহলে তা জায়েয।[৮]

এক স্ত্রীর পালার দিন অন্য স্ত্রীর ঘরে প্রয়োজন বশত যাওয়া জায়েয।[৯]

যে ব্যক্তির একাধিক স্ত্রী রয়েছে, সে বিদেশ (প্রবাস) হতে বাড়ী এসে যতক্ষণ না সবার পালা নির্ধারণ করবে ততক্ষণ কোন স্ত্রীর ঘরে রাত কাটাবে না।[১০]

---

১. বুখারী, মুসলিম- আয়েশা (রা.)।
২. বুখারী, মুসলিম- আনাস (রা.)।
৩. বুখারী, মুসলিম-আয়েশা (রা.)।
৪. সুনানে আরবা- আয়েশা (রা.)।
৫. সূরা নিসা ঃ ৩
৬. আহমাদ, সুনানে আরবা- আবূ হুরায়রা (রা.)।
৭. বুখারী, মুসলিম- আয়েশা (রা.)।
৮. প্রাগুক্ত।
৯. প্রাগুক্ত।
১০. মুসলিম।

ওলিমার বিবরণ

ওলিমা (বিহাত্তোর খানা দেয়া) করা ওয়াজিব।[১] যে ওলিমাতে শুধু মাত্র ধনীদের ডাকা হবে এবং গরীবদের বাদ দেয়া হবে সেটা খুবই খারাপ খানা।[২]

যে ব্যক্তি ওলিমার দাওয়াত কবুল করবে না, সে আল্লাহ ও তার রাসূলের (সা.) অবাধ্য।[৩] কিন্তু যে ব্যক্তি ফখর করার জন্য ওলিমা করে বা ওলিমাদাতা যদি ফাসিক হয় তাহলে তার দাওয়াত কবুল করা জায়েয নয়।[৪]

রাসূলুল্লাহ (সা.) একবার ওলিমাতে গোশত রুটি, একবার পানির এবং একবার ছাতু খেতে দিয়েছিলেন।[৫]

রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি বিনা দাওয়াতে যাবে, সে চোর হয়ে ঢুকবে এবং লুণ্ঠনকারী হয়ে ফিরে আসবে।[৬]

যদি কাউকে একই সময়ের জন্য দুইজনে দাওয়াত দেয়, তাহলে প্রথম ব্যক্তির দাওয়াত খাবে। আর দুইজন যদি একসাথেই দাওয়াত দেয় তাহলে যার বাড়ি নিকটে তার বাড়িতে দাওয়াত খাবে।[৭] ওলিমার দাওয়াত দাতা যদি কাউকে বলে যে, উমুককে দাওয়াত দাও এবং তোমার সাথে যারই সাক্ষাৎ ঘটে তাকে দাওয়াত দিও, তাহলে যে সব লোককে সে দাওয়াত দিবে সবারই খানা খওয়া যায়েয।[৮]

বিবাহ অনুষ্ঠানে মহিলা এবং বাচ্চাদের অংশগ্রহণ করা জায়েয।[৯] ওলিমার দাওয়াতে যে বাড়িতে কোন বিদআত বা খারাপ কাজ (শরিয়ত বিরোধী কাজ) হবার কথা জানা যাবে সেখানে খানা খাবে না।[১০] যে মহিলার বিয়ে হচ্ছে সে যদি নিজেই ওলিমার খানা রান্না করে তো জায়েয।

রোযাদার ব্যক্তিরও দাওয়াত কবুল করা উচিৎ। সেখানে গিয়ে দাওয়াতকারীর জন্য দোয়া করবে এবং তাকে বলে দিবে যে, আমি রোযা রেখেছি।[১১]

---

১. বুখারী- আনাস (রা.)।
২. বুখারী, মুসলিম-আবু হুরায়রা (রা.)।
৩. প্রাগুক্ত।
৪. বায়হাকী, মিশকাত- আবু হুরায়রা (রা.)।
৫. বুখারী- আনাস (রা.)।
৬. আবু দাউদ।
৭. আহমাদ, আবু দাউদ।
৮. বুখারী, মুসলিম- আনাস (রা.)।
৯. বুখারী আহমাদ- আয়েশা (রা.)।
১০. আহমাদ, তিরমিযী- উমর (রা.)।
১১. মুসলিম- আবু হুরায়রা (রা.)।

স্ত্রীর উপর স্বামীর অধিকার

স্বামীর অনুগত থাকা স্ত্রীর উপর ফরজ এবং স্বামীকে কষ্ট দিলে স্ত্রীর গুনাহ্ হবে।[১]

যে স্ত্রী তার স্বামীকে কষ্ট দেয় তার উপর বেহেস্তের হুরীরা বদ দোয়া করে বলে, আল্লাহ্ তোমার উপর অভিশাপ করুন। তুমি কেন কষ্ট দিচ্ছ ? সে তো তোমার নিকট অল্প কিছু দিনের মেহমান। সে তোমার নিকট হতে পৃথক হয়ে তাড়াতাড়ি আমাদের নিকট চলে আসবে।[২]

যে স্ত্রীলোক মারা যাবে এবং তার স্বামী তার উপর সন্তুষ্ট থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[৩]

যে মহিলা পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়বে এবং তার গুপ্তাঙ্গকে (পর পুরুষ হতে) হেফাযত করবে এবং স্বামীর বাধ্যগত থাকবে, সে বেহেশতের যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ করবে।[৪]

যদি আল্লাহ্ তায়ালা ব্যতীত আর কাউকে সিজদা করা জায়েয হতো তাহলে মহিলাদেরকে তাদের স্বামীকে সিজদা করার জন্য হুকুম দেয়া হতো।[৫]

যে ব্যক্তি তার স্ত্রীকে নিজ প্রয়োজনে ডাকবে এবং স্ত্রী যদি অস্বীকৃতি জানায় তাহলে তার স্বামী তার উপর সন্তুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত ফেরেশতা তার উপর অভিশাপ করতে থাকে।[৬]

নেককার মহিলা হচ্ছে সেই মহিলা, যার দিকে চেয়ে তার স্বামী খুশী হবে এবং সে তার স্বামীর হুকুম মেনে চলবে এবং নিজের জীবন ও মাল দিয়ে তার স্বামীর বিরুদ্ধাচারণ করবে না।[৭]

যে মহিলা তার স্বামীকে অসন্তুষ্ট করে, তার নামায কবুল হয় না, যতক্ষণ না সে তার স্বামীকে সন্তুষ্ট করে।[৮]

মহিলারা সর্বদা নিজেকে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ও সুসজ্জিত রাখবে। হাত রঙ্গীন

---

১. সূরা নিসা ঃ ৬ষ্ঠ রুকু ; আহমাদ, ইবনে মাজা।
২. তিরমিযী, ইবনে মাজা- মুয়াজ (রা.)
৩. তিরমিযী, ইবনে মাজা- উম্মে সালমা (রা.)।
৪. মিশকাত- আনাস (রা.)।
৫. তিরমিযী- আবু হুরায়রা (রা.)।
৬. বুখারী, মুসলিম- আবু হুরায়রা (রা.)।
৭. নাসাঈ, শোয়াবুল ঈমান- আবু হুরায়রা (রা.)।
৮. শোয়াবুল ঈমান, মিশকাত- জাবের (রা.)।

রাখবে (মেহেন্দী দিয়ে), চোখে সুরমা দিবে, সুগন্ধী ব্যবহার করে পবিত্র হবে। অপরিস্কার অপরিচ্ছন্ন থাকবে না [১] এবং খুব পাতলা কাপড় পরবে না।[২]

স্বামীর (উপস্থিতিতে তার) অনুমতি ব্যতীত স্ত্রীর নফল ইবাদত করা; তা নামায বা রোজা যাই হোক না কেন, জায়েয হবে না।[৩]

মুহরেম ছাড়া কোন মহিলা (একাকী) একদিন- রাতের পথ সফর করবে না।[৪] স্ত্রী স্বামীর গোপনীয় কথা কারো নিকট বলবে না।[৫] তার সন্তানদের প্রতি সদয় হবে[৬] এবং তার সন্তানদের উপর বদদোয়া করবে না।[৭] কেননা সন্তানদের ব্যাপারে পিতা মাতার বদ-দোয়া কবুল হয়ে যায়। আর যদি কবুল হয়ে যায়, তাহলে এর প্রতিকার নেই।[৮]

রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন যে, যদি কোন মহিলার স্বামীর কোড়া উঠে এবং মহিলা তার জিহ্বা দ্বারা সে কোড়া চেটে নেয় বা তার স্বামীর নাক হতে হলুদ পানি বা রক্ত বের হয় এবং তা সাফ করে তবুও তার স্বামীর হক (অধিকার) আদায় হবে না।[৯]

কোন মহিলা যদি তার স্বামীকে (নিজ মালের) জাকাত দেয় তা জায়েয।[১০]

স্বামীর উপর স্ত্রীর অধিকার

স্ত্রীর অধিকার হচ্ছে স্বামীর উপর এটাই যে, স্বামী যেমন খাবে স্ত্রীকে তেমনি খাওয়াবে, যেমন সে পরবে তেমনি তাকে (সেই মানের কাপড়) পরাবে এবং যখন (কোন কারণে) মারবে তখন মুখমন্ডলের উপর মারবে না। স্ত্রীকে খারাপ বা অকথ্য ভাষায় গালি দিবে না এবং স্ত্রীর উপর অসন্তুষ্ট হয়ে বাড়ীর বাইরে গিয়ে রাত কাটাবে না।[১১]

---

১. আবু দাউদ, মিশকাত।
২. আবু দাউদ, ইবনে মাজা- আবু সাঈদ খুদরী (রা.)।
৩. বুখারী, মুসলিম- আবু হুরায়রা (রা.)।
৪. মুসলিম- ইবনে আব্বাস (রা.)।
৫. সূরা তাহরীম ঃ ১ম রুকূ।
৬. বুখারী, মুসলিম- আবু হুরায়রা (রা.)।
৭. মুসলিম- জাবের (রা.)।
৮. মুসনাদে বাজ্জার।
৯. । আহমাদ- আনাস (রা.)।
১০. বুখারী, মুসলিম- আয়েশা (রা.)।
১১. আহমাদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজা- মুয়াবিয়া কুশায়রী (রা.)।

যদি স্বামী তার স্ত্রীকে প্রহার করে, তাহলে অন্য লোকের মারার কারণ জিজ্ঞাসা করা নিষেধ।

যার স্ত্রী তাকে চড়া গলায় গালি গালাজ করে সে তাকে তালাক দিবে। যদি সন্তানাদির কারণে তালাক না দেয়, তাহলে তাকে উপদেশ দিবে কিন্তু দাসীর মত করে মারবে না। অর্থাৎ এমন মারা মারবে না যাতে কোন হাড় ভেঙ্গে যায় বা গায়ে মারের চিহ্ন ফুটে উঠে।[১]

রাসূলে কারীম (সঃ) বলেছেন মহিলারা বাম পাজরের হাড় হতে সৃষ্টি। এরা সোজা হয়ে থাকবে না। এ অবস্থায় তার থেকে ফায়েদা নিতে হবে। তাকে (সম্পূর্ণ) সোজা করতে গেলে তালাক দিতে হবে।[২]

পূর্ণ ঈমানদার সেই ব্যক্তি যার চরিত্র উত্তম এবং যে স্ত্রীকে ভালবাসে ও তার প্রতি সদয় থাকে।[৩]

একজন মুসলমানের উচিৎ তার স্ত্রীর ভাল গুণগুলোকে দেখা এবং খারাপ গুণগুলোকে এড়িয়ে যাওয়া। কেননা তার একটি গুণ খারাপ হলেও অন্যটি ভাল।[৪]

যে ব্যক্তির সামর্থ থাকা সত্ত্বেও স্ত্রী ও সন্তানদের ভরণ-পোষণে কৃপণতা করে, তবে তার স্ত্রী তার সম্পদ হতে স্বামীর অগোচরে প্রয়োজন মত খরচ করা জায়েয।[৫]

যে মাল নিজ স্ত্রী ও সন্তানদের জন্য খরচ করা হয়ে থাকে তাতে বেশী নেকী রয়েছে। এরচেয়ে কম নেকী হলো আল্লাহর পথে নিজ বন্ধুর জন্য খরচ করা হয়, তবে নিয়্যত থাকতে হবে যে, স্ত্রী- সন্তানদের ভরণ-পোষণ আমার উপর ফরজ এবং তা আমি আদায় করছি।[৬]

কিয়ামতের দিন মানুষের আমল নামায় সর্বপ্রথম (খরচ সম্পর্কিত) স্ত্রী ও সন্তানদের জন্য যে খরচ করেছিল তা উঠান হবে। কেউ যদি তার স্ত্রীকে পানি পান করায়ে থাকে, সে তারও সোয়াব পাবে।[৭]

---

১. আবু দাউদ- লাকীত বিন সবুরা (রা.)।
২. বুখারী, মুসলিম- আবু হুরায়রা (রা.)।
৩. আহমাদ, তিরমিযী- আবু হুরায়রা (রা.)
৪. মুসলিম, আহমাদ- আবু হুরায়রা (রা.)।
৫. বুখারী, মুসলিম- আয়েশা (রা.)।
৬. তবারানী।
৭. আহমাদ, তবারানী- ইরবাজ বিন সারিয়া (রা.)।

কারো জন্য এ অপরাধই যথেষ্ট যে, তার উপর যে সব লোকের ভরণ-পোষণ ফরজ তা সে আদায় করে না।[১]

স্ত্রী স্বামীর নিকট প্রয়োজনের অধিক খরচ চাইবে না। সেই মহিলাই উত্তম যে অল্প খরচাই সন্তুষ্ট থাকে।[২] স্ত্রীর মুখে নিজ হাতে কোন খাদ্যের গ্রাস (লোকমা) তুলে দিলে তাতেও সোয়াব রয়েছে।[৩] এমনকি স্ত্রীর সাথে সহবাস করাতেও নেকী রয়েছে।[৪] স্বামী নিজ স্ত্রীকে আল্লাহর ইবাদত করার ব্যাপারে সহায়তা করবে।[৫]

স্বামীর উচিৎ নহে যে, স্ত্রীর সন্তুষ্টির জন্য কোন হালাল বস্তুকে নিজের জন্য হারাম করে নেয়।[৬]

পর্দার বিবরণ

মহিলারা তাদের দৃষ্টি নিম্নমুখী রাখবে, গায়ের মুহরেম (যাদের সাথে বিবাহ হতে পারে) ব্যক্তির দিকে চাইবে না এবং নিজ সতর ঢেকে রাখবে। নিজের সৌন্দর্য্য অর্থাৎ গয়না, বুক, পেট প্রভৃতি প্রকাশ করবে না এবং মাথা চাদর দিয়ে ঢেকে রাখবে। স্বামী, পিতা, শশুর, আপন ছেলে, স্বামীর ঔরষজাত সন্তান, ভাই, বোনের ছেলে, নিজবাড়ীর মহিলারা, ক্রীতদাস ও দাসী ব্যতীত অন্য কারো সামনে নিজের সৌন্দর্য্য প্রকাশ করবে না।[৭]

যে সমস্ত নাবালেগ ছেলে এখনও মহিলাদের সম্পর্কে কোন জ্ঞান নেই তাদের সামনে পর্দা নেই।[৮]

মহিলারা যেন এমন শব্দ করে না চলে, যাতে তাদের সৌন্দর্য্য প্রকাশ পায়[৯] এবং গয়নার শব্দ শুনা যায় এবং শব্দ বিশিষ্ট কোন গয়না পরবে না।[১০] চলতে ফিরতে এদিক সেদিক চাইবে না এবং আস্তে আস্তে কথাবার্তা বলবে।[১১] মাথার খোপা উটের কুজের মতো (উঁচু) করে বাঁধবে না।[১২]

যে মহিলার অবস্থা ফাসেকানা (শরিয়ত বিরোধী) হয় বা তার কাজকর্ম ফাসেকী হয় তাহলে পর পুরুষের মত তার সাথে পর্দা করবে।[১৩]

---

১. মুসলিম- জাবের (রা.)।
২. ইবনে মাজা- আব্দুর রাহমান বিন সালেম (রা.)।
৩. বুখারী, মুসলিম- সাদ বিন আবী অক্কাস (রা.)।
৪. দারেমী- আবু যর (রা.)।
৫. আবু দাউদ, নাসাঈ- আবু হুরায়রা (রা.)।
৬. সূরা তাহরীম ঃ ১
৭. সূরা নূর- ৪র্থ রুকু, সূরা আহযাব।
৮. সূরা নূর- ৪র্থ।
৯. প্রাগুক্ত।
১০ আবু দাউদ।
১১ সূরা আহযাব।
১২. মুসলিম।
১৩. মিশকাত।

স্ত্রীকে স্বামীর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করা নিষেধ

রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি স্বামী-স্ত্রীর মাঝে অনৈক্য সৃষ্টি করে সে আমার তরিকার উপর নাই।[১]

স্বামী স্ত্রীর মাঝে মনো-মালিন্য সৃষ্টি করা বা ঝগড়া বাধানো শয়তানের কাজ।[২]

ব্যভিচারের নিকৃষ্টতা বর্ণনা

যে বৃদ্ধ পুরুষ ও বৃদ্ধা মহিলা ব্যভিচারিনী হবে (অর্থাৎ বৃদ্ধ বয়সেও ব্যভিচার করবে) কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'য়ালা তাদের দিকে রহমতের দৃষ্টিতে তাকাবেন না।[৩] যে মহিলা আতর লাগিয়ে কোন মজলিসে যাবে সে ব্যভিচারিনী (সমতুল্য)।[৪]

যে মহিলা সুগন্ধী লাগিয়ে মসজিদে যাবে, যতক্ষণ না গোসল করে সুগন্ধী দুর করবে ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'য়ালা তার নামায কবুল করবেন না।[৫] যে মহিলা পাতলা কাপড় পরে পুরুষদেরকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করে এবং নিজে পুরুষদের প্রতি আকৃষ্ট হয় সে জান্নাতের সুগন্ধী (হাওয়া) পাবে না।[৬] সালফে সলেহীনেরা এ ধরনের মহিলাদের ব্যভিচারিনী ও খারাপ বলে মনে করতেন।

মহিলাদের জন্য পুরুষদের পোষাক পরিধান নিষিদ্ধ

পুরুষদের মত জুতা ও পোষাক পরিচ্ছেদ পরিধান কারিনী মহিলাদের প্রতি রাসূলে কারীম (সা.) অভিসম্পাত (লানত) করেছেন।[৭]

তালাকের বিবরণ

আল্লাহ তায়ালার নিকট নিকৃষ্টতম হালালের মধ্যে তালাক একটি।[৮] পৃথিবীর বুকে এর মত ভয়ানক আর কিছু করা হয়নি।[৯]

হায়েজের অবস্থায় তালাক দেয়া জায়েয নয়। কিন্তু যদি কেউ হায়েজের

---

১. আবু দাউদ- আবু হুরায়রা (রা.)।

২. মুসলিম- জাবের (রা.)।

৩. তবারানী।

৪. ইবনে খুজায়মা- আবু মুসা (রা.)।

৫. ইবনে খুজায়মা- আবু হুরায়রা (রা.)।

৬. মুসলিম- আবু হুরায়রা (রা.)।

৭. আবু দাউদ- ইবনে আবী মুলায়কা (রা.)।

৮. আবু দাউদ, ইবনে মাজা- ইবনে উমর (রা.)।

৯. দারাকুতনী- মুয়াজ বিন জাবাল (রা.)।

অবস্থায় তালাক দিয়ে দেয় তাহলে তালাক হয়ে যাবে এবং তাকে ফিরিয়ে নেয়া (রজু করা) ওয়াজিব এবং গর্ভাবস্থায় তালাক দেয়া জায়েয।[১]

যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে মিলামিশার পূর্বেই তালাক দিয়ে দেয় এবং উক্ত মহিলার পূর্বের স্বামীর ঔরসজাত কন্যা থাকে তাহলে সে ইচ্ছা করলে সে মেয়েকে বিবাহ করতে পারে।[২]

বিবাহের পূর্বে তালাক দিলে তালাক হবে না।[৩] হাসতে হাসতে বা রহস্যচ্ছলে তালাক দিলে তালাক হয়ে যাবে।[৪] জোর পূর্বক তালাক প্রদান করালে তালাক হয় না[৫] এবং পাগলে তালাক দিলে তালাক হবে না।[৬]

স্ত্রী আযাদ (স্বাধীনা) হলে তিন তালাকে হারাম হয়ে যায়। আর স্ত্রী ক্রীতদাসী হলে দুই তালাকে হারাম হয়ে যায়।[৭]

একত্রে তিন তালাক দেয়া জায়েয নয়।[৮] যে ব্যক্তি একত্রে তিন তালাক দিবে তা তিন তালাক না হয়ে (গনণায়) এক তালাক রাজয়ী হবে।[৯]

ঘুমের অবস্থায় তালাক দিলে তালাক হয় না। অপ্রাপ্ত বয়স্ক বা বেহুস ব্যক্তি তালাক দিলে তা সঠিক হবে না।[১০]

রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, মহিলাদের বিবাহ কর এবং বিনা কারণে তাদের তালাক দিও না। কেননা আল্লাহ তায়ালা স্বাদ আস্বাদনকারী পুরুষ কিংবা মহিলাদের ভালবাসেন না। তালাক দেয়াই আল্লাহর আরশ কেঁপে উঠে।[১১]

যে ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিবে, যে তোহরে সে সঙ্গম করেনি। এভাবেই দ্বিতীয় এবং তৃতীয় তোহরে তালাক দিবে। এভাবে তিন তালাক দিলে তার স্ত্রী তার জন্য হারাম হয়ে যাবে। উল্লেখিত নিয়ম ব্যতীত অন্য কোন ভাবে তালাক দেয়া বিদআত। এইরূপ তালাক প্রদানকারী ব্যক্তি যদি তার পূর্বস্ত্রীকে

---

১. বুখারী, মুসলিম- ইবনে উমর (রা.)।
২. সূরা নিসা ঃ ২৩
৩. ইবনে মাজা, আবু ইয়ালা, হাকেম।
৪. আবু দাউদ, তিরমিযী- আবু হুরায়রা (রা.)।
৫. ইবনে মাজা, হাকেম- ইবনে আব্বাস (রা.)।
৬. আহমাদ, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজা।
৭. আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজা- আয়েশা (রা.)।
৮. সূরা বাকারা, ২৯ রুকু।
৯. আহমাদ, আবু দাউদ- ইবনে আব্বাস (রা.)।
১০. আহমাদ, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজা- আয়েশা (রা.)।
১১ তবারানী- আবু মুসা (রা.)।

আবার গ্রহণ করতে চায় তাহলে তার স্ত্রীর ইদ্দত পার হবার পর অন্য কোন ব্যক্তির সাথে বিয়ে হতে হবে এবং তার সাথে সঙ্গম হতে হবে। এরপর সে যদি ইচ্ছাকৃত ভাবে তাকে তালাক দেয় তাহলেই কেবল ইদ্দত পার হবার পর বিয়ে করতে পারবে।[১]

যে ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলে দেয় যে, 'তোমাকে এ অনুমতি দিলাম যে, তুমি ইচ্ছা করলে আমার নিকট থাকতে পার অথবা চলে যেতে পার।' তাহলে শরিয়তের দৃষ্টিতে এটা তালাক বলে গণ্য হবে না। তবে হ্যাঁ, স্ত্রী যদি স্বামীর দেয়া এ অধিকার গ্রহণ করে এবং চলে যায় তাহলে তালাক হয়ে যাবে।[২]

যদি কেউ কোন ব্যক্তিকে আপন স্ত্রীকে তালাক দেয়ার অধিকার দেয় এবং উক্ত ব্যক্তি যদি তালাক দেয়, তাহলে তালাক হয়ে যাবে।[৩]

যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলে যে, তুমি আমার উপর হারাম, তাহলে এ কথায় তালাক হবে না।[৪] কিন্তু কাফ্ফারা দিতে হবে এবং কাফ্ফারা হচ্ছে দশজন মিসকিনকে খানা খাওয়ান অথবা দশজন মিসকিনকে পরিধেয় কাপড় দেয়া কিম্বা গোলাম আযাদ করা। যে ব্যক্তি এ তিনটির কোন একটি করারও সামর্থ রাখে না, সে তিনদিন রোজা রাখবে।[৫]

খোলা* তালাকের বিবরণ

যে মহিলা কোন কারণবশত স্বামীর নিকট হতে তালাক নিতে চায়, সে স্বামীর নিকট হতে নেয়া মোহর ফেরত দিয়ে তালাক নিতে পারে। তার স্বামী তাকে এক তালাক দিবে[৬] এবং তার ইদ্দত হচ্ছে এক হায়েজ।[৭]

যে মহিলা বিনা কারণে তার স্বামীর কাছে তালাক চেয়ে নিবে, সে বেহেশতের

---

১. বুখারী, মুসলিম, সুনানে আরবা।

২. সূরা আহযাব ঃ ৪র্থ রুকু।

৩. রওজাতুন নাহ্দিয়া- আবু হুরায়রা, ইবনে আব্বাস (রা.)।

৪. সূরা তাহরীম ঃ ১ম রুকু।

৫. সূরা মায়েদা ঃ ৮৯।

৬. বুখারী- ইবনে আব্বাস (রা.)।

৭. আবু দাউদ, তিরমিযী- ইবনে আব্বাস (রা.)।

* স্বামীর নিকট হতে যে মোহর নিয়েছিল তা ফেরত দিয়ে এর বিনিময়ে স্ত্রী যে তালাক নিয়ে থাকে তাকে খোলা তালাক বলে।

হাওয়া (সুগন্ধী) পাবে না।[১] অথচ বেহেশতের হাওয়া চল্লিশ বছরের রাস্তার দূরত্ব হতে পাওয়া যাবে।[২]

বিনা প্রয়োজনে খোলা তালাক- কারিনী মহিলা মুনাফিক।[৩]

রাজায়াতের বিবরণ

যে ব্যক্তি তার স্ত্রীকে এক তালাক দেয়ার পর তাকে পুনরায় ফিরিয়ে নিতে ইচ্ছা করে, সে তালাক দেয়ার সময় এবং ফিরিয়ে নেয়ার সময় (রাজয়াত করার সময়) সাক্ষ্য রাখবে।[৪]

ইদ্দতের বিবরণ

যে মহিলার স্বামী মারা যাবে সে চার মাস দশদিন ইদ্দত পালন করবে[৫] এবং যে আযাদ মহিলাকে তার স্বামী তালাক দিবে সে তিন হায়েজ পর্যন্ত ইদ্দত পালন করবে।[৬] যে মহিলার হায়েজ হয় না (বন্ধ্যা বা নাবালিকা কিম্বা বেশী বয়সের কারণে) সে তিন মাস পর্যন্ত ইদ্দত পালন করবে।[৭]

ইদ্দত পালন কালীন সময়ে বিয়ে করা হারাম।[৮]

গর্ভবতী মহিলার স্বামী মারা যাক, কিম্বা তাকে তালাক দেক, সে আযাদ হোক বা ক্রীতদাসী সে সন্তান প্রসব না হওয়া পর্যন্ত ইদ্দত পালন করবে।[৯]

যে ব্যক্তি বিয়ে করে স্ত্রীর সঙ্গলাভ করার পূর্বেই তালাক দিবে তাকে ইদ্দত পালন করতে হবে না। কিন্তু তাকে তালাক দেয়ার সময় তার স্বামী অবশ্যই দুই খানা কাপড় দিয়ে তালাক দিবে।[১০]

যে ব্যক্তি তার ক্রীতদাসী স্ত্রীকে তালাক দিবে, সে দুই হায়েজ পর্যন্ত ইদ্দত পালন করবে। যার হায়েয হয় না সে দুইমাস ইদ্দত পারন করবে। আর

---

১. আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযী- ইবনে আব্বাস (রা.)।

২. ইবনে মাজা -ইবনে আব্বাস (রা.)।

৩. নাসাঈ- আবু হুরায়রা (রা.)।

৪. আবু দাউদ- ইমরান বিন হোসাইন (রা.)।

৫. সূরা বাকারা : ২৩৪

৬. সূরা বাকারা : ২২৮

৭. সূরা তালাক : ৪

৮. সূরা বাকারা : ২৩৫

৯. সূরা তালাক : ৪

১০ সূরা আহযাব : ৪৯

ক্রীতদাসী মহিলার স্বামী মারা গেলে সে দুইমাস পাঁচদিন ইদ্দত পালন করবে।

যে মহিলাকে তালাক দেয়ার পর তার এক বা দুই হায়েজ হয়ে তা বন্ধ হয়ে যাবে সে নয় মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। এ সময় যদি গর্ভের লক্ষণ দেখা যায় তাহলে সে সন্তান প্রসব পর্যন্ত ইদ্দত পালন করবে। আর যদি গর্ভপ্রকাশ না পায় তাহলে নয় মাস অপেক্ষা করার পর তিন মাস ইদ্দত পালন করবে এরপর অন্যত্র বিয়ে করতে পারবে।[১]

যে মহিলার স্বামী নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে (হারিয়ে যাবে) অর্থাৎ জানা যাবে না যে, সে কোথায় আছে, জীবিত আছে কি না ? উক্ত মহিলা তার স্বামীর জন্য চার বছর অপেক্ষা করবে। চার বছর পর চার মাস দশদিন ইদ্দত পালন করবে এরপর অন্যত্র বিয়ে করতে পারবে, এটাই হযরত উমর (রা.) এর ফতওয়া বা ফয়সালা।[২]

যে মহিলাকে তার স্বামী তালাক দিয়েছে এবং তালাকের পর তার দুই হায়েজ অতীত হয়েছে। তৃতীয় হায়েজে পদার্পন করতে করতেই তার স্বামী মারা গেল, এ অবস্থায় তার ইদ্দত তিন হায়েজই হবে এবং সে তার স্বামীর মালের উত্তরাধিকারিনী হবে না এবং তার স্বামীও তার মালের অংশীদার হবে না।[৩]

যে মহিলার স্বামী মারা যাবে সে, চার মাস দশদিন পর্যন্ত রঙ্গীন (আকর্ষণীয়) পোষাক পরবে না। কিন্তু রঙ্গীন সুতা দিয়ে তৈরী কাপড় পরা জায়েয এবং সুরমা লাগাবে না ও সুগন্ধী ব্যবহার করবে না। কিন্তু হায়েজ হতে পবিত্র হবার সময় প্রয়োজন পরিমান সুগন্ধী গুপ্তাঙ্গে লাগাতে পারে, দুর্গন্ধ দূর করার জন্য। স্বামী মারা যাবার পর মুখের লাবন্য পরিস্ফুটক কোন জিনিস ব্যবহার করবে না, কেননা এতে চেহারা আকর্ষণীয় হয়ে উঠে। তবে রাতে লাগিয়ে সকালে ধুয়ে ফেললে কোন অসুবিধা নাই এবং সুগন্ধী তেল লাগিয়ে চিরুনী করবে না, কিংবা মেহেন্দীও লাগাবে না। তবে কুলপাতা দিয়ে মাথা ধোয়া জায়েয। স্বামী মারা গেলে স্ত্রীর জন্য গেরুয়া ও কুসুম্বী রংয়ের কাপড় পরা যাবে না এবং কোন অলংকারও ব্যবহার করা যাবে না।[৪]

---

১. দারকুতনী।

২. মুয়াত্তা মালেক, মিশকাত- সাঈদ ইবনে মুসাইয়েব (রা.)।

৩. মালেক, শাফেয়ী (রহ.)।

৪. মুয়াত্তা ইমাম মালেক- সুলায়মান বিন ইয়াসার (রা.)।

স্বামীর মৃত্যুর সময় স্ত্রী যেখানে থাকবে, সেখানেই ইদ্দত পালন করবে। ইদ্দতের মাঝে অন্য কোন জায়গায় যাবে না। যদি তার স্বামীর মৃত্যুর খবর দূর দেশ হতে আসে তাহলে স্ত্রী যেখানে এ সংবাদ পাবে, সেখানে ইদ্দত কাল কাটাবে।[১] কিন্তু তালাক প্রাপ্তা মহিলা যদি একাকী থাকায় চোর ইত্যাদির ভয় থাকে তাহলে অন্যত্র গিয়ে ইদ্দত পালন করা জায়েয।[২]

তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে তার ইদ্দত পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তার স্বামী বা আত্মীয় স্বজন ঐ বাড়ী হতে বের করে দিবে না এবং সেও নিজে বাড়ী হতে চলে যাবে না। কিন্তু যদি সে ব্যভিচার করে বসে তাহলে তাকে (স্বামীর) বাড়ী হতে বের করে দিবে।[৩]

কোন মহিলাকে তার ইদ্দত চলাকালীন সময়ে বিবাহের পয়গাম (প্রস্তাব) দেয়া জায়েয নয়। তবে একথা বলতে পারে যে, কোন ভাল মহিলা পেলে আমার বিয়ে করার ইচ্ছা রয়েছে, এটা বলা জায়েয।[৪]

ভরণ-পোষণের (নাফাকার) বিবরণ

রাজয়ী তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর ইদ্দত কালীন খোরপোষ দেয়া তার স্বামীর উপর ওয়াজিব।[৫]

যে মহিলাকে তিন তালাক দেয়া হয়েছে এবং যে মহিলার স্বামী মারা গেছে তাদের খোরপোষ দেয়া ওয়াজিব নহে।[৬] গর্ভবতী হলে এদের খোরপোষ দেয়া ওয়াজিব।[৭]

দরিদ্র সন্তানের খোরপোষ ধনী পিতার উপর ওয়াজিব।[৮] অনুরূপ দরিদ্র পিতার খোরপোষ ধনী সন্তানের উপর ওয়াজিব ।[৯] আর দাস ও দাসীর খোরপোষ দেয়া তার মালিকের উপর ওয়াজিব।[১০]

---

১. আবু দাউদ, নাসাঈ, মিশকাত- উম্মে সালামা (রা.)।

২. মুয়াত্তা মালেক, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজা, দারেমী- জয়নব বিনতে কা'ব (রা.)।

৩. সূরা তালাক ঃ ১ম রুকু।

৪. সূরা বাকারা ঃ ৩০ রুকু

৫. আহমাদ, নাসাঈ- ফাতেমা বিনতে কায়স (রা.)।

৬. মুসলিম- ফাতেমা বিনতে কায়স (রা.)।

৭. সূরা তালাক ঃ ১ম রুকু

৮. বুখারী, মুসলিম- আয়েশা (রা.)।

৯. আবু দাউদ, ইবনে মাজা- আমর ইবনে শোয়াইব (রা.)।

১০ মুসলিম- আবু হুরায়রা (রা.)।

(দরিদ্র) আত্মীয় স্বজনের খোরপোষ (ধনী) আত্মীয় স্বজনের উপর ওয়াজিব নহে। কিন্তু আত্মীয়তার জন্য দেয়া জায়েয।[১] যার খোরাক দেয়া যে ব্যক্তির উপর ওয়াজিব, তার কাপড়, থাকার জায়গা দেয়াও ওয়াজিব।

দুধ পানের বিবরণ

যে শিশু কোন মহিলার দুধ পাঁচ বার পান করবে এ শর্তে যে, সে মহিলার বুকে দুধ থাকে এবং শিশুটি দুই বছর বয়সের মধ্যে দুধ পান করবে, তাহলে সে মহিলা এ বাচ্চার উপর হারাম হয়ে যাবে।[২] বেশী বয়সের (দু'য়ের অধিক) সন্তান দুধ পান করলে এতে মতভেদ রয়েছে। কারো কারো নিকট বেশী বয়সের দুধ পানকারী ও দুধ পানকারিনী হারাম হয়ে যাবে এবং কারো করো মতে হারাম হবে না।[৩] বংশানুক্রমে যেমন হারাম সাব্যস্ত হয়, দুধ পান করলে সেরূপ হুরমত সাব্যস্ত হয়।[৪]

যদি কোন মহিলা একথা বলে (দাবী করে) যে, আমি উমুক ছেলেকে বা মেয়েকে দুধ পান করিয়েছি তাহলে তার কথা গ্রহণীয় হবে।[৫]

সন্তান লালন পালনের বিবরণ

সন্তান লালন পালনের জন্য তার মাতাই উত্তম, যতক্ষণ না সে অন্যত্র বিয়ে করে।[৬] অতপর সন্তানের প্রতিপালন করবে তার খালা অতপর তার আব্বা।[৭] অতপর আত্মীয়দের মাঝে ভাল মনে করে বিচারক যাকে এ কাজের জন্য নিযুক্ত করে।[৮]

যখন সন্তানের জ্ঞান বৃদ্ধি হবে তখন সে ইচ্চা করলে মায়ের সাথে থাকতে পারবে বা ইচ্ছা করলে পিতার সাথে থাকবে।[৯]

যে বাচ্চার মা-বাপ বা নিকটাত্মীয় কেউ থাকবে না, তাকে একজন নেককার লোক প্রতিপালন করবে।[১০]

---

১. তিরমিযী- আবু দাউদ।
২. মুসলিম- আয়েশা (রা.)।
৩. মুসলিম- আয়েশা (রা.)।
৪. বুখারী, মুসলিম- ইবনে আব্বাস (রা.)।
৫. বুখারী- উকবা (রা.)।
৬. আহমাদ, আবু দাউদ- আব্দুল্লাহ বিন আমর (রা.)।
৭. বুখারী- বারা ইবনে আ'যেব।
৮. মুসনাদে আব্দুর রাজ্জাক- ইকরেমা (রা.)।
৯. আহমাদ, সুনানে আরবা- আবু হুরায়রা (রা.)।
১০. আহমাদ।

ইলা'র বিবরণ

যে ব্যক্তি এ কসম করবে যে, আমি চার মাস পর্যন্ত স্ত্রীর নিকট যাব না, তাহলে চার মাস পার হওয়ার পর সে ইচ্ছা করলে ঐ স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে পারে কিম্বা তালাকও দিতে পারে।[১] আর যদি চার মাসের কম সময়ের জন্য কসম করে তাহলে স্ত্রী থেকে দুরে থাকবে উক্ত সময় অতিক্রম না হওয়া পর্যন্ত।[২]

লেয়ানের বিবরণ

যখন স্বামী স্ত্রীকে ব্যভিচারের অপবাদ দিবে এবং স্ত্রী ব্যভিচারের কথা অস্বীকার করবে এবং স্বামী তার অভিযোগের ব্যাপারে অটল থাকবে তখন লেয়ান করবে। লেয়ানের সুরত হচ্ছে- স্বামী চার বার সাক্ষ্য দিবে যে, আমি সত্যবাদী এবং পঞ্চম বার বলবে, আমার উপর আল্লাহর লা'নত (অভিসম্পাত) যদি আমি মিথ্যাবাদী হই। অতপর স্ত্রী সাক্ষ্য দিবে চার বার একথা বলে যে, আমার স্বামী মিথ্যুক এবং পঞ্চম বার বলবে, সে যদি সত্যবাদী হয়ে থাকে তাহলে আমার উপর আল্লাহর ক্রোধ নিপতিত হোক।[৩] এমতাবস্থায় হাকিম এদের দুইজনের মাঝে বিচ্ছেদ করে দিবে এবং এ পুরুষের জন্য উক্ত মহিলা চিরদিনের দিনের জন্য হারাম হয়ে যাবে[৪] এবং লেয়ানের সন্তানের অধিকারী হবে তার মা। অর্থাৎ সন্তান মায়ের নামে সমাজে পরিচিতি পাবে, পিতার নামে নহে।[৫]

যে ব্যক্তি কোন মহিলাকে জিনার (ব্যভিচারের) অপবাদ দিবে এবং এ ব্যাপারে চারজন সাক্ষী নিয়ে আসতে ব্যর্থ হবে সে ব্যক্তি কাযেফ অর্থাৎ অপবাদদাতা, তাকে শাস্তি দিতে হবে অর্থাৎ তাকে ৮০ আশি দোররা (বেত্রাঘাত) মারতে হবে।[৬]

জেহারের বিবরণ

যে ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলে যে, তুমি আমার নিকট আমার মায়ের পিঠের মত বা বলে, তোমাকে আমার মায়ের পিঠের মত মনে করি, কিম্বা স্ত্রীর কোন অঙ্গকে মায়ের কোন অঙ্গের সাথে তুলনা করে তাহলে এ স্ত্রীর সাথে সহবাস করার পূর্বে কাফ্ফারা দেয়া ওয়াজিব।[৭] জেহারের কাফ্ফারা হচ্ছে- একজন মুমিন গোলাম

---

১. সূরা বাকারা ঃ ২২৬, ২২৭, বুখারী- ইবনে উমর (রা.)।

২. বায়হাকী- ইবনে আব্বাস (রা.)।

৩. সূরা নূর ঃ প্রথম রুকু, মুসলিম।

৪. বুখারী, মুসলিম- ইবনে উমর (রা.)।

৫. মুয়াত্তা- ইবনে উমর (রা.)।

৬. সূরা নূর ঃ ৪

৭. সূরা মুজাদিলা ঃ ১ম রুকু।

আযাদ করা, যে ব্যক্তি গোলাম আযাদ করতে সমর্থ হবে না সে ষাটজন মিসকিনকে খানা খাওয়াবে, যে ব্যক্তি মিস্‌কিন খাওয়াতে সমর্থ হবে না সে একাধারে ষাটটি রোজা রাখবে।[1]

যদি কাফ্‌ফারা প্রদান কারীকে ইমাম (রাষ্ট্রপ্রধান) কোন সাহায্য করেন, তা জায়েয এবং কাফ্‌ফারা দাতা যদি গরীব হয় এবং ইমাম তাকে যা সাহায্য করেছে সেটা নিজের পরিবারের জন্য খরচ করে, তাহলে নিষেধ নেই।[2]

যে ব্যক্তি কাফ্‌ফারা দেয়ার পূর্বেই স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করে ফেলে তাকে একবার কাফ্‌ফারা দিতে হবে। কিন্তু কাফ্‌ফারা দেয়ার পূর্বে আর যেন মেলামেশা না করে।[3]

সন্তানের সাথে স্নেহ-সদ্ব্যবহার করার বিবরণ

ছোট বাচ্চাদের মুখে চুম্বন দেয়ায় আল্লাহ্ পাকের অনুগ্রহ হয়।[4] মেয়েদের প্রতিপালনে যে কষ্ট হয় এর উপর ধৈর্য ধরলে তা জাহান্নামের আগুন হতে মুক্তি পাবার উপায় হয়।[5] রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি তার দুই মেয়েকে বা দুইবোনকে তাদের বালেগ হওয়া পর্যন্ত লালন পালন করবে, সে এবং আমি জান্নাতে এমনভাবে থাকবো; যেমন তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুলীদ্বয়ের মাঝে ব্যবধান রয়েছে।[6] আর যে ব্যক্তি তাদের এলেম শিক্ষা দিল, সে তাদের প্রতি ইহ্‌সান করলো এবং তাদের (সুপাত্রে) বিয়ে দিল, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[7]

রাসূলে কারীম (সঃ) আরো ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি তার মেয়েকে জীবন্ত কবরস্থ্ করেনি, তাকে ঘৃণা বা তুচ্ছ জ্ঞান করেনি এবং নিজের ছেলের মত তাকে স্নেহ ও আদর করবে, আল্লাহ্ তা'য়ালা তাকে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন।[8] রাসূলে কারীম (সঃ) একথাও বলেছেন যে, যে ব্যক্তির তিনটি মেয়ে হবে এবং সে তাদের লালন পালনের কষ্টে ধৈর্য্য ধরবে, তাহলে আল্লাহ্ তা'য়ালা তাকে

---

১. সূরা মুজাদিলা ঃ ১ম রুকু।
২. আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযী- সালমা বিন সাখর (রাঃ)।
৩. সুনানে আরবা- ইবনে আব্বাস (রাঃ)।
৪. বুখারী, মুসলিম- আয়েশা (রাঃ)।
৫. প্রাগুক্ত।
৬. মুসলিম- আনাস (রাঃ)।
৭. ইবনে হিব্বান (রাঃ)।
৮. হাকেম-ইবনে আব্বাস (রাঃ)।

বেহেশ্‌ত প্রবেশ করাবেন। আর যে ব্যক্তির দুইটি কন্যা হবে তার জন্যও এ সুসংবাদ রয়েছে। বরং যার একটি মাত্র কন্যা জন্মিবে তার জন্যও উক্ত সুসংবাদ রয়েছে।[১]

সন্তানের উত্তম নাম রাখা ও খারাপ নাম পরিবর্তন করা

আল্লাহ্ তা'য়ালার নিকট খুব প্রিয় নাম হচ্ছে আবদুল্লাহ্ এবং আবদুর রহমান।[২] রাসূলুল্লাহ (সঃ) ইরশাদ করেন যে, তোমাদের সন্তানাদির নাম নবীদের নাম অনুযায়ী রাখবে।[৩]

সবচেয়ে খারাপ নাম হচ্ছে শাহান শাহ্ (রাজাধিরাজ বা জগতাধিপতী)[৪]

উম্মুল মুমেনিন হযরত উম্মে সালামার এক মেয়ের নাম বাররাহ্ (برة) ছিল রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তার নাম জয়নাব রাখেন।[৫] রাসূলে কারীম (সঃ) এর এক স্ত্রীর নাম বাররাহ্ ছিল তিনি তার নাম পরিবর্তন করে জুঅয়রিয়াহ রাখেন।[৬] হযরত উমর (রাঃ) এর মেয়ের নাম ছিল আসিয়া عاصية (অবাধ্য, আল্লাহ তায়ালার হুকুম অমান্যকারী) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তার নাম রাখেন জামীলা (সুন্দরী)।[৭] আর এক ব্যক্তির নাম ছিল আসরাম নবী করীম (সঃ) তার নাম রাখেন জুরআ[৮] (সাহসী) এবং আরেক জনের নাম ছিল হুজন (চিন্তা) তার নাম পরিবর্তন করে রাখেন সাহাল (সহজ)।[৯] এভাবেই যার নাম অর্থের দিক দিয়ে খারাপ হতো তার নাম পরিবর্তন করে দিতেন।

ছেলে মেয়েদের আদব শিক্ষা দেয়ার বিবরণ

আলেম (জ্ঞানী) ও জাহেল (মুর্খ) কখনো সমান হতে পারে না।[১০] পিতার উপর পুত্রের জন্য সবচেয়ে বড় অনুগ্রহ-অনুদান হচ্ছে তাকে জ্ঞান ও আদব কায়দা শিক্ষা দেয়া।[১১]

---

১. হাকেম- আবু হুরায়রা (রাঃ)।
২. মুসলিম-ইবনে উমর (রাঃ)।
৩. আবু দাউদ- আবু অহাব জুশামী (রাঃ)।
৪. বুখারী- আবু হুরায়রা (রাঃ)।
৫. মুসলিম-জয়নব বিনতে আবী সালামা (রাঃ)।
৬. মুসলিম-ইবনে আব্বাস (রাঃ)।
৭. মুসলিম-ইবনে উমর (রাঃ)।
৮. আবু দাউদ।
৯. বুখারী- আব্দুল হোমাইদ (রাঃ)।
১০ সূরা যুমার : ৯
১১. মুসলিম- আবু মুসা (রাঃ)।

মৃত্যুর পর মানুষের আমল (এর সোয়াব) ছিন্ন হয়ে যায় কিন্তু যদি সাদকায়ে জারিয়া করে যায়, বা কাউকে জ্ঞান শিক্ষা দিয়ে যায়, কিম্বা সুসন্তান রেখে যায় এবং সে সন্তান তার পিতার জন্য দোয়া করে তাহলে এর সওয়াব তার কাছে সর্বদা পৌছতে থাকে।[১]

নিছক দুনিয়া লাভের উদ্দেশ্যে দ্বীনি শিক্ষা অর্জন করা নিজেকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করার শামিল।[২]

জারজ সন্তানের বিবরণ

জারজ সন্তান মহিলার হবে (তার মায়ের নামে পরিচিত হবে) এবং ব্যভিচারী সন্তান হতে বঞ্চিত হবে (মিরাস এবং বংশ পরিচয় হতে) এবং তার জন্য রয়েছে পাথর ছুড়ে হত্যা এবং ব্যভিচারী (জিনাকারী) ব্যক্তির সাথে ঐ সন্তানের কোন সাদৃশ্য গ্রহণ যোগ্য হবে না।[৩]

হায়েজ অবস্থায় (অর্থাৎ হায়েজ হতে পাক হবার পর) কোন ক্রীতদাসীর সাথে তিন ব্যক্তি সঙ্গম করে এবং এতে ক্রীতদাসীর গর্ভে কোন বাচ্চা জন্মে আর উক্ত তিন জনই সে সন্তানের দাবী করে তাহলে এদের মাঝে লটারী করা হবে এবং যার নাম উঠবে সেই এ সন্তানের অধিকারী হবে।[৪]

আত্মীয়তা রক্ষা ও পিতামাতার অধিকার

আত্মীয়তার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী খিদমত পাবার অধিকারী হচ্ছে মা। মায়ের পর পিতা। পিতার পর যারা খুবই নিকটাত্মীয়।[৫]

মাতাপিতা যদি কাফের হয় তবুও দুনিয়াতে তাদের সাথে সদয় ও সদ্ব্যবহার করতে হবে।[৬] যে ব্যক্তি মাতাপিতা উভয়কে বা একজনকে বৃদ্ধ অবস্থায় পেল অথচ তাদের খিদমত করল না, সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।[৭]

হযরত উমর (রা.) তার এক কাফের ভাইকে একখানা রেশমী চাদর উপহার

---

১. মুসলিম- আবু হুরায়রা (রা.)।

২. প্রাগুক্ত।

৩. বুখারী, মুসলিম- আয়েশা (রা.)।

৪. দারেমী।

৫. বুখারী, মুসলিম- আবু হুরায়রা (রা.)।

৬. সূরা লোকমান ঃ ১৫

৭. মুসলিম- আবু হুরায়রা (রা.)।

দিয়েছিলেন।[১] বিধর্মী আত্মীয় স্বজনদের সাথেও আত্মীয়তা সম্পর্ক রক্ষার হুকুম রয়েছে এবং পিতামাতার অবাধ্য হওয়া কবিরা গুনাহ।[২] আর মা-বাপকে গালি দেয়াও কবিরা গুনাহ।[৩]

নিজ পিতার বন্ধুদের সাথে সদ্ব্যবহার করা খুব বড় সেলারহমীর কাজ।[৪] আত্মীয়তা রক্ষা বা সেলারহমী করায় রুজিতে বরকত হয় এবং দীর্ঘায়ু লাভ হয়।[৫] আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী বেহেশতে প্রবেশ করবে না।[৬]

সদ্ব্যবহার কারীর সথে সদ্ব্যবহার করা প্রকৃত পক্ষে সদ্ব্যবহার নয় (এটা হচ্ছে তর প্রতিদান) প্রকৃত সদ্ব্যবহারকারী হচ্ছে ঐ ব্যক্তি, যে সম্পর্ক ছিন্নকারীর সাথে সদ্ব্যবহার করে।[৭]

যে ব্যক্তি কারো সাথে খারাপ আচরণ করে, তার সাথে ভাল আচরণ করা বিরাট নেকী ও সোয়াবের কাজ।[৮]

যে সন্তানের উপর তার পিতা সন্তুষ্ট থাকেন, আল্লাহ্ তায়ালাও তার উপর সন্তুষ্ট থাকেন এবং যে সন্তানের উপর তার পিতা অসন্তুষ্ট হন, আল্লাহ্ তায়ালাও তার উপর অসন্তুষ্ট হন।[৯]

মা যদি (সঙ্গত কারণে) পুত্রকে তার স্ত্রীকে তালাক দিতে বলে তাহলে পুত্র স্ত্রীকে তালাক দিবে।[১০] তদ্রূপ পিতা যদি সঙ্গত কারণে পুত্রকে তার স্ত্রীকে তালাক দিতে বলে পুত্র স্ত্রীকে তালাক দিবে।[১১]

অস্বীকার করার উদ্দেশ্য মাতা পিতার প্রতি উহঃ শব্দ করাও জায়েয নহে।[১২]

---

১. বুখারী- ইবনে উমর (রা.)।

২. বুখারী, মুসলিম- আসমা বিনতে আবু বকর (রা.)।

৩. বুখারী, মুসলিম- ইবনে উমর (রা.)।

৪. মুসলিম- ইবনে উমর (রা.)।

৫. বুখারী, মুসলিম- আনাস (রা.)।

৬. বুখারী, মুসলিম- জুবাইর বিন মুতেম।

৭. বুখারী- ইবনে উমর (রা.)।

৮. মুসলিম- আবু হুরায়রা (রা.)।

৯. তিরমিযী- আব্দুল্লাহ বিন আমর (রা.)।

১০ তিরমিযী, ইবনে মাজা- আবু দারদা (রা.)।

১১. আবু দাউদ, তিরমিযী- ইবনে উমর (রা.)।

১২. সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ২৩ নং আয়াত।

এক ব্যক্তির সিলারহমী ছিন্ন করার কারণে তার গোত্রের লোকেরা আল্লাহ পাকের রহমত হতে বঞ্চিত হয়ে যায়।[১]

যে ব্যক্তি ইসলামী রাষ্ট্র প্রধানের বিদ্রোহী হবে, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করবে, আল্লাহ্ তায়ালা তার উপর দুনিয়ায় আজাব নাজিল করেন এবং সে পারকালে লাঞ্ছিত হবে।[২]

সেলারহমীতে দুধমায়ের হক মায়ের সমান।[৩] যে ব্যক্তি মাতা-পিতার অবাধ্য ছিল সে যদি, তাদের মৃত্যুর পর তাদের জন্য দোয়া করতে থাকে তাহলে সে অবাধ্য থাকে না। তাকে পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারকারী হিসেবে লিপিবদ্ধ করা হয়।[৪]

মা-বাপ যদি সন্তানের উপর অন্যায়-অবিচার করে থাকে তবুও তাদের আনুগত্য করা জরুরী।[৫]

পিতা-মাতার দিকে রহমতের দৃষ্টিতে চাইলে একটি হজ্বে মাকবুলের সোয়াব লেখা হয়। এভাবে যতবার রহমতের নজরে চাইবে প্রতিবারে হজ্বে মাকবুলের সোয়াব লেখা হবে।[৬] বড় ভাইয়ের হক (অধিকার) পিতার (হকের) অধিকারের মত।[৭]

বিধবা মহিলাদের বিবাহ দেয়ার বিবরণ

আল্লাহ্ তায়ালা ইরশাদ করেন-

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَائِكُمْ
اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ -

অর্থৎ- আর তোমাদের মাঝে যারা জুড়িহীন আর তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যে যারা সচ্চরিত্রবান তাদের বিবাহ দাও। তারা যদি গরীব হয়, তাহলে আল্লাহ

১. বায়হাকী- আব্দুল্লাহ বিন আবী আওফা (রা.)।
২. তিরমিযী, আবু দাউদ- আবী বাক্‌রাতা (রা.)।
৩. আবু দাউদ- আবু তুফাইল (রা.)।
৪. বায়হাকী, মিশকাত- আনাস (রা.)।
৫. বায়হাকী।
৬. প্রাগুক্ত।
৭. বায়হাকী, মিশকাত- সাঈদ ইবনুল আ'স (রা.)।

তা'আলা নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে ধনী করে দিবেন। আল্লাহ বড়ই প্রশস্ততা বিধানকারী এবং মহাবিজ্ঞ।[১] রাসূলুল্লাহ (সা.) হযরত আলীকে (রা.) বলেন, যখন কোন বিধবা মহিলার জন্য সঙ্গী পেয়ে যাবে তখন তাদের বিয়ে দিতে মোটেই দেরী করবে না।[২] হযরত রাসূলে কারীম (সা.) এর মেয়ে রোকাইয়ার বিয়ে আবু লাহাবের পুত্র উতবার সাথে হয়েছিল। এরপর হযরত উসমান (রা.) এর সাথে বিয়ে হয়। হযরত ফাতেমা (রা.) এর কন্যা উম্মে কুলসুমের বিয়ে প্রথমে হযরত উমর (রা.) এর সাথে হয়েছিল। এরপর হযরত জাফর (রা.) এর পুত্র মুহাম্মদের সাথে বিয়ে হয়। মুহাম্মদ মারা যাবার পর জাফর (রা.) এর আরেক পুত্র আব্দুল্লাহর সাথে বিয়ে হয়। হযরত উসমান (রা.) এর মায়ের পক্ষের এক বোন উম্মে কুলসুম (রা.) এর বিয়ে সর্বপ্রথম হযরত জায়েদ বিন হারেসার সাথে হয়। তিনি শাহাদাত বরণ করলে জুবাইর বিন আওয়াম এর সাথে বিয়ে হয়। তিনি ইন্তিকাল করলে তৃতীয়বার আমর বিন আস বিন আওফের সাথে বিয়ে হয়।

একমাত্র হযরত আয়েশা (রা.) ছাড়া রাসূলুল্লাহ (সা.) এর অন্যান্য স্ত্রীরা এমনটি ছিলেন যে, কারো ইতিপূর্বে একস্বামী মারা গেছে, কারো দুই জন স্বামী, কারো তিন জন স্বামী মারা গেছে, আর কেউ কেউ তালাক প্রাপ্তা ছিলেন। সুতরাং যে ব্যক্তি কোন মহিলার দ্বিতীয় বিয়েকে দোষণীয়, অপমান-কর মনে করে, সে প্রকৃত পক্ষে মুসলমান নহে।[৩]

আকীকার বিবরণ

যখন কারো ঘরে কোন ছেলে বা মেয়ে জন্ম গ্রহণ করবে, তখন প্রথমে তাকে গোসল করিয়ে নেবে এবং পাক সাফ কাপড়ে জড়িয়ে নিবে[৪] এবং তার কানে আযান দিবে।[৫] এও বর্ণিত হয়েছে যে তার ডান কানে আযান এবং বাম কানে একামত বলা হলে তাকে আঁতুর ঘরে কোন ব্যাধিতে ক্ষতি করবে না এবং হাইয়া আলাস্ সলাহ এবং হাইয়া আলাল ফালাহ বলার সময় নামাযের আযানে যেভাবে

১. সূরা নূর ঃ ৩২

২. তিরমিযী- হযরত আলী (রা.)।

৩. তাকবিয়াতুল ঈমান, লাহোর, পৃ. ২৭৮

৪. বুখারী, মুসলিম- হযরত আসমা (রা.)।

৫. তিরমিযী, আবু দাউদ- আবু রা'কে (রা.)।

দুইদিকে মুখ ঘুরাই সেভাবে দুই দিকে মুখ ঘুরাবে।[১]

প্রথম দিন অথবা সপ্তম দিন বাচ্চার নাম রাখবে এবং সপ্তমদিন বাচ্চার মাথা ন্যাড়া করে দিবে[২] এবং মাথার চুলের সম পরিমাণ ওজনের রোপ্য সাদকা করবে। তবে এ হাদীসটি জয়ীফ[৩] এবং সপ্তম দিনে আকীকা করবে। অর্থাৎ যদি ছেলে হয় তাহলে দুইটি ছাগল বা দুইট বকরী এবং মেয়ে হলে একটি ছাগল বা একটি বকরী জবেহ্ করবে।[৪] ছেলের পক্ষ থেকে একটি ছাগল বা একটি বকরী জবেহ্ করলেও হয়ে যাবে।[৫]

রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, যে সন্তানের আকীকা করা হয় না সে তার আকীকার জন্য বন্ধক থাকে।[৬] (এর এক অর্থ হতে পারে যে, সে তার পিতা-মাতার জন্য শাফায়াত করবে না।)

খাত্‌নার বিবরণ

খাতনা করা হযরত ইব্রাহীমের (আ.) এর সুন্নাত। তিনি তার নিজের খাতনা ৮০ (আশি) বছর বয়সে করেছিলেন।[৭] হযরত ইব্রাহীম (আ.) এর পুত্র ইসহাকের (আ.) খাতনা করেছিলেন সপ্তম দিনে এবং ইসমাঈল (আ.) এর খাতনা করেছিলেন তের বছর বয়সে।[৮]

রাসূলে কারীম (সা.) হযরত হাসান (রা.) এবং হযরত হোসাইন (রা.) এর খাতনা করেছিলেন সপ্তম দিনে।[৯]

সাহাবায়ে কেরাম (রা.) তাদের সন্তানেরা বালেগ হবার পর খাতনা করাতেন।[১০]

মহিলাদের খাতনা করার ব্যাপারে যে সব হাদীস বর্ণিত হয়েছে তা জয়ীফ (দুর্বল)।*

---

১. জা'মে সগীর- হযরত হোসাইন (রা.)।

২. আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ- সামুরা (রা.)।

৩. তিরমিযী, মিশকাত।

৪. বুখারী- সালমার বিন আমের (রা.)।

৫. আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ- উম্মে কুরয (রা.)।

৬. আবু দাউদ, নাসাঈ- সামুরা (রা.)।

৭. বুখারী- আবু হুরায়রা (রা.)।

৮. প্রাগুক্ত। ৯. সফরুস্ সাআদাত। ১০. হাকেম, বায়হাকী- হযরত আয়েশা (রা.)।

* মহিলাদের খাতনা করার ব্যাপারে কিছু রেওয়ায়েত এসেছে। তাদের খাতনা করার ব্যাপারটি ঐচ্ছিক। মিসরসহ আফ্রিকার অনেক দেশে মেয়েদের খাতনা করা হয়ে থাকে। উষ্ণ আবহাওয়ার দেশে মেয়েদের খাতনা করলে তারা শারীরিক ভাবে উপকৃত হয়।

প্রতিবেশীর হক (অধিকার)

আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ

وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ -

অর্থাৎ- তোমরা ইহ্সান (সদ্ব্যবহার ও সহানুভূতি) করো আত্মীয় প্রতিবেশী এবং অনাত্মীয় প্রতিবেশীর সাথে।[১] রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, প্রতিবেশী হচ্ছে চল্লিশ ঘর পর্যন্ত।[২] প্রতিবেশী কোন মহিলার সাথে জিনা (ব্যভিচার)করার গুনাহ অপ্রতিবেশীর দশ জনের বাড়িতে চুরি করার চেয়েও বেশী।[৩] রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি তার প্রতিবেশীকে কষ্ট দিল সে আমাকে কষ্ট দিল, আর যে আমাকে কষ্ট দিল, সে আল্লাহ্ তায়ালাকে কষ্ট দিল।[৪]

যে ব্যক্তি পেটভর্তি করে খেল অথচ তার প্রতিবেশী না খেয়ে থাকলো সে মুসলমান নহে।[৫] যার অনিষ্ট হতে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নহে, সে বেহেশতে প্রবেশ করবে না।[৬] যার অনিষ্ট হতে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়, সে মুসলমান নহে।[৭] কিয়ামতের দিন প্রথম ঝগড়াকারী প্রতিবেশীর বিচার করা হবে।[৮]

রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নিকট এক মহিলার কথা বলা হলো যে, সে বেশ নামায পড়ে, অনেক দান-খয়রাত করে এবং অনেক রোজা রাখে কিন্তু প্রতিবেশীকে নিজ কথার দ্বারা কষ্ট দেয়, রাসূল পাক (সা.) বললেন, সে জাহান্নামে যাবে। অতঃপর দ্বিতীয় আরেক মহিলার কথা বলা হলো যে, তার নামায রোজা কম, দান-খয়রাত করে না, কিন্তু প্রতিবেশীদের গলি-গালাজ দিয়ে কষ্ট দেয় না, রাসূলে কারীম (সা.) বললেন, এ বেহেস্তে প্রবেশ করবে।[৯] আল্লাহর নিকট সে ব্যক্তিই ভাল, যে তার প্রতিবেশীদের মঙ্গল করে।[১০] যাকে প্রতিবেশীরা ভাল বলবে সেই ভাল লোক, আর যাকে প্রতিবেশীরা খারাপ বলবে সে খারাপ লোক।[১১]

যে ব্যক্তি কথাবার্তা সত্যবাদী হবে, আমানতের খিয়ানত করবে না এবং প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার করবে, সে আল্লাহ্ তায়ালা ও তাঁর রাসূল (সঃ) এর বন্ধু।[১২]

---

১. সূরা নিসা ঃ ৩৬

২. তবারানী- কাব ইবনে মালিক (রা.)।

৩. আহমাদ।

৪. বিশারাতুল ফুস্সাক- আনাস বিন মালিক (রা.)। ৫. বায়হাকী, মিশকাত- ইবনে আব্বাস (রা.)।

৬. মুসলিম- আনাস (রা.)। ৭. বুখারী, মুসলিম- আবু হুরায়রা (রা.)।

৮. আহমাদ- উকবা বিন আমের (রা.)। ৯. আহমাদ, বায়হাকী- আবু হুরায়রা (রা.)।

১০. তিরমিযী, দারেমী- আব্দুল্লাহ বিন আমর (রা.)। ১১. ইবনে মাজা- ইবনে মাসউদ (রা.)।

১২. বায়হাকী, মিশকাত- আব্দুর রহমান বিন আবী কুরাদ (রা.)।

সমাপ্ত

আল-ফুরকান পাবলিকেশন্সের প্রকাশিত ও পরিবেশিত কয়েকটি বই ঃ

গুনাহ	৬০/-
ঈমানী দুর্বলতা	৪০/-
নবীজীর কথা	১২০/-
ফিকহ মুহাম্মদী	১৪০/-
ধুমপান ঃ বিষপান	৩৫/-
নামাযের অন্তরালে	৬৫/-
ইসলামে ইবাদতের পরিধি	২৪/-
মুসলমানকে যা জানতেই হবে	২৫০/-
আমি তাওবা করতে চাই কিন্তু	৩৬/-
আদর্শ পরিবার গড়ার শত টিপস	৪০/-
তাফসীর ফাতহুল মাজীদ (৩০তম পারা)	৩০০/-
আমরা একই নবীর উম্মত আমরা মুসলমান	৬০/-
বিশ্ববরেণ্য আলেমদের দৃষ্টিতে তাবলীগ জামায়াত	৫০/-
ইসলামের দৃষ্টিতে ওয়ারিসের সম্পদ বন্টন ও নারী অধিকার	৪০/-
মুসলিম অনৈক্যের কারণ ও তার প্রতিকারের উপায়	১২৫/-
ইসলামের দৃষ্টিতে কাঙ্খিত পরিবার	৫০/-
জেরুজালেম বিশ্বমুসলিম সমস্যা	৯০/-
আলোর পরশে আলোকিত মানুষ	৬০/-
পীরবাদের বেড়াজালে ইসলাম	১৪০/-
ইসলামের দৃষ্টিতে নারী নেত্রীত্ব	৪০/-
সুদ ও ইসলামী অর্থনীতি	৮০/-
আল-কুরআনের হিদায়েত	১৫০/-
মাখলুকাত ও রাবুবিয়াত	৬০/-
মাসায়েলে হজ্ব ও উমরা	১৫০/-
ঈমান এক জীবন্ত শক্তি	৬০/-
কিয়ামতের আলামত	২০/-
ইসলাম ও চরমপন্থা	৫৫/-
প্রেম যোগ জ্ঞান	৯০/-
The Mirror of The Sages	200/-
Our Beloved Prophet (s)	200/-
Financial market : Terminologies and Their definitions	400/-

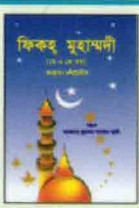

আল-ফুরকান পাবলিকেশন্স

৪৯১ ওয়্যারলেস রেলগেট, মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
মোবাইল ঃ ০১৭১৪০১৫৯৭৭, ০১৭৩০২৬৩৬৬৮